স্বামী বিবেকানন্দ ঃ ভারতচেতনা ও পাশ্চাত্য

ডঃ সুশীলকুমার রুদ্র

পরিবেশক ঃ
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭৩

স্বত্বাধিকারী :
অভিযান গোষ্ঠীর পক্ষে সচিব,
বিদ্যানন্দ চৌধুরী,
১০৫ জি, টি, রোড, বর্ধমান

প্রকাশকাল :
৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৯

প্রকাশক :
শ্যামল চক্রবর্তী

মুদ্রণ :
ইন্দ্রনাথ দাশ
কো - আপারেটিভ প্রেস,
১০৫ জি, টি, রোড, বর্ধমান

মুদ্রণ সহযোগিতায় :
কম্পু - কালার,
৬এ, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা

লেসার কম্পোজ)
ইলেক্ট্রো গ্রাফিক্স
২২, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা - ৭৩

উৎসর্গ

স্বামী অচ্যুতানন্দ
স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
স্বামী দেবরাজানন্দ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ ভারতচেতনা ও পাশ্চাত্য

“ভারতচেতনার স্বরূপ” ও স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামা বিবেকানন্দ ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক। তাঁর সমগ্র জীবন ও সাধনা ভারত চেতনায় পরিপুষ্ট,—সমৃদ্ধ। বিস্মৃতকে স্মরণের আঙিনায় টেনে আনা, হারানো কূলপরিচয়কে উদ্ধার করা তাঁর ছিল জীবনের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল, ইতিহাস তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ভারতবর্ষের আপামর মানুষকে, পাশ্চাত্যের অ-হিন্দু মানবজাতির সামনে ভারতবর্ষের অতীত-বর্তমান কর্মের পশ্চাতে যে আদর্শ সদা সর্বদা পথ দেখিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়—সেই আদর্শ, সেই সত্যের বাণীকে তুলে ধরেছিলেন—তা-ই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র বিশ্বের সমাজ ও সংস্কৃতিতে আবির্ভাবের মূল তাৎপর্য।

যে ভারতবর্ষে স্বামীজী আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই ভারতের ভৌগোলিক পরিচয় কী? উত্তরে চিরতুষারবৃত নাগাধিরাজ ও পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণে ফেলিল সুনীল জলধি দিয়ে আবেষ্টিত ভারতভূখণ্ড। ঐতিহাসিক নানা বিপর্যয়, ঘাত-প্রতিঘাত, ভৌগোলিক সংস্থান এবং সুদূর অতীতকাল থেকে নিজস্ব একটি ভাবধারার চর্চা ও চর্যা এই দেশের ঐতিহ্যকে দিয়েছে একটি বিশিষ্ট সত্তা, এদেশে গড়ে উঠেছে একটি চিরন্তন সংস্কৃতি—একটি মৃত্যুহীন চেতনা, যাকে আমরা ‘ভারতচেতনা’ অভিধা দিতে পারি। আর এই চেতনার প্রকৃত স্বরূপই হচ্ছে ভারত ইতিহাসের মূল বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রকৃত ভারতবর্ষের আকৃতি সম্বন্ধে যদিও আমরা খোঁজ-খবর রাখি, তার প্রকৃতি সম্পর্কে, অন্তর্নিহিত ভাবজীবন সম্পর্কে ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষের জ্ঞান সত্যই সীমিত। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে তাঁর ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’ নিবন্ধে বলেছেন ঃ “ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনীমাত্র। রক্তবর্ণে রঞ্জিত বর্তমান স্বপ্নদৃশ্য পটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় বিদেশকে স্বদেশের স্থানে বসাইতে আমাদের মনে দ্বিধামাত্র হয় না—ভারতবর্ষের অগৌরবে আমাদের প্রাণান্তকর লজ্জাবোধ হইতে পারে না। আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি, পূর্বে আমাদের কিছুই ছিল না।” ভারতচেতনার স্বরূপকে রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন,—যেখানে ভারতাত্মার মর্মমূল্যের ভারতসত্যটি কী, কেমন করেই বা তা ভারতবর্ষের মানুষকে শিশুকাল থেকে আঁকড়ে ধরে তার জীবনের ভিতরে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে তা প্রতিভাত। “কোনো দেশের লোকই আপনার দেশীয় ভাবটি কী, দেশের মূল মর্মস্থানটি কোথায়, তাহা এক কথায় ব্যক্ত করিতে পারে

না—তাহা দেহস্থিত প্রাণের প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ প্রাণের-ন্যায়-সংজ্ঞা ও ধারণার পক্ষে দুর্গম। তাহা শিশুকাল হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর, আমাদের প্রেমের ভিতর, আমাদের কল্পনার ভিতর নানা অলক্ষ পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে। সে আমার বিচিত্র শক্তি দিয়া আমাদিগকে নিগূঢ়ভাবে গড়িয়া তোলে—আমাদের অতীতের সহিত বর্তমানের ব্যবধান ঘটিতে দেয় না—আমারই প্রাসাদে আমরা বৃহৎ, আমরা বিচ্ছিন্ন নহি।"[১]

সত্যই আমাদের এই ভারতবর্ষ একটি ভূখণ্ড মাত্র নয়, একটি প্রাচীন জাতির আবাসভূমি নয়, অথবা একটি দুর্লভ সংস্কৃতির লীলা ক্ষেত্রে মাত্র নয়। ভারতবর্ষ একটি দেবভূমি, পুণ্যভূমি, ধর্মভূমি। ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বের ধর্মচেতনার প্রাণকেন্দ্র, যে ধর্মচেতনা মানুষকে দিয়েছে পথচলার পাথেয়, দেখিয়েছে সত্যিকারের জীবনদর্শন। একথা অনস্বীকার্য, ভারতবর্ষ প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে অন্যতম সভ্যতা যা আজও বেঁচে আছে ; বেঁচেও থাকবে—এ সভ্যতার মৃত্যু হতে পারে না। ইজিপ্ট, ব্যাবিলোনিয়া, অ্যাসেরিয়া বা মায়া সভ্যতা—প্রাচীন এইসব সভ্যতা আজ আর বেঁচে নেই, ইতিহাসের পাতায় তা সীমাবদ্ধ, কিন্তু ভারতবর্ষ তার প্রাণবলে, তার অন্তর্নিহিত চেতনার শক্তিতে নিজের স্বরূপকে, নিজের সভ্যতাকে চালিত করে চলেছে, যা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। লক্ষণীয়, গ্রীক ও রোমক সভ্যতার চিহ্নসকল বর্তমানে প্রত্নগারের শোভাবৃদ্ধি করছে, অপরদিকে ভারতীয় সভ্যতা অবিচ্ছিন্ন ধারায় স্মরণাতীতকাল থেকে প্রবাহিত,—অমৃতত্ত্ব তার অন্তরে। সভ্যতার ধারা সময়ের পদক্ষেপে কখনও হয়েছে প্রবল, আবার কখনও বা ধীর, মন্থর। এই ধারা ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সাধনা ও সংস্কৃতির মধ্যে বিবৃত। এই ধারার মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে একটি শাশ্বত প্রেরণা, একটি নিত্যসত্য ভাবাদর্শ। যাকে আমরা 'ভারতচেতনা' বলে আখ্যা দিতে পারি। এই চেতনার প্রভাব ভারতবাসীর অন্তরে ব্যাপক ও গভীর। একে সম্বল করেই ভারতবাসী যুগ যুগ ধরে তাদের জীবন সমস্যার সমাধান করেছে। প্রতিবেশী সভ্যতার আক্র মণে ক্ষত বিক্ষত হয়েও নিজের অস্তিত্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সহকারে রক্ষা করেছে। শুধু তাই নয়, অপর দেশিয় সভ্যতার প্রধান প্রধান ভাবসমূহ গ্রহণ করে সেগুলি আত্মস্থ করে ফেলেছে। আপন চেতনার রসে তা জারিত করে, দেশিয় সভ্যতাকে করেছে মহিমময়। এছাড়া ভারতীয় সভ্যতার আর একটি বৈশিষ্ট্য ঃ ভারতবর্ষ তার নিজস্ব চেতনার আলোকে অন্যান্য সংস্কৃতির রঙ্গমঞ্চগুলোকে করেছে আলোকিত এবং সেখানে অকৃপণভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে প্রভূত সমৃদ্ধি ও কল্যাণ। এ সম্পর্কে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন ঃ "ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শন যেখানেই গিয়াছিল, সেখানে ধ্বংস করিতে যায় নাই ; গিয়াছিল পূর্ণতা আনিয়া দিতে, বিভিন্ন দেশে ইহা প্রাণদানকারী বর্ষাবারির মতো আসিয়াছিল।"[২]

১. রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২ শ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ১০২৭—২৯

২. ভারত সংস্কৃতি—ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৪—৬৫

স্বামীজী ভারতচেতনার সত্যকারের স্বরূপকে পঠন-পাঠন-অনুভবের সত্যদৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। সেই ভারতীয় চেতনার আলোকেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "আমার উদ্দশ্যে সকলকেই আপন করিয়া লওয়া, কাহাকেও বর্জন করা নয়। আমাদিগকে পৃথিবীর সর্বপেক্ষা উন্নতিশীল জাতির মতো উন্নত হইতে হইবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে আবহমানকালের সঞ্চিত সংস্কার সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে।"[১]

প্রত্যেক জাতির সংস্কারের অভ্যন্তরে প্রবাহিত তার ভাবচেতনা যা সজীব, গতিশীল। —একে 'weltanschauung' বলা যেতে পারে,—যা তার জীবন সংগীতের মূলসুর। অপরাপর সুর এই মূল সুরের সঙ্গে সংগতি রেখে চলে একীভুত হয়। এই সুর তথা চেতনাকে কেন্দ্র করেই জাতির স্বাভাবিক জীবনীশক্তি জাতীয়জীবনকে পরিচালিত করে, জাতিকে স্বকীয়তা দান করে। এই চেতনা অবলম্বন করেই বলাবাহুল্য জাতীয় সংস্কৃতির সৌধ গড়ে ওঠে। লক্ষণীয়, জাতির সংস্কৃতির আন্তর ভাবসম্পদটি, তার চেতনাটি শাশ্বত সনাতন। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেই শাশ্বত চেতনাটি হলো ধর্ম। স্বামীজী ভারতীয় সংস্কৃতির এই প্রাণধর্মের দিকটাকে তাঁর ভৌগোলিক চেতনা ও ইতিহাসচেতনায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। বলেছেন ঃ "এখন বুঝতে পারছো তো, এ রাক্ষসীটির প্রাণপাখিটি কোথায়? —ধর্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে। আসল কথা হচ্ছে, সে নদী পাহাড় থেকে ৩, ০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্ত করে তো ইদিক উদিক ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এইমাত্র। সে নদী যেমন করে হোক সমুদ্রে যাবেই দুদিন আগে বা পরে, দুটো ভাল জায়গার মধ্যে দিয়ে, না হয় দু-একবার আঁস্তাকুঁড় ভেদ করে। যদি এ দশহাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল থাকে তো আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই তো নয়।"[২]

বস্তুত, ভারতবর্ষ অধ্যাত্মভূমি। ভারতের মানুষের পিছনে শক্তিস্বরূপ সদাসর্বদা বর্তমান ধর্ম। ব্যক্তি ও সমষ্টি-মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য ভারতবাসী অবলম্বন করেছে তার আন্তরশক্তি ও অধ্যাত্মবিদ্যা। অধ্যাত্মবিদ্যা আশ্রয় করেই মানুষ মৃত্যুকে পর্য্যন্ত জয় করে অভয় হয়, অমৃতস্বরূপ হয়। আমাদের প্রাচীন ধর্মসাহিত্য গীতায় বলেছে ঃ যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিক্য ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।"[৩] এই প্রত্যক্ষ আত্মোপলব্ধিই ভারতাত্মার প্রাণ, যার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সভ্যতা। ঐ বিশেষ উপলব্ধিই ভারতচেতনা, যা পাশ্চাত্য সভ্যতায় লভ্য নয়। ভারতবর্ষ তার সাধনা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে এই চেতনাকেই যুগ যুগ ধরে প্রকাশ করে চলেছে।

১. বাণী ও রচন—৫ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৪
২. বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ, ১ম সং, পৃঃ ১৬০—১৬১
৩. গীতা ৬।২২

নানা সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিপর্যয় তথা বিবর্তন ঘটেছে এই দেশে, কিন্তু সভ্যতা তার নিজস্ব স্বরূপকে বেনো জলে ভাসিয়ে দেয়নি। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ঐ চেতনার প্রভাবের মূল্যায়ন করতে গিয়ে স্বামীজী যা বলেছেন তা থেকে ভাবতসভ্যতার মূল চাবিকাঠি কী—তা আমাদের কাছে মেঘমুক্ত আকাশের মতো স্বচ্ছ হয়ে যায়। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন ঃ "আর দেখবে যে, এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাযা ধর্ম, ভাব ধর্ম ; আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্যদিয়ে হয় তো হবে ; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার।"[১] ফরাসী ও ইংরেজদের সঙ্গে তুলনা করে পরিস্কারভাবে এ ব্যাপারে বলেছেন ঃ "রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড। ইংরেজ চরিত্রে ব্যবসাবুদ্ধি, আদান প্রদান প্রধান। যথাভাগ ন্যায়বিভাগ—ইংরেজদের আসল কথা। হিন্দু বলছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা—বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা—'মুক্তি'। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্যে ; বৈদিক বল, জৈন বল, বৌদ্ধ বল, অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত যা কিছু বল, সব এখানে এক মত। ঐ খানটায় হাত দিও না, তা হলেই সর্বনাশ।"[২]

ভারতবর্ষের মানুষ বৈদিককাল থেকে শুরু করে আজ অবধি 'মুক্তির' সাধনা করে চলেছে। যে মুহূর্তে এই সাধনা থেকে বিমূঢ় হয়েছে তখনই জাতীয় জীবনে দেখা দিয়েছে অরাজকতা, মূল্যবোধের অভাব প্রভৃতি। আবার সত্যিকারের পথটি যখন খুঁজে পেয়েছে তখনই জাতি দেবোপম হয়ে উঠেছে। মুক্তি ও জীবাত্মার মধ্যে বিশ্বাত্মাকে উপলব্ধি ভারতচেতনার অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। মানুষের মধ্যে অনন্তশক্তি রয়েছে।—তাকে সাধনার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করাই মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য। ভারতবর্ষের মানুষ জন্মগতভাবে এই উপলব্ধিকে নিজের মধ্যে পেয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতের ঋষি কোন্ কালে ঘোষণা করেছিলেন ঃ "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ য়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।" আত্মার অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য, দেবত্বকে উপলব্ধি করেই ভারতের আর্য্যঋষি যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সমাজকে বিশেষ পথে চলার বাণী শুনিয়েছিলেন—যা ভারতবর্ষে আজও অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন। ঋষিদের এই বাণী ভারতচেতনারই নামান্তর,—সে বাণীর স্বরূপই হচ্ছে ধর্ম। ভারতীয় সংস্কৃতিতে স্বামীজী প্রাণের উৎসের স্বরূপ আবিষ্কার করতে গিয়ে এই ধর্মকেই প্রাণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, ভারতবর্ষের মানুষের অন্তরে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই ধর্মের ভিত্তি সর্বানুস্যূত আত্মোপলব্ধি। মানুষ বিশ্বসংসার থেকে বিচ্ছিন্ন এক সত্তা—এই বোধ অবিদ্যার জন্ম দেয়। প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে

১. বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৬১
২. বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৫৯

একটা সত্তাই বর্তমান, যার উপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষি এ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা প্রাণিধানযোগ্য ঃ

বলেছেন ঃ তুমি জগৎসংসার থেকে পৃথক একটি ব্যক্তি পরিচ্ছিন্ন সত্তা মাত্র নও, তুমি ভুমা, বিশ্বসংসারের যাবতীয় দৃশ্যবস্তু তোমার সত্তায় সত্তাবান। এই সর্বভারতীয়তার বোধে মানুষের মধ্যে যে অনন্ত আত্মশক্তির প্রবোধন ঘটে, সেই প্রবোধনের অমৃতালোকে মরমানুষ মরজগতেই অমরত্ব অনন্তত্ব অনুভব করে। এই সত্যের উপলব্ধি ভারতবাসীর জীবনে একটি মজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হয়েছে, ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতিতে এনেছে চিরসজীবতা ও অমোঘতা, দিয়েছে একটি অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। এই সর্বাবগ্রাহী ধর্মানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতাত্মার প্রাণসত্তা, এই অনুভূতিই যুগে যুগে ভারতবর্ষকে সঞ্জীবিত করেছে, সময়ে সময়ে এই অনুভূতিভিত্তিক ভাবধারা উৎসারিত হয়ে মানবসভ্যতাকে রসসিক্ত করেছে।[১]

স্বামীজীও ভারতচেতনার এই দিকটাকে তাঁর হৃদয়ে গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। আর অনুভব করেছিলেন বলেই সমগ্রবিশ্বের মানব সমাজের অবনতির রোধের জন্য প্রাচীন ভারতবর্ষের শাশ্বত চেতনাপুষ্ট বাণীর মূলাধার বেদান্তকে নোতুন ভাবে সমগ্রবিশ্বে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। বিশেষকরে সমকালীন পাশ্চাত্য জগতের একান্ত বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা তথা গতানুগতিক সামাজিক জীবনযাপনের অভ্যন্তরে বেদান্তের বীজ প্রবিষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতচেতনার মূলাধার যে বেদান্ত, সে সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন ঃ "বেদান্ত এক বিশেষ পারাবার বিশেষ, যাহার উপরে একটি যুদ্ধজাহাজ ও একটি ভেলার পাশাপাশি স্থান হইতে পারে। এই বেদান্ত মহাসাগরে একজন প্রকৃতযোগী—একজন পৌত্তলিক বা এমনকি একজন নাস্তিকের সহিতও সহ-অবস্থান করিতে পারেন। শুধু তাই নয়, বেদান্ত মহাসাগরে হিন্দু-মুসলমান, খ্রিষ্টান, পার্শি সব এক—সকলেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান।"[২]

মানব জীবনে বেদান্তের ঐকান্তিক প্রয়োগ স্বামীজী চেয়েছিলেন। জীবনের চরম লক্ষ্য যদি সত্যোপলব্ধি হয়, তবে তা বেদান্ত দিতে পারে। বেদান্ত-আশ্রিত জীবন-চর্চায় ভারতবাসীর জীবনাচরণের মূল পথ। ধর্মভিত্তিক জীবনাচরণ ভারতের মানুষকে যুগ যুগ ধরে দিয়েছে শান্তির আশ্রয়। জীবনের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে ধর্মকে আশ্রয় করেই। সেদিক থেকে ভারতচেতনার মূল ভিত্তিই হচ্ছে 'ধর্ম'। ভারতবাসীর সমস্ত কর্মের মূলে, তার ধ্যানে জ্ঞানে, মননে-প্রাণনে, অনুভবে-সত্যে ফল্গুধারার মধ্য দিয়ে ধর্ম প্রবাহিত

১. চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, ১ম সং, স্বামী প্রভানন্দের 'ভারত সংস্কৃতিতে স্বামীজীর অবদান' প্রবন্ধের ৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২. বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৩১৮

হচ্ছে। আর যখনই তা থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তখনই ঘটেছে জাতির অধঃপতন। ভারতীয় জীবনের ক্ষেত্রে ধর্মের এই গভীর ধারাকে লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"হাতের জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়—বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয়দিনের ধর্ম, গির্জার ধর্ম এবং গৃহের ধর্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই। ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম, তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে ; ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোক ভূলোক ব্যাপী-মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।"[১] একথা রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে ভারতচেতনার চরম স্বীকৃতি। বিশেষ একধরনের ধর্মবোধকে ভারতের মানুষ তার চিন্তার মধ্যে সদাসর্বদা পূর্ণতা দান করেছে। ভারতের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত এই ধর্মের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। প্রাচীনকালের ঋষিরা যে ধর্মের বাণী শুনিয়েছিলেন, সহস্র ঝঞ্ঝার মধ্যেও আজও তা অবিকৃত-অমলিন। এই শাশ্বত বাণীই ভারতচেতনার বাণী।

প্রাচ্যের যুগন্ধর পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন ধর্মসাহিত্য ও দর্শন পাঠের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম-শহর-বন-ঘেরা সমগ্র ভারতবর্ষকে পর্যটন করে এই ভারতচেতনাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আর শুধু ভারতবর্ষে নয়, শুনিয়েছিলেন পাশ্চাত্যে। কেন তা করলেন? এ প্রশ্নের সদুত্তর আমরা বক্ষমান গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়ে দেব। শুধু প্রাসঙ্গিকভাবে একথাই বলবো, ভারতবর্ষের মানুষ যে কারণেই ক্ষণিকের জন্য ভারতমন্ত্রকে ভুলুক না কেন, একদিন না একদিন জীবনচক্রের আবর্তেই সে উপলব্ধি করবে ঐ চেতনাকে। কিন্তু জড় প্রেমিক পাশ্চাত্যবাসী প্রকৃত জীবনাদর্শকে কীভাবে উপলব্ধি করবে? তারা তো স্থূল-ভোগের রাজ্যে তমসাচ্ছন্ন। স্বামীজী ভারতবর্ষের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যবাসীর জন্যও গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন। তাঁর পাশ্চাত্য ভ্রমণের কারণ আর যাই হোক না কেন, একটি গভীর বিশ্বাত্মবোধ যে জড়িত ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নাই। স্বামীজী সমগ্র বিশ্বের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বধর্মের মানুষের সামনে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, তোমাদেরই নিজ নিজ অন্তরে অনন্তশক্তির প্রস্রবন লুকিয়ে আছে—ত্যাগের মধ্য দিয়ে, তপস্যার মধ্য দিয়ে, কর্মের মধ্য দিয়ে, বীর্যের মধ্যে দিয়ে তা জাগাতে হবে। স্বদেশবাসীর প্রতিও সেই একই বাণী ছিল স্বামীজীর। মেরুদণ্ডহীন পরপদানত দুর্বল ভারতবাসীকেও তিনি অমৃতের সন্ধানে দিয়েছিলেন। বেদান্তের চরমতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্বের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দেশবাসীকে সবল করেছিলেন। বর্তমানেও জাতির সমুন্নতির জন্য বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথের একান্ত প্রয়োজন। জাতির সমুন্নতি মূলতঃ নির্ভরশীল প্রত্যেকের নিজের আত্মসত্তায়

১. রবীন্দ্ররচনবালী, ১২শ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সং, পৃঃ ১০৩১—৩২

উদ্বুদ্ধ হওয়ার উপর। আত্মশক্তির বিকাশসাধন ব্যতীত জাতীয় সংঘশক্তি জাগ্রত হয় না। ত্যাগ-তিতিক্ষা, বৈরাগ্য, জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হলে আত্মশক্তি স্থূলত্বের খোলসে ঢাকা পড়ে থাকে। এ কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ সর্বতোভাবে বেদান্তের বাণী গ্রাম-গঞ্জের ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। এই বাণী জীবনে পথ চলার পাথেয়, ভীরু-দুর্বলের শক্তি, মানুষর স্থূল-চিত্তে জীবনের সত্যপরিচয়। এদিক থেকে বিচার করলে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে ভারতস্থিতির মূল ভিত্তিই হচ্ছে বেদান্ত। উপনিষদ প্রবর্তিত বেদান্ত জ্ঞানের দিব্য-আলোকে শুধু ভারত কেন, সমগ্র জগৎ-ই যে উদ্ভাসিত হতে পারে—এ কথা স্বামীজী দৃপ্তকণ্ঠে পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়েছিলেন। স্বামীজীর সেই কথা তখন হয়ে উঠেছিল বাণী। একদিকে থেকে বাণী ও মন্ত্র সত্যের এপিঠ—ওপিঠ।

ভারতচেতনার আঁধার যদি হয় বেদান্ত, তবে স্বামীজী নিজেই মূর্তিমান বেদান্ত। তাঁর জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে (বিশেষভাবে তাঁর পাশ্চাত্যভ্রমণ ও জীবনযাত্রা) যে বেদান্তের মহাবাণীই তাঁর ভিতর দিয়ে মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। কী সেই বাণী? 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যা কিছু বর্তমান সবই সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ। বাইরে, ভিতরে যেখানে যা কিছু দেখতে পাই, অনুভব করি, সবকিছুতেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব বর্তমান, অথবা বলা যেতে পারে স্বয়ং ব্রহ্মই সেসবের মধ্যে সদা সর্বদা জাগরূক। 'সন্মূলাঃ সৌম্য ইমাঃ প্রজাঃ, নেদমূলং ভবতি'—এটিই বেদান্তের প্রধান বাণী। বেদান্তের এই বাণী স্বামীজীর জীবন-সাধনার মূল পথ ও পাথেয়। এই পাথেয়কে অবলম্বন করেই স্বামীজী সমস্ত ভেদাভেদ, সমস্ত সংকীর্ণতাকে নিঃশেষে পরিহার করে বিমল আনন্দে, সমুজ্জ্বল জ্যোতিতে চিরউদ্ভাসিত হয়েছিলেন, যা আজও ম্লান হয় নি ; বরং জাতি যখন ক্রমশঃ সংকটের মুখে পরছে, সমাজ যখন বিপন্ন হচ্ছে, মানুষ যখন জাগতিক ঐশ্বর্যে আনন্দ পাচ্ছে না, আধুনিক বিজ্ঞান যখন তাকে চরম সুখ দিতে সক্ষম হচ্ছে না, তখনই প্রয়োজন হচ্ছে এমন এক ধরণের পানীয়ের যা মহাসুখ দিতে পারে এবং তা নিঃসন্দেহে বিবেকানন্দ অনুধ্যান ; তাঁর পথ ও বাণী—যা ভারতচেতনারই নামান্তর।

উপনিষদ-উদ্ভাসিত বেদান্তজ্ঞান ভারতচেতনার অমূল্য সম্পদ। স্বামীজী স্পষ্টতই অনুধাবন করেছিলেন, ভারতীয় চরিত্রের—ভারতীয় জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিই অদ্বৈতবেদান্ত জ্ঞান। বেদান্তই ভারতীয় জাতীয় আনন্দের মূল উৎস, বেদান্তই জাতির-আত্মা বললে অত্যুক্তি হবে না, বেদান্তই ভারতের জাতীয় প্রাণ। এদিক থেকে বিচার করলে, জাতির সকল উন্নতির চেষ্টা, সকলরকম হিতকর চিন্তা এবং সকল প্রাণস্পন্দন ভাব, বেদান্তজ্ঞানকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত। স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্য অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সে কারণে অদ্বৈত বেদান্তের মূলতত্ত্ব ব্যবহারিক জীবনে রূপায়িত করে পাশ্চাত্যবাসী তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে ভারতের মর্যাদা নোতুন করে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভারতচেতনার বাণী এই বেদান্তের বাণীরই প্রতিধ্বনি। "ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো

ব্রহ্মৈব নাপরঃ”—বেদান্তের এই মন্ত্র ভারতচেতনারও মূলমন্ত্র। ব্রহ্মই কেবলমাত্র পারমার্থিক সত্য, দৃশ্যমান এই জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য নয় এবং জীব ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন, উভয়ের মধ্যে কোনই ভেদ নাই—অদ্বৈত বেদান্তের এটাই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আরও পরিষ্কার করে বললে বলতে হয়, অদ্বৈত বেদান্ত বিশ্বসংসারের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে এক পরম সত্য বস্তুর সন্ধান দিয়েছে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলতত্ত্ব বা স্বরূপ এক সত্য বস্তু—তা শাশ্বত, বিশ্বজনীন, অখণ্ড এবং আনন্দময়। ঐ সত্য বস্তুর উপলব্ধির সাধনায় সত্যিকারের মানুষের সাধনা বা কর্ম। ত্যাগের মধ্য দিয়ে, তপস্যার মধ্য দিয়ে যদি ঐ সত্যবস্তুকে উপলব্ধি করা যায় তাহলে সেই সত্যবস্তুর অপেক্ষায় অন্য সমস্ত কিছুই অযথার্থ বলে প্রতিপন্ন হবে। এ বিশ্বের সমস্ত বস্তুর নাম ও আকারকে বাদ দিয়ে যদি চিন্তা করা যায় তাহলে সেখানে আর কোন ভেদ থাকবে না। বরং তখন দেশ-কাল রূপ গণ্ডীর সীমানা ছাড়িয়ে এক মহাসত্য বিশ্বব্যাপীরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত নাম ও রূপের গণ্ডী অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না, ততক্ষণ প্রত্যেকটি বস্তুকেই একটি পৃথক সত্তা বলেই মনে হবে। এ ব্যাপারে চরম কথা হলো এই, পরমার্থ সত্যের অপরোক্ষ অনুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত দৃশ্যমান জগৎকে অস্বীকার করা যাবে না। অপরোক্ষ অনুভূতি হলে, আমরা যা কিছু দেখছি, শুনছি বা অনুভব করছি তা মূলতঃ সৎ, চিৎ ও আনন্দময় ব্রহ্মেরই স্বরূপমাত্র বলে মনে হবে। প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষুদ্রতার গণ্ডীই একটি মানুষ থেকে আর একটি মানুষকে পৃথক করে রাখছে।—তা প্রতিনিয়ত ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করছে এবং সর্বোপরি আত্মিক সমতার দ্বার রুদ্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই ক্ষদ্রতার প্রাকারে আবদ্ধ হয়েই আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুখ দুঃখে আকুল হয়ে উঠি। প্রকৃতপক্ষে এই সংকীর্ণতাবোধই আমাদেরকে দুর্বল করে তোলে। ব্যক্তিগত জীবন থেকে সমাজজীবনে এবং রাষ্ট্রজীবনেও এই দুর্বলতা প্রকটিত হয়ে নানা সংঘাত ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের উপরে উঠতে গেলে ভারতচেতনার শাশ্বতবাণীকেই গ্রহণ করে চলতে হবে—এই চেতনা ব্যক্তিকে তার একান্ত ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে মুক্ত করে বিশ্বসত্তায় মিলিয়ে দেবে।

সুতরাং এই বিশ্বজনীনতাও ভারতচেতনার মূল একটি সুর—যা ভিন্ন কোন কালে, কোন দেশেই সত্যিকারের উৎকৃষ্ট মানব-প্রজন্ম গড়ে উঠবে না। বলাবাহুল্য এই বিশ্বজনীনতার মূলমন্ত্রই অদ্বৈত বেদান্তের সমস্ত বক্তব্যের সারমর্ম। ভারতবর্ষের প্রাচীন মুনি ঋষিদের কণ্ঠেই বেদান্তের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল ; ভারতমাতার অন্তরচেতনার গভীর সত্যকে তাঁরা দিব্যদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছিলেন। ‘সোঽহম্,’—সেকথা তাঁরা বলতে পেরেছিলেন। তাঁরা জেনেছিলেন, আমি ব্রহ্ম, আমি অসীম অনন্ত স্বরূপ, যা কিছু দেখি বা অনুভব করি, সেই সমস্ত পদার্থের মধ্যে আমার সত্তাই বিরাজিত—এই বোধ যদি প্রকৃত পক্ষে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে আর পৃথক বলে মনে হবে না। সে অবস্থায় হৃদয়ে অসীম বল সঞ্চারিত হবে এবং সমস্ত ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়ে এক

পরমানন্দময় জীবন উপলব্ধি আসবে। সত্যিকারের জীবন তখন পূর্ণ হবে। স্বামী বিবেকানন্দ এই জন্যই বেদান্তের এই মহাবাণী, ভারতচেতনার এই মূল সুর বিশ্ববাসীর কাছে জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেছিলেন, পান করিয়েছিলেন অমৃতসুধারস। অদ্বৈতবাদ সাধনের মাধ্যমেই তিনি বিশ্বের আপামর মানব-সমাজকে, তাদের হারানো শক্তিকে, হারানো শান্তিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

"অদ্বৈতবাদ সাধনে লাভ কী? উহাতে শক্তি তেজ বীর্য লাভ হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিতেছেন ঃ 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যসিতব্যঃ'—প্রথমে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। সমগ্র জগতে তোমরা যে মায়াজাল বিস্তার করিয়াছ—, তাহা সরাইয়া লইতে হইবে। মানুষকে দুর্বল ভাবিও না, তাহাকে দুর্বল বলিও না। জানিও সকল পাপ ও সকল অশুভ এক 'দুর্বলতা' শব্দ দ্বারাই নির্দিষ্ট হইতে পারে। সকল অসৎ কার্যের মূল—দুর্বলতা। দুর্বলতার জন্যই যাহা করা উচিত নয়, মানুষ তাহাই করিয়া থাকে ; দুর্বলতার জন্যই মানুষ তাহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। আমরা কি, এ তত্ত্ব তাহারা সকলেই জানুক। দিবারাত্র তাহারা নিজেদের স্বরূপের কথা বলুক। "আমিই সেই'।—এই ওজস্বী ভাবধারা মাতৃস্তন্যের সঙ্গে তাহারা পান করুক। তারপর তাহারা উহা চিন্তা করুক ; ঐ চিন্তা—ঐ মনন হইতে এমন সর্ব কাজ হইবে ; যাহা পৃথিবী কখনও দেখে নাই।"[১]

অদ্বৈত বেদান্তের এই চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে জীবনের প্রারম্ভিক কাল থেকেই সচেষ্ট হতে হবে। সুস্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক মনের অধিকারী হতে গেলে ঐ কাল থেকেই উঠে পড়ে লাগতে হবে। সুস্বাস্থ্য ও সু-মনের অধিকারী হলে ঐহিক অভিযোগের ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব হবে এবং তখন মনের সমস্ত ভেদবুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাবে এবং তা হলে সমগ্র বিশ্বের অন্তস্থলে যে সচ্চিদানন্দ—তার সঙ্গে মিলিত হয়ে মানবজাতির চরিতার্থতা লাভ হবে। ভারতবর্ষের মানুষ চিরকাল এই বিশেষ পদ্ধতি তথা চেতনার সহায়ে আপন মনের ঐশ্বর্যমণ্ডিত অধ্যাত্মপুরুষকে উপলব্ধি করেছে। সময়ের স্রোতে সমাজজীবনে মাঝে মাঝে পঙ্কিল-আবর্জনা এসে ঐ চেতনাকে আপাত নিশ্চল হয়ত করেছে, কিন্তু দৈবের নিয়মেই আপন চলার পথকে সে আবার খুঁজে পেয়েছে। অথবা বলা যেতে পারে, সেই তমিস্রাময় নিশীথ রাত্রিতে পথ দেখিয়েছে কোন পথিক, কোন 'পরাণ সখা'। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সমগ্র জগতের অমানিশার কালে সেই পথিক বা 'পরাণসখা'। তিনি নিজের জীবনের ক্ষুদ্রতর গণ্ডী অতিক্রম করে ক্রমশ মহাজীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন, ভূমার মধ্যে নিজের ব্যক্তি-সত্তাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছেন। নিজের জীবন দিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকল মানুষকে মহত্ত্বের প্রেরণা জুগিয়েছেন। এই ভাবেই তিনি বিশ্বজনীন আত্মায় পর্যবসিত হয়েছেন। ভারতচেতনা তথা বেদান্তের আলোকেই তাঁর এই বিশ্বজনীন আত্মা সংগঠিত

---

১. বাণী ও রচনা—

হয়েছে—একথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। বলা বাহুল্য এর সঙ্গে অশ্লিষ্ট হয়েছে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ এবং গুরুপত্নী ও সংঘজননী শ্রীশ্রী সারদা মায়ের বিশ্বজনীন ভাবনা। মানুষের মন এই বৃহত্তর ভাবনার সঙ্গে একীভূত হতে পারলে শান্তি তখন হাতের নাগালে চলে আসে। বিশ্বের কেউ পর বলে তখন মনে হয় না। সর্বত্রই ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি হয়। মা সারদা গ্রাম্য নারী হলেও উপলব্ধির গভীর সত্য দিয়ে একথআ অনুভব করেছিলেন। বলেছেন : "যদি শান্তি চাও কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।"[২] অপরদিকে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর উদার ধর্মীয় চিন্তার মধ্যেই প্রকাশিত। স্বামীজীর বিশ্বজনীন ভাবনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসীর কল্যাণচিন্তার মধ্য দিয়েই প্রকটিত হয়েছিল। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে লক্ষ করেছিলেন, সমগ্র বিশ্বে এমন একদিন আসবে যখন সকলে সকলের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভূমির উপর এসে দাঁড়াবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের কথা স্বামীজী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩ রা নভেম্বর 'Unity in Diversity' বিষয়ে বক্তৃতায় লণ্ডনে বলেছিলেন—

'I do not say your view in wrong, you are welcome to it. Great good and blessing come out of it, but do not, therefore, condemn my view. Nine also is practical in its own way. Let us all wark on our own plans. Would to God all of us were equally practical on both sides ! I have seen some scientists who were equallly practical, both as scientists and as spiritual men and it is my great hope that in course of time the whole of humanty will be efficient in the same manner. When a kettle of water is coming to the boil, if you watch the phenomenon, you find, first one bubble rising and then another soon until at last they all join and a tremendous Commotion takes place. This world is very similar. Each individual is like a bubble and the motions resemble many bubbles. Gradualy the nations are joining and I am sure the day will come when separation will vanish and that oneness to which we are all going will become manifest in the scientific world as in the spiritural and then that oneness, the harnony of oneness will pervade the whole world'.

ভারতচেতনায় আত্মার স্থান সবার উপরে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিরা আত্মাকেই উপলব্ধি করেছেন তপস্যার মধ্য দিয়ে। অনাত্ম-বস্তুর চেয়ে আত্মার গুরুত্ব উপনিষদেও ঘোষণা করেছে—এই মন্ত্রে : 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য :' —আত্মারই দর্শন, শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন করা উচিত। উপনিষদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য অদ্বৈত মতে এই আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। জীবাত্মা এবং পরমাত্মা—এ দুয়ের মধ্যে

২. শ্রীমা সারদাদেবী—

স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই—'তত্ত্বমসি'[১] এই সত্য উপনিষদের বাক্য-নিগড়ে আবদ্ধ না থেকে উনিশ শতকে জীবনের সঙ্গে অন্বিত হলো ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার মধ্য দিয়ে। তিনি জীবকে শিব জ্ঞানে পুজো করতে শেখালেন। অন্তরে যে আত্মার অধিষ্ঠান তা-ই পরমাত্মা। সাধনার মধ্য দিয়ে মানুষকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে হবে। দৃষ্টি তৈরি হয়ে গেলে জীবাত্মার-পরমাত্মার কোন ভেদ লক্ষিত হবে না। স্বামীজী শাশ্বত ভারতের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্যই তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'জীবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশই ধর্ম'। রবীন্দ্রনাথ এরই নাম দিয়েছিলেন 'মানুষের ধর্ম'। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাই মানুষের ধর্ম।'[২]

ভারতচেতনায় এই ত্যাগ ও সেবা দুটি প্রধান ধারা—যে ধারায় স্নাত হয়ে আবহমানকালের ভারতবর্ষের মানুষ তার অন্তর দেবতাকে উপলব্ধি করেছে, পেয়েছে তার ধ্যানের ধনকে। জানতে পেরেছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বকে।

স্বামীজী বলেছেন, 'ভারতীয় নেশনে সার্বজনীন জীবনাদর্শ কী? ত্যাগ ও সেবা। এই দুইটি দিক দিয়া ভারতীয় জীবনপ্রবাহকে পরিপুষ্ট করিয়া তোল, দেখিবে আর সব দিকেই আপনা-আপনি উন্নতি হইবে।" (The national ideals of India are Renunciation and Sacrifice. Intensify her in those two chanals and the rest will take care of ifself') মানব ধর্মের এই দুটি দিক ভারতবর্ষের মানুষের, তার চেতনার দুটি বিশেষ দিক। ত্যাগ-ই ধর্মের মূল পথ। ধর্মসাধনার স্বাভাবিক গতি ভোগের বিপরীত মেরুতে, অর্থাৎ ত্যাগ ও অনাসক্তির দিকে। প্রসঙ্গতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'গীতা' শাস্ত্রের উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে এই ত্যাগকেই নির্দেশ করেছেন। বলেছেন, গীতার শিক্ষা যদি হৃদয়ঙ্গম করিতে চাও তবে গীতা শব্দটি পাল্টাইয়া দশবার উচ্চারণ কর, দেখিবে ত্যাগী হইতেই বলাই গীতার সার উপদেশ।'[৩] প্রকৃতই এই ত্যাগ স্থূল ভোগের রাজ্য থেকে চেতনাকে সূক্ষ্ম ভাবরাশির দিকে, পরম ব্রহ্মের সন্নিকটে মানুষকে নিয়ে যায়। মানুষ যেখানে এসেছে তা স্থূল ভোগের রাজ্য, আর সমগ্র সৃষ্টি চক্রটি মূলতঃ ভোগের দিকে অবিরত ঘূর্ণায়মান। মানুষকে সাধনার মধ্য দিয়ে সেই ভোগসর্বস্ব জগৎ থেকে মুক্ত হতে হবে। ত্যাগই এই মুক্তি দেবে—ভারতবর্ষের মুনি ঋষিরা তা প্রাচীনকাল থেকে বলে গিয়েছেন।

সাধুর স্বরূপ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মন্তব্য করেছেন, যিনি সাধু তিনি কাম কাঞ্চন ত্যাগী। সকল মানুষকেই যতটা সম্ভব কামকাঞ্চন থেকে দূরে থাকার নির্দেশ ভারতবর্ষের মুনি ঋষিরা করে গিয়েছেন। 'এই ত্যাগের আরম্ভ ইন্দ্রিয় মনের সংযমে ও পরাকাষ্ঠা

১. ছান্দোগ্যে উপনিষদ—(৬।৮।৭)

২. মানুষের ধর্ম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩. ভারতের সাধনা—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, পৃঃ ৪৫—৪৬, প্রকাশ ১৩২৫, উদ্বোধন কার্যালয়।

পরমার্থ লাভে।"[১] পাশ্চাত্যের হেগেল-দর্শনের ক্রমোন্নতিবাদ গ্রহণ করে এদেশের মানুষ আধুনিক কালে বিষয় ভোগের মধ্যেই পরমবস্তুর সম্ভোগের চেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু তা কখনও সম্ভব নয়। বিন্দুমাত্র বিষয়াসক্তি থাকলে উপলব্ধির সূক্ষ্মস্তরে পৌঁছোনো সম্ভব নয় এবং পরমার্থ লাভও মরুভূমিতে মরীচিকা দর্শনে তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টার মতো পর্যবসিত হবে। সুতরাং ত্যাগ বা অনাসক্তিই ভারতীয় জীবনসাধনার মেরুদণ্ড। পাশ্চাত্যের জড়বিজ্ঞান তথা ভোগসর্বস্ব জীবনধারায় ভোগের স্থান সর্বোপরি। এই জড়বিজ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুখ এবং আনন্দের প্রচুর যোগান দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু চিরকাম্য শান্তিকে তা ব্যাহত করছে। শান্তির পরিবর্তে অপরোক্ষভাবে তা স্বার্থমগ্ন করে তুলছে আধুনিক মানুষকে। গত দুই শতাব্দী ধরে এই সংকীর্ণ চেতনার প্রভাবেই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় সভ্যতা গভীরভাবে আক্রান্ত। বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্য ভ্রমণে গিয়েছেন তখনকার পাশ্চাত্যবাসীরা আরও কঠিনভাবে ঐ অসুখে ভুগছিলেন—ইতিহাস তার সাক্ষী। আমরা পরবর্তীতে সে বিষয়ে আলোচনা করবো। বর্তমান জড়-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ সমাজগুলি ভোগ প্রাচুর্যে ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ অনুভব করছে। বলা যেতে পারে, বর্তমান বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষই এই অবসাদরূপ ব্যাধিতে ভুগছে। এসব থেকে মুক্তি পেতে গেলে প্রয়োজন ত্যাগ। তাগের মাধ্যমেই জীবন-সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ এ ব্যাপারটি তাঁর জীবনসাধনার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছিলেন। শিষ্য বিবেকানন্দ-ও গুরুর এই আদর্শকে অঙ্গীকার করে সমগ্র বিশ্বের বিক্ষুব্ধ মানুষকে এই গুরু নির্দিষ্ট পথেই চলতে বলেছিলেন। এর বিকল্প যে কোন পন্থা নেই, তা আমাদের উপনিষদ এবং পরবর্তী সকল অধ্যাত্মশাস্ত্র আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত রেখেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর উপলব্ধ আধ্যাত্মিক সাধনাকে মানবকল্যাণে ত্যাগ এবং সেবাদর্শনের মাধ্যমে আগত ও অনাগত কালের জন্য বিশ্বে প্রচার করতে হবে, একথা উপলব্ধি করেছিলেন এবং সে কারণেই তিনি তাঁর বিশিষ্ট কয়েকজন শিষ্যকে তাঁর জীবনের আদর্শে বিশেষভাবে গড়ে তুলেছিলেন—যাঁদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের 'নরেন' বা পরবর্তীকালের বিবেকানন্দ অন্যতম। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘের দায় দায়িত্ব বিবেকানন্দকেই তাঁর দেহত্যাগের প্রাক্কালে দিয়ে গিয়েছিলেন।[২] এবং বিবেকানন্দ গুরু-প্রদত্ত এই মহান 'ভাব' সর্বশক্তি দিয়ে পালন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ আমাদের সামনে এই ত্যাগের বহু আদর্শ রেখে গিয়েছেন। ঈশোপনিষদের মহান মন্ত্র এবং তাঁদের জীবনের পথ এক।—

> "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যং কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
> তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্ ॥[২]

১. ভারতের সাধনা—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ৪৫—৪৬, প্রকাশ ১৩২৫, উদ্বোধন কার্য্যালয়।

২. শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের ভক্তমালিকা, স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম ভাগ, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৮

২. উপনিষদ—১

জগতে, যা কিছু চঞ্চল বিষয় আছে তা সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন, এই সত্য উপলব্ধি করে ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে। পরের সম্পদে লোভ করবে না।

সেবাতত্ত্ব ভারতচেতনার তথা জীবনদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তা প্রাচীন শাস্ত্রে মুনি ঋষিরা বলে গিয়েছেন। উনিশ শতকে এই ভারতবাণীকে নোতুন ভাবে পরিবেশন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর অনুবর্তীগণ। প্রসঙ্গত শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘের নাম করা যেতে পারে। আর সংঘমাতা সারদা মা এই সেবাধর্মের মূর্তপ্রতীক—এ তথ্য আজ সর্বজন-অনুমোদিত। স্বামী বিবেকানন্দ যে সেবাতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন তা সকলের জানা আবশ্যক। ভারতীয় সমাজ এই ত্যাগ ও সেবাধর্মের আদর্শে প্রাচীন কাল থেকেই পরিচালিত। সত্যিকারের জাতির গৌরব বাড়াতে গেলে এই দুটি বস্তুকে গ্রহণ করা দরকার। রামকৃষ্ণদেব উপদেশ দিয়েছিলেন 'নরনারায়ণ সেবা কর।' মানুষকে পরমপুরুষ জ্ঞানে বিবেচনা করে তারাই সেবা। পরমার্থ সাধন করার একমাত্র উপায় ভগবৎ জ্ঞানে জীব বা জগতের সেবা।

বলাবাহুল্য, এই ত্যাগ ও সেবা—উভয়ই ভারতীয় সার্বজনীন ধর্ম-জীবনের পক্ষে অসাম্প্রদায়িক অবলম্বন। স্বামীজী পাশ্চাত্যে বক্তৃতাকালে একথা পুনঃ পুনঃ বলেছেন। জাতীয় প্রয়োজনে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ তাঁর 'ভারতের সাধনা' গ্রন্থে এই দিকটির গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন—'এস নিত্যসাধন পথে দাঁড়াইয়া ত্যাগ ও সেবার দ্বারা পরমার্থলাভ করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ কর, কারণ আমাদের নেশনে পরমার্থ লাভই সার্ব্বজনীন লক্ষ্য।'[১] স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের দরিদ্র নিরন্ন মানুষদের জন্য কেমন উদগ্রীব হয়ে থাকতেন বিদেশ ভ্রমণকালীন—তা তাঁর পাশ্চাত্য জীবনী পাঠকেরাই অবগত আছেন। এদের জন্যে নিজে যেমন কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁর অগণিত শিষ্য এবং ভক্তদের।

ভারতচেতনার আলোকে প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও স্বামীজীর সর্বজনীন ধর্ম

ভারতচেতনার মূল তাৎপর্য হচ্ছে এক ধরণের ভাবের সমন্বয়। একদিকে ব্রহ্মতত্ত্ব, আর একদিকে বহু দেববাদ ; একদিকে সর্বাস্তিবাদ, আর একদিকে নাস্তিকবাদ, একদিকে বৈরাগ্য, আর একদিকে ভোগ, একদিকে ব্রহ্মসংহিতা আর একদিকে কামসংহিতা ; একদিকে আসক্তির পঙ্ককুণ্ডে কর্দমবিলাস, আর একদিকে অনাসক্তির শূন্যতা—এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের জীবনপ্রবাহ যুগ যুগ ধরে প্রবাহমান। মাঝে মাঝে উটকো ঝঞ্ঝা ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে ; বৌদ্ধ, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সংস্কার ভারতীয় জীবনপ্রবাহে আবর্ত সৃষ্টি করেছে। কিন্তু দীর্ঘদিন তা টিকে থাকে নি। আবার শাশ্বত

১. ভারতের সাধনা—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, পৃঃ ৫৩

জীবন-প্রবাহে ভারতের মানুষ চলতে শুরু করেছে। জীবন-প্রবাহের এই নিরবচ্ছিন্নতার কারণ অবশ্যই এই সমন্বয়-সাধনা। ভারতচেতনায় বিপরীত ও বিষমকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার ব্যাপরটি স্বতঃস্ফূর্ত। এই-ই ভারতবর্ষের মূলধর্ম। স্বামীজী এ ব্যাপারটি উপলব্ধি করেছিলেন গুরু রামকৃষ্ণদেবের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে। এছাড়া বহুগ্রন্থ অধ্যায়ন করে, ধর্মানুশীলন ও জীবনচর্যা বিশ্লেষণ করে তিনি একথা অনুভব করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের সাধনা হচ্ছে বেসুরোকে সুরের মধ্যে আনা, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, বিরোধের মধ্যে মিলনের সুর গাঁথা, বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি করা। নানা ভেদবৈষম্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত এক প্রকার ভাবের ঐক্যকে অনুসরণ করে চলেছে এবং সেই ঐক্যবোধের মূল প্রেরণা ব্রহ্মবাদ।

'সমন্বয়' কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধানার মূর্ত স্বরূপ। তাঁর কাছ থেকে বিবেকানন্দ যে শিক্ষা পেয়েছিলেন, তাতে তিনি বুঝেছিলেন, ইসলামধর্ম বা খ্রিষ্টানধর্ম ভারতবর্ষের বুকে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়লেও সমগ্র জাতটাই যে ইসলামধর্ম বা খ্রিষ্টানধর্ম গ্রহণ করেন নি, তার কারণ নিজের মূল স্বরূপে এ জাতির আস্থা কখনও পুরোপুরি টলে যায় নি। এছাড়া, ভারতবর্ষের মানুষ প্রেমের দৃষ্টিতে সকলকে গভীরভাবে বুকে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছে। শাশ্বত ভারতভূমিতে তাই সমন্বয়ের ভাব উদ্‌গত হয়ে ওঠে জ্ঞানের দৃষ্টিতে, প্রেমের অনুভূতিতে। আর এই জ্ঞানের দৃষ্টি, প্রেমের অনুভূতি তখনই আসে যখন আমরা পরকে আপন করে নিতে পারি। গীতার সেই বাণী—'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি' (১৮।৬১) [হে অর্জুন, অন্তর্যামী নারায়ণ সর্বভূতে, সর্বজনের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত]—ভারতচেতনার প্রধান অবলম্বন। ভারতবর্ষের মানুষকে কখনও সুপ্তভাবে, আবার কখনও বা প্রজ্জ্বলন্ত হয়ে ঐ মন্ত্র পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। বিবেকানন্দের মধ্যে ভারত চেতনার এই দিকটা একটা ইতিহাস-চেতনার মধ্য দিয়ে জাগ্রত হয়েছিল। শাশ্বত ভারতচেতনাকে উনিশ শতকে রামকৃষ্ণদেব নতুনরূপে পরিবেশন করলেন। তিনি সহজ সরল ভাষায় বললেন, 'যত্র জীব, তত্র শিব' ; 'শিব জ্ঞানে জীব সেবাই ধর্ম'। স্বামী বিবেকানন্দও ঐ একই পথের পথিক। তিনি বলেছেন, "Every soul is Potentially Divine." মানুষের সেবা ও মানুষের অন্তরের দেবত্বকে প্রকাশের সাধনাই স্বামীজীর কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। স্বামীজীর সমন্বয় সাধনা জ্ঞানে-প্রেমে, বিজ্ঞানে-বেদান্তে, দেহে আর আত্মায় এক অন্তর-সংযোগের রাখীবন্ধন করেছে। ব্যক্তি-মুক্তি সাধনাকে তিন সমষ্টি-মুক্তি সাধনায় রূপান্তরিত করেছেন।

বিবেকানন্দের সমন্বয়ী সত্তা তাঁকে একদিকে যেমন শাশ্বতের সমগ্রোত্রীয় আবেদনের অধিকারী করেছে—তেমনি অন্যদিকে চলমান ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়ের এক সুমহান পুরুষরূপেও চিহ্নিত করেছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘাত-সংকুল ভারতবর্ষে তিনি এমনি একজন প্রচণ্ড পুরুষ যিনি পাশ্চাত্যের প্রসাদকে অকৃপণ হস্তে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

আবার এদেশ থেকেও ভারত-দেবতার পূত নির্মাল্য বহন করে নিয়ে গেছেন বিদেশে। জড়-বিজ্ঞানের স্থূল প্রলেপ মাখানো পাশ্চাত্য মনে স্বামীজী ভারতচেতনার বাণী শুনিয়ে শান্তির পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন। এই দেওয়া-নেওয়ার সাধনার মধ্য দিয়েই স্বামীজী যুগনায়ক তো বটেই, শাশ্বতকালের নায়কও হয়ে উঠেছেন।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বিদেশি ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেন যে, ভারতবর্ষের সভ্যতা একটা সমন্বয়ী সভ্যতা। এখানে মিলেছে বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা। বস্তুতপক্ষে, ভারতের প্রগতি ও সমৃদ্ধির চাবিকাটিই হচ্ছে এই সমন্বয়-ভাবনা। যে ধর্মকে স্বামীজী ইতিহাসের নিয়তি বলেছেন, সেই ধর্মবোধই এই সমন্বয়কে যুগে যুগে প্রকাশ করেছে। রামায়ণ ও মহাভারতের মূল বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ধারা—তার বলিষ্ঠ বিকাশ ঐ দুই মহাগ্রন্থে বিধৃত রয়েছে। রামায়ণে অনার্য হনুমান এবং আর্য বীর রামচন্দ্র জোট বেঁধে অধর্ম-অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। রাবণকে নিহত করে ধর্ম রক্ষা করেছেন। সমন্বয়ের বাণীই ঐ দুই ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থে প্রকাশিত। শুধু রামায়ণ-মহাভারতের যুগ নয়, প্রাচীনকাল থেকে আজকের বিংশ শতক অব্দি প্রলম্বিত ইতিহাসে এই সমন্বয়কে আশ্রয় করেই প্রবাহিত হয়ে চলেছে।—ইতিহাস তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সমন্বয়-ভিত্তিক আদান-প্রদানের ধারা যখনই ভারতীয় জীবনে রুদ্ধ হয়েছে তখনই ভারতীয় সভ্যতার সংকট ঘনিয়ে এসেছে। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী তার উদাহরণ। তুর্কী, পাঠান ও মুঘলকে মধ্যযুগের অনুদার সমাজ আপন করে নিতে পারে নি। দুটি সমাজ পাশাপাশি বাস করেও নিজের নিজের সংস্কৃতিকেবাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। ফলত তারা রক্ষণশীল এবং পরধর্ম-সংস্কৃতি বিদ্বেষী হয়ে পড়েছে—একথা ইতিহাসে সাক্ষ্য দিচ্ছে।[১]

কিন্তু উনিশ শতকে সেই সমন্বয়ের আদর্শেই পূর্ব-পশ্চিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলন ঘটলো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশি ইংরেজ বণিক ভারতের আত্মবিলুপ্তি, বিচ্ছিন্নতা, সংকীর্ণতা ও ব্যভিচারের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। একদল ইংরেজ শোষণ করেছিল, আর একদল ইংরেজ ভারতবাসীর সঙ্গে জোট বেঁধে সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিনিময় ঘটিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই উভয় দলকে 'ছোট ইংরেজ এবং বড় ইংরেজ' বলেছেন তাঁর 'কালান্তর' গ্রন্থে। স্বামীজী উনিশ শতকে ভারতীয় নবজাগরণের তাৎপর্যকে উপলব্ধি করেছেন ঐ সমন্বয়ের দৃষ্টিতেই। তিনি একজায়গায় বলেছেন ঃ

"পরদেশ বিজয় মাত্রেই মন্দ, বৈদেশিক শাসন নিশ্চয় অশুভ। তবে অশুভের মধ্য

১. চিন্তানায়ক বিবেকনন্দ গ্রন্থের প্রবন্ধ 'স্বামীজীর ইতিহাসচেতনা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। লেখক অমূল্যভূষণ সেন। পৃষ্ঠা—২১২

দিয়াও কখন কখন শুভ সংঘটিত হইয়া থাকে।..... ইউরোপের শিল্প—সর্বত্র গ্রীসের ছায়া। আজ ভারতক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রিক ও প্রাচীন হিন্দু একত্র মিলিত হইয়াছে। এই মিলনের ফলে ধীরে ও নিঃশব্দে একটা পরিবর্তন আসিতেছে, আমরা চতুর্দিকে যে উদার জীবনপ্রদ পুনরুত্থানের আন্দোলন দেখিতেছি, তাহা এইসব বিভিন্ন ভাবের একত্র সংমিশ্রণের ফল।"[১]

পূর্ব-পশ্চিমের মিলনের প্রথম পুরোহিত রামমোহন। তিনিই পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও শিল্পকে সাদরে বরণ করে ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং আধুনিক ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। একারণে তিনি সমগ্র কর্মজীবন তাতে উৎসর্গ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর পূর্বসূরীর প্রয়াসকে স্মরণ করেই ভারতবর্ষের কল্যাণের কথা ভেবেই নোতুন ভারত গড়ার কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রামমোহনের এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ "আমাদের পতনের অন্যতম কারণ এই যে, আমরা বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সহিত নিজেদের তুলনা করি নাই...। যেদিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সংকীর্ণতার বেড়া ভাঙিলেন, সেই দিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে একটু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহার আরম্ভ হইয়াছে।"[২]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রামমোহনের সমন্বয়-ভাবনা পরিপূর্ণ রূপ পেতে পারেনি ঐতিহাসিক কারণেই। তাঁর ব্রাহ্মসমাজ ক্রমশ রক্ষণশীলতায় পর্যবসিত হয়ে সমাজমনে এক দোলাচল মনোবৃত্তির সৃষ্টি করলো। ঠিক সেই-ক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিলেন সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব। আচার্যদেবের আবির্ভাব সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন ঃ

'এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল.......যিনি একাধারে শঙ্করের উজ্জ্বল মেধা ও চৈতন্যের বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন.....যাঁহার হৃদয় ভারত বা ভারতের বাহিরে দরিদ্র দুর্বল পতিত—সকলের জন্য কাঁদিবে, অথচ যাঁহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্ব সকল উদ্ভাবন করিবে.... এবং এইরূপ বিস্ময়কর সমন্বয়ের দ্বারা হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ এক সার্বভৌম ধর্ম প্রকাশ করিবে।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ সমন্বয় সাধনাকে সাধুবাদ দিয়ে বলেছিলেন—

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলতি হয়েছে তারা"[৪]

স্বামী বিবেকানন্দ গুরুর ঐ সমন্বয় সাধনার পথ ধরেই নিজের কর্মসাধনাকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। তিনিও পশ্চিমকে সাদরে গ্রহণ করে গৌরবান্বিত ভারতীয় হয়ে থাকার সূত্র সমগ্র কর্মজীবনে বলিষ্ঠ হাতে তুলে ধরলেন। স্বামীজীর সর্বজনীন ধর্মচিন্তা প্রসঙ্গে এ

---

১. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১ম সং পৃঃ ১৬৫
২. স্বামীজীর বাণী ও রচনা ৫ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২১৩—১৪
৩. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৬১—৬২
৪. রবীন্দ্ররচনাবলী ৪র্থ খণ্ড (জন্মশত বার্ষিকী সং) পৃঃ ৯৭১

ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। শুধু প্রসঙ্গত স্বামীজীর বাণীর উল্লেখ করে আর একটি কথা বলার চেষ্টা করবো, স্বামীজী ভারতভূমির জন্য, সমগ্র বিশ্বের জন্য এমন এক বিপুল উদারনৈতিক সমন্বয় বাণী ঘোষণা করেছিলেন যা ভারত-ইতিহাসের পটভূমিকায় এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। স্বামীজী ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে বন্ধুবর সরফরাজ হোসেনকে একটি পত্র প্রেরণ করে বলেছিলেন ঃ

"আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্ম্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই একমাত্রা আশা।.... বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্ম্ম পরিণত ইসলাম ধর্ম্মের সহায়তা-ব্যতীত তাহা মানব সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানবজাতি সেই স্থানে যাইতে চাই, যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরাণও নাই ; অথচ ইহা বেদ, বাইবেল ও কোরাণের সমন্বয়ের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে।.... আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি, ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া এই বিবাদ বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক মহা-মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছেন।"[১]

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, সত্যিকারের ভারতের পরিচয় তার ধর্মে, মন্ত্রে ও সমন্বয়কে ঘিরেই নিরন্তর আবর্তিত। চৈতন্যের শক্তিই ভারতাত্মার শক্তি ও মুক্তি। স্বামীজীর চেতনায় এই সমন্বয়সাধনা প্রসঙ্গে রোমাঁ রোলাঁ যথার্থই বলেছেন ঃ "ভারসাম্য ও সমন্বয়, এই দুইটি কথার মধ্যে বিবেকানন্দের প্রতিভাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। সমগ্র সম্পূর্ণ চারটি যোগ, ত্যাগ ও সেবা, শিল্প ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক হইতে সর্বাপেক্ষা ব্যবহারিক সকল কর্ম—এই সমস্ত মানস পথকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।....তিনি ছিলেন সকল প্রকার মানসিক শক্তির সামঞ্জস্যের মূর্ত প্রকাশ।"[২]

আমরা পূর্বেই বলেছি, স্বামীজী ভারতচেতনার মূর্ত প্রতীক। মনীষী রোমাঁ রোলাঁর উক্তিই সে সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি ॥

ভারতচেতনার ক্ষেত্রে স্বামীজীর অবদান কোথায়?

ভারতচেতনা তথা ভারত ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে স্বামীজীর অবদান কতখানি—এ ব্যাপারটি জানতে গেলে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় তা বিচার করতে হবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের কুশীলবেরা যেমন যেমন এসেছে, তাদের মানসিকতার অনুরূপ ধর্ম-ঐতিহ্যকেই তারা আঁকড়ে ধরে রেখেছে। বৈদিককালে মুনি-ঋষিদের শাসিত সমাজে বেদ-উপনিষদের ক্রিয়াকার্য্য সবার উপরে স্থান পেত। বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ এবং

১. পত্রবলী, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৩৮
২. বিবেকানন্দে জীবন—ঋষিদাস অনুদিত ; ২য় সং, পৃঃ ২৬৮

ভক্তিযোগ উভয়ত সে সমাজে প্রচলিত ছিল। উত্তর-বৈদিককালে ঔপনিষদিক তত্ত্বকথা রাজধর্মাবলম্বী ক্ষত্রিয়দের মধ্যে গৃহীত হয়েছিল। অপরদিকে ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড নিয়েই সময় অতিবাহিত করতেন। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ভাবধারা ও ধর্ম-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর্য সভ্যতার মর্মমূলে চূড়ান্ত আঘাত লাগলো। বেদানুগত্য ও চাতুর্বর্ণ্যাশ্রম ব্যবস্থা ভেঙে পড়লো। প্রতিষ্ঠিত হলো বৈদিক সংঘ। আর্য গার্হস্থ্যধর্ম বিচ্যুত হলো। তার জায়গায় এলো প্রব্রজ্যা এবং সেই সঙ্গে শূন্য, অনিত্য ও অনাত্ম—এইসব নেতিবাচক মানসিক মূল্যবোধ। বস্তুত মোক্ষ ও নির্বাণের স্থূলভিত্তিক হলো তামসিক ভোগবাদ। এর সঙ্গে হাত মেলালো ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। তন্ত্রের ভুক্তি মুক্তিবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ যান উপাযানের দেহচর্যাকেন্দ্রিক গোপনচারী উপধর্ম গুরু-শিষ্য পরাম্পরায় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে সমাজ দেহকে করে তুললো বিষাক্ত। স্বভাবতই সমাজমন অসুস্থতায় পরিণত হলো। এই অবস্থা স্বচ্ছন্দে অতিক্রান্ত হলো পাঁচশো বছরেরও বেশী,—ইসলামধর্ম আগমনের কাল পর্যন্ত। ইসলামধর্মের ইহসর্বস্বতা এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিত পরিমাণে সুফি ভক্তিবাদ ভারতমননে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলো এবং ক্রমশ তা অসার করে তুললো। বস্তুত জীবনচর্যা এবং দার্শনিক মননের ক্ষেত্রে ইসলামধর্ম ভারতবাসীকে নতুন কিছু দিতে পারেনি। মুসলমান রাজত্বের দীর্ঘকালীন সময় (প্রায় হাজার বছর) ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা, ঐতিহ্য ও চেতনাকে তিলে তিলে ভেঙে গুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। সন্তসাধক সম্প্রদায় আত্মনিবেদনমূলক ভক্তিপন্থার মধ্য দিয়ে সাময়িকভাবে ইসলামধর্মের গতিরোধ করার চেষ্টা করলেও শেষ অব্দি ভারত ঐতিহ্যকে রুখতে পারে নি। প্রসঙ্গতঃ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বা তুলসী দাস, নানক, কবীর, দাদু, মীরাবাঈ, রজ্জব—এঁরা ভক্তিপথে সমাজের বিকল অবস্থাকে সুস্থ করতে চেয়েছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে এলো খ্রিষ্টান বণিক। বণিক থেকে শাসক— এ ইতিহাস আমাদের জানা। কিন্তু সেই সঙ্গে শুরু করেছিল অ-ভারতীয় সংস্কার, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্রিয়াকাণ্ড। এই খ্রিষ্টানধর্মও ইহ-সর্বস্ব জড় জীবনভিত্তিক ধর্ম। এই ধর্মও ভারতীয় সনাতনধর্মের দেহমূলে গভীর পঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। দেশের ইংরেজি শিক্ষিত মধ্য-বিত্তশ্রেণী পাশ্চাত্য জীবনাদর্শকে মুক্তির সোপান হিসেবে গ্রহণ করেছিল সে সময়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই অবশ্য ভারতীয়দের কেউ কেউ অনুধাবন করলেন (মূলতঃ তাঁরাও সুশিক্ষিত) যে, শুধু প্রতীচ্য জীবনাদর্শ ও সংস্কারের অনুকরণই আমাদেরকে মুক্তি দেবে না, যুক্ত করতে হবে ভারতীয় ঐতিহ্যকে, তার সংস্কারকে। অদ্বৈত পথ ছাড়া ভারতের মানুষ সুস্থভাবে বাঁচতে পারবে না ;—এ ব্যাপারটি রামমোহন প্রথম অনুভব করেছিলেন। অবশ্য রামমোহনের এই অদ্বৈতপন্থা প্রকৃত অদ্বৈতপন্থা কিনা, অথবা ইসলমীয় 'মোতাজেলা' ও 'মহয়াহিদ্দিন' যুক্তিবাদী একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের সম-পর্যায়ের কিনা এ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। রামমোহনের জীবতকালেই বিচিত্র ধরণের 'আইডিয়া'

সমাজের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছিল। একদিকে বৈষ্ণব ভক্তিবাদ, অপরদিকে লোকহিতৈষণা ও সমাজ-সংস্কার, একদিকে নব্য-পৌরাণিকতা, আর একদিকে ব্রাহ্মসমাজ অবহেলিত বেদান্ততত্ত্ব, একদিকে ভারতীয় জীবনের নিষ্কাম কর্ম, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্ব জীবনচর্যা ও প্রবল কর্মোদ্যম—এই দোদুল্যমান সমাজ-মনের ক্রান্তিকালেই আবির্ভূত হলেন ভারত-ত্রাতা ও বিশ্বপ্রেমিক রামকৃষ্ণদেব। সঙ্গে নিয়ে এলেন বিবেকানন্দ প্রমুখ অন্তরঙ্গ পার্ষদদের। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারায় নোতুন করে প্রাচীন ভারতবর্ষকে অবিষ্কার করলেন। দেশকালের উপযোগী করে নোতুন ভাবে ও রূপে সেই ভারতচেতনা ও ঐতিহ্যকে শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে ছিলেন। ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এইখানেই। .

[খ]

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিবেকানন্দ অতি অল্প বয়স থেকেই লক্ষ করেছিলেন যে, ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছু অংশ প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ, পরে বঙ্কিম-নেতৃত্বে নব্য হিন্দুসমাজ প্রাচীন ভারতকে নোতুনভাবে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে এবং বহু অধ্যয়ণের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতচেতনার যথার্থ স্বরূপকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এও লক্ষ করেছিলেন, ভারতভূমির নিজস্ব একটা কুলধর্ম আছে যা সমাজ বা রাষ্ট্রের নানা রূপান্তর ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও নিজের স্বরূপকে হারিয়ে ফেলেনি। বেদান্তের শঙ্করভাষ্য এবং শঙ্করকৃত উপনিষদ ব্যাখ্যায় যে তত্ত্ব প্রকাশিত তা আবহমানকাল ধরে নিজের স্থান করে নিয়েছে। নানান প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সে স্বরূপকে নষ্ট করেনি। এই কুলধর্ম ভেঙে পড়লে সমস্ত জাতীয় কাঠামোটিই ভেঙে যাবে অবশ্যম্ভাবীভাবেই। আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের উনিশ শতকে এই কথাটির সত্যতাকে খুঁজে পাই। মধ্যযুগে বৈদেশিক শাসক শক্তির প্রবল চাপের ফলে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ভেঙে পড়লে এই অদ্বৈত সমন্বয়বোধ কয়েক শতাব্দীর জন্য প্রায় ভেঙেই গিয়েছিল। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম দিকেই ইউরোপীয় ভাবধারার প্রবল সংঘর্ষে সেই পুরাতন ভাববস্তু আবার নোতুন সাজে প্রকাশিত হলো—এ ইতিহাস সকলেরই জানা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনচর্যা এবং সাধন-প্রণালীর মধ্য দিয়ে সে ব্যাপারটিকে অসাম্প্রদায়িকভাবে দেখালেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ সেই পথের পথিক হয়ে সমগ্র বিশ্বে বেদান্ততত্ত্বের মূল কথাকে একালের উপযোগী করে পরিবেশন করলেন। বেদান্ত প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্বই যে আধুনিক বিশ্বের একমাত্র পরিত্রাণের পথ এবং তা কোন সাম্প্রদায়িক তত্ত্বভাবনার সামিল নয় ; বিশ্বের যে-কোন দেশের, যে কোন মানুষ ঐ পথ ধরে নিজের অন্তর্দাহকে প্রশমিত করতে পারে—তিনি তা পশ্চিমের দেশগুলিতে অসাধারণ যুক্তির দ্বারা ব্যক্ত করতে

চেয়েছিলেন এবং সক্ষমও হয়েছিলেন। মূলত জ্ঞানবাদের দৃষ্টিতেই স্বামীজী ঐ বেদান্ততত্ত্ব পাশ্চাত্যে প্রচারিত করেছিলেন। ভারতবর্ষে তা কর্মযোগ ও সেবাধর্মের মধ্য দিয়ে তত্ত্বটিকে রূপায়িত করেছিলেন। একেই আমরা স্বামীজীর 'ব্যবহারিক বেদান্ত' (Pracetcal Vedanta) বলবো। কর্ম ও ধর্ম—এই দুটি জিনিষকে তিনি এরই তলে মিলিত করতে চেয়েছিলেন। ভারতচেতনার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের এই বিশেষ পথটি এক সুমহান অবদান। এদিকে লক্ষ রেখেই আমরা তাঁকে ভারতপথিক আখ্যা দিতে পারি।[১] সেই ভারতপথিক প্রাচীন ভারতবর্ষের মহিমান্বিত ঐতিহ্যকে কী দৃষ্টিতে দেখেছিলেন? পাশ্চাত্যের বুধমণ্ডলীকে তিনি যে বাণী শুনিয়েছিলেন তার মধ্যেই ঐ দৃষ্টির প্রমাণ মেলে ;—তা উল্লেখ করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করবো। তিনি বলেছেন ঃ

"..................তোমাদের ধর্ম যখন কল্পনাতেও উদ্ভূত হয় নাই, তাহার অন্ততঃ তিনশত বৎসর আগে আমাদের ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের আর একটি দান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন চিকিৎসকগণ। স্যার উইলিয়াম হান্টারের মতে, বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার এবং বিকল কর্ণ ও নাসিকার পুনর্গঠনের উপায় নির্ণয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অঙ্কশাস্ত্রে ভারতের কৃতিত্ব আরও বেশী।[২]

১. চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ—পৃঃ ৫৪, প্রবন্ধ 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতবর্ষ'—ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১০৯—১০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য ভ্রমণের পরিকল্পনা, উদ্যোগ, প্রস্তুতি এবং ধর্মমসভা

স্বামী বিবেকানন্দের নিরলস সাধনার প্রকাশ ক্ষেত্র ছিল পাশ্চাত্য জগৎ। ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মহাসমাধিকাল পর্যন্ত—তাঁর অতি স্বল্পায়ু জীবনের এই শেষ পর্বের অতি স্বল্পকালের বেশির ভাগ সময়ই তিনি পাশ্চাত্য দেশে তাঁর কর্ম ও সেবার ধর্মকে রূপায়িত করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন এবং একথা বললে খুব অযৌক্তিক কিছু বলা হবে না যে, স্বামীজীর পাশ্চাত্য ক্রিয়াকর্মের কথা বাদ দিলে তাঁর জীবনের প্রাক্-পাশ্চাত্য পর্ব শুধুমাত্র সাধনার পর্ব। কলেজীয় শিক্ষার কালে ইংরেজ সাহেব অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত উইলিয়ম হেস্টি-র প্ররোচনায় একদিন দক্ষিণেশ্বরে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন পরমহংস রামকৃষ্ণদেবকে। হেস্টি সাহেব যে অতীন্দ্রিয় জগতের কথা বলেছিলেন তার কিছু সন্ধান যদি মেলে ঐ পাগল ঠাকুরের সান্নিধ্যে—এই আশায় ঐ সাক্ষাৎকার। তারপর শুরু যাওয়া ও আসা, পরীক্ষা ও বিচার, সন্দেহ অভিযোগ ও শেষ অব্দি সমাধান। এইভাবেই গুরুশিষ্যের মিলন ঘটেছে—পথ চলা শুরু হয়েছে নোতুন উদ্যমে, ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি বিশাল কর্মযজ্ঞে। স্বামীজীর কর্মযজ্ঞের মল বিষয় মানুষ গড়া ; সত্যিকারের মানুষ গড়া—ভারতীয় আদর্শে মানুষ গড়া। যে ভারতচেতনা আমাদের জাতির মূলশক্তি তারই আলোকে সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে আলোকিত করে তোলা এবং এই কারণেই তিনি শুধু পদব্রজে ভারতভূমি পরিক্রিমা করে ঐ চেতনার ধারাকে ভারতবর্ষের মানুষের মনে সঞ্চারিত করার চেষ্টায় করেন নি, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ বিশেষ করে জড়বাদী পাশ্চাত্যের মানুষ যাতে ঐ ধারায় সিঞ্চিত হয়ে নব-জীবন লাভ করতে পারেন তার জন্যও তিনি আমৃত্যু যথাসাধ্য চেষ্টা করে গিয়েছিলেন। আমাদের ধারণা, স্বামীজী তাঁর দৈহিক ও মানসিক শক্তির বেশির ভাগই তিনি পাশ্চাত্যে খরচ করেছিলেন। পাশ্চাত্যে এত শক্তি তিনি কেন ক্ষয় করলেন? এর ইতিহাস আমরা একটু পরে জানবো। তার পূর্বে আমরা দেখার চেষ্টা করবো, স্বামীজীর মনে পাশ্চাত্যে যাওয়ার অভিলাষ ঠিক কবে থেকে জাগ্রত হয়েছিল। অবশ্য পুরো ব্যপারটিই অনুমান-নির্ভর, যদিও কিছু কিছু প্রমাণ আমাদের হাতে আছে।

বিবেকানন্দ তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। বিবিদিষানন্দ বা বিবেকানন্দ তখন-ও হন নি। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকের ঘটনা। প্রথম বর্ষের শেষে তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হলে নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। সেকারণে মহাবিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী তাঁর এফ.এ. পরীক্ষায় বসার ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি ওঠে। সেই সময় তিনি পিতা বিশ্বনাথ দত্তের কাছে ইংলণ্ডে যাওয়ার প্রস্তাব

রাখেন। অবশ্য বিশ্বনাথ দত্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দূরে পাঠাতে অসম্মত হন। এ তথ্য আমরা পেয়েছি। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'Vivekananda' গ্রন্থে।[১] কৈশোরে যৌবনের সন্ধিক্ষণে স্বামীজীর ঐ অভিলাষকে আমরা তাঁর কল্পনা বিলাস বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। কারণ স্বামীজীর কালে পরাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষিত যুবকদের, বিশেষ করে যাঁরা বর্ধিষ্ণু তথা সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত ছিলেন তাঁদের অধিকাংশরই মনে বিলেত যাওয়ার (মূলত ইংলণ্ড) স্বপ্ন জাগতো। এ ছাড়া যারা ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ছিলেন তাঁরাও ঐ একই স্বপ্ন দেখতেন। বিলেতে গিয়ে আই. সি. এস. বা ব্যারিষ্টারি পড়া তাঁদের যেমন একটা মৌল উদ্দেশ্য ছিল, অপরদিকে যে ইংরেজদের তাঁরা স্তাবক ছিলেন তাদের দেশে ঘুরে আসার স্বপ্নকে কখনোই অযৌক্তিক বলা চলে না। যাইহোক, নরেন্দ্রনাথের ঐ ছাত্রাবস্থায় স্বপ্নের কি স্বরূপ ছিল তা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না, তবুও একথা দৃঢ় ভাবে বলা যায়, পরবর্তীকালে যে স্বপ্নের রূপায়নে পাশ্চাত্য, বিশেষ করে আমেরিকামুলুকে পাড়ি দিয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে তাঁর সেই ছাত্রাবস্থার স্বপ্নের সে উদ্দেশ্য ছিল না। প্রথম স্বপ্নের দিনটি থেকে পরবর্তীকালে স্বপ্নের রূপায়ণকালের সময়সীমা প্রায় এক দশকেরও বেশি সময়। ১৮৮০ থেকে ১৮৯৩ এর সেপ্টেম্বর—এই সুদীর্ঘকাল ছিল স্বামীজীর কঠোর সাধনার কাল, মহামানবরূপে গড়ে ওঠার পরীক্ষা নিরীক্ষার কাল। ঐ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে, আর সমগ্র ভারত পরিক্রমায়। গুরুর কাছে যে ত্যাগ ও কর্মের শিক্ষা নিয়েছিলেন, সমগ্র ভারত পরিক্রমাকালে সেই ত্যাগ ও নিষ্কাম কর্মকেই সার্থকভাবে রূপায়ণ করেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পরিভ্রমণ কালে তিনি লক্ষ করেছেন আর্ত নিপীড়িত, ক্ষুধার্ত মানুষের বিবর্ণ চেহারাকে। দ্বিতীয়ত যে ভারতচেতনা সম্পর্কে তিনি জ্ঞান আহরণ করেছেন প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র তথা বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে, যে ভারতচেতনার প্রতিমূর্তি দেখেছেন রক্ত-মাংস দেহধারী অথচ দেবতাময় গুরু পরমহংসের মধ্যে ; সেই ভারতচেতনাকেই আরও গভীর ভাবে উপলব্ধি করলেন বৈচিত্র্যময় এই ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের সান্নিধ্যে এসে। বিচিত্র রুচি-সংস্কৃতির জীবনযাত্রার অভ্যন্তরে খুঁজে পেলেন অখণ্ড ভারতচেতনাকে। পূজ্যপাদ স্বামী গম্ভীরানন্দজী বিবেকানন্দের ভারত পর্যটনকালের মানসিকতা সম্পর্কে এক জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন তাঁর 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে। বলছেন—"নিরালক্ষ সন্ন্যাসী একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় জীবনযাত্রার ও মানবসভ্যতার যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভাবী চিন্তাধারায় ও কার্য প্রণালীতে একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর তিনি দারিদ্র্যের প্রকৃত মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ; ভারত পর্যটনকালে দেখিয়াছিলেন বিরাট

১. ViveKananda—P—153

জনসমুদয়ের ভাগ্য প্রকৃতপক্ষে তাহারই অনুরূপ বটে। আর তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভারতের জনগণ শ্রীহীন হইলেও ধর্মবিমুখ নহে। তবে সে ধর্ম অনেক ক্ষেত্রে প্রাণহীন আচারমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে.....। এই সুদীর্ঘ ভ্রমণকালের অনেকখানি সময় তিনি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত সন্ন্যাসীর বেশেই কাটাইয়াছিলেন, আর তাঁহার সঙ্গী ছিল শুধু হয়তো একখানি শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি এবং একখানি গীতা ; আর চিরসাথী ছিল বুভুক্ষা ও অনিশ্চয়তা ; তথাপি সর্বদা চিত্তে ছিল অদম্য ঈশ্বরবিশ্বাস ; স্বীয় জন্মভূমির প্রতি অসীম প্রেম এবং জনগণের অকৃত্রিম ভালবাসা।"[১] বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে গমনের ইচ্ছার প্রেক্ষাপট হিসেবে তাঁর ঐ স্বদেশপ্রীতি দেশমাতৃকার—অর্থাৎ ভারতবর্ষের জনগণের সেবার ইচ্ছা গভীরভাবে তাঁর মনে দানা বেঁধে ছিল। কারণ সেবা তাঁর কাছে পূজারই নামান্তর ছিল।

স্বামীজীর মনে পাশ্চাত্যে যাওয়ার বাসনা ১৮৯৩ এর পূর্বে বেশ কয়েকবার জেগে উঠেছিল। অবশ্য তা কখনো প্রকাশ পেয়েছে, কখনো পাই নি। প্রকাশ পেয়েছে তখন যখন কেউ তাঁর পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন, স্বামীজীর জ্ঞানের সমাদর আমাদের দেশে হবে না, পাশ্চাত্যে গিয়ে ঐ জ্ঞানের অসীম রাজ্যের সন্ধান দিলে পাশ্চাত্যবাসীরা শুনে মুগ্ধ হবে,—তাঁকে সম্মান দেবে। এ ব্যাপারে তিনি প্ররোচনা পেয়েছেন ভারতবর্ষের রাজা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ অব্দি ; অপরদিকে বিদেশি সাহেবরাও তাঁকে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, তিনি সব সময়ই পাশ্চাত্য পরিভ্রমণের ব্যাপারে পরমেশ্বরের সংকেতের উপর নির্ভর করতেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ তিনি স্বপ্নে যেমন পেয়েছেন, গুরুপত্নী সংঘজননীর অনুপ্রেরণা ও উৎসাহও তিনি স্বাভাবিকভাবেই পেয়েছেন। পাশ্চাত্য যাওয়ার ক্ষেত্রে এঁদের দিক থেকে কোন বাধা স্বামীজীর জীবনে আসেনি। বরং গুরুর সেই বাণী 'নরেন শিক্ষে দেবে'—একে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁর মন দিন রাত কর্ম করে যেত। এ প্রসঙ্গে একদিনকার ঘটনা উল্লেখ করি।—একদিন শরৎচন্দ্র স্বামীজীকে বিমর্ষ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত আপনাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?' মুহূর্তমাত্র নীরব থেকে স্বামীজী যে উত্তর দিয়েছিলেন তা থেকে তাঁর সেকালীন মানসিকতা ধরা পড়বে। বলেছেন "দেখ বাবা, আমার জীবনে একটা মস্ত বড় ব্রত আছে, অথচ আমার ক্ষমতা এত অল্প যে, আমি ভেবেই আকুল—কী করে এটা উদযাপিত হবে। এ ব্রত পরিপূর্ণ করবার আদেশ আমি গুরুর কাছে পেয়েছি—আর সেটা হচ্ছে মাতৃভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করা। দেশে আধ্যাত্মিকতা অতিশয় ম্লান হয়ে গেছে আর সর্বত্র রয়েছে বুভুক্ষা। ভারতকে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে এবং আধ্যাত্মিকতার বলে জগৎ জয় করতে হবে।" দুটো বক্তব্য এখানে পরিষ্কার। স্বামীজীর মনে যে ব্যাপারগুলি আষ্টেপৃষ্টে লেগেছিল তা হলো—এক. মাতৃভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করা। ভারতাত্মার মূল শক্তিই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। সেই আধ্যাত্মিকতা কুসংস্কার ও

১. 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' (১ম)—গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ২৪৩, ৪র্থ সং বৈশাখ

দেশাচারের ফলে অবলুপ্ত হয়েছে। তাকে জাগাতে হবে—এই চিন্তা স্বামীজীর মনে সদা সর্বদা জাগুরূক ছিল। যার জন্য তিনি সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে প্রচার করেছেন—তাদের দেখিয়েছেন ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সেবার পথ। দুই, পরিব্রজ্যাকালে তিনি লক্ষ করেছিলেন, দেশের অগণিত নরনারী, বৃদ্ধ-শিশু অনাহারে দিন যাপন করছে। তাঁদের অন্নসংস্থাপনের একমাত্র উপায় ছিল কৃষিকর্ম এবং সে কৃষিকর্মও প্রাচীন পদ্ধতিতে অনুসৃত হতো। স্বামীজী চেয়েছিলেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ হোক, শিল্প কারখানা গড়ে উঠুক, বিজ্ঞানের প্রসার হোক, যাতে ভারতবর্ষের মানুষ দুবেলা পেটভরে অন্নগ্রহণ করতে পারে। এই দুই ভাবনা থেকেই তাঁর মনে পাশ্চাত্যে যাওয়ার বাসনা জাগে। তিনি চেয়েছিলেন, আধ্যাত্মিকতা দিয়ে বিশ্ববিজয় করতে হবে। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকস্বরূপ পাশ্চাত্যে রপ্তানী করতে হবে, আর পাশ্চাত্য থেকে আমদানী করতে হবে সে দেশের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং তাদের গতিময় জীবন।

১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ২০/২১ তারিখে স্বামীজী এলাহাবাদ থেকে গাজীপুর রওনা হন। সেখানে প্রথমে তাঁর বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্র মুখার্জী এবং পরে রায়বাহাদুর গগনচন্দ্র রায়ের বাড়িতে অতিথি হন। গাজীপুরে যাওয়ার উদ্দেশ্য পওহারী বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজযোগের গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করা। সেখানে অবস্থান কালে অনেক ইওরোপীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ হয়। গগনবাবুই তাঁকেরসসাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। স্বামীজীর মুখে হিন্দুধর্মের অনেক তত্ত্ব ও দর্শনের কথা শুনে তিনি স্থানীয় জেলা জজ মিঃ পেন্নিংটন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। এই পরিচয় ঘটানোর ব্যাপারে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্তের মতে, শ্রীশ (বা শিরীষ) চন্দ্র বসুরই হাত ছিল।[১] যাইহোক পেন্নিংটন সাহেবও স্বামীজীর মুখে হিন্দু ধর্ম তথা ভারতীয় দর্শনের অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনে তাঁকে ইংলণ্ডে গিয়ে তা প্রচার করতে অনুরোধ করেন। ফলতঃ স্বামীজীর মনে ক্রমশ পাশ্চাত্যে যাওয়ার ব্যাপারে একটা ধারণা বদ্ধমূল হতে শুরু করে। ১৮৯১ এর শেষে অথবা ১৮৯২ এর প্রথম দিকে জুনাগড়ে থাকাকালীন সেখানকার দেওয়ান অফিসের ম্যানেজার সি. এইচ পাণ্ড্যর কাছে তিনি পাশ্চাত্য যাওয়ার অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন।[২] এর পরে পোরবন্দরে এসে পরিচয় ঘটে সেখানকার দেওয়ান পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরং-এর সঙ্গে। পাণ্ডুরং সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সেসময় তিনি বেদের অনুবাদ-কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। স্বামীজীর পাণ্ডিত্য উপলব্ধি করে পণ্ডিতজী বেদের দুরূহ স্থানগুলো ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাঁর সাহায্য নেন এবং স্বামীজীও তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। স্বামীজী সে সময়ে (পানিনি

ব্যাকরণের) পতঞ্জলির মহাভাষ্য পাঠও শেষ করেন। আর এই সঙ্গে তিনি পণ্ডিতজীর প্রেরণায় ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করেন। স্বামীজীর অসাধারণ মেধা, প্রজ্ঞা ও তাঁর চিন্তারাশির অপূর্ব ঔদার্য ও মৌলকতার পরিচয় পেয়ে একদিন পণ্ডিতজী বলেছিলেন, "স্বামীজী, আপনি যে এ দেশে বেশি কিছু করতে পারবেন তা মনে হয় না। এখানে খুব কম লোকই আপনাকে বুঝতে পারবে। আপনার পাশ্চাত্যে যাওয়া উচিত। সেখানে লোকে আপনার কথা বুঝবে এবং আপনি তাঁদের দ্বারা সমাদৃত হবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি হিন্দুধর্ম প্রচারের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও চেতনার উপর এক অত্যুজ্জ্বল আলোক নিক্ষেপ করতে পারবেন।" স্বামীজী পাশ্চাত্য যাওয়ার ব্যাপারে নিজের অন্তর থেকে যতখানি প্রভাবিত হয়েছেন তার থেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন বিভিন্ন দেশিয় রাজা ও পণ্ডিত এবং ইংরেজ সাহেবদের দ্বারা। সাধারণ স্তরের মানুষও তাঁকে পাশ্চাত্য যাওয়ার ক্ষেত্রে প্ররোচিত করেছিল—সে কথায় একটু পরে আসবো।

যাইহোক, পোরবন্দর থেকে স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকায় যান। সেখানে শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত সারদামঠের নির্জন কক্ষে থাকাকালীন ধ্যানমগ্ন স্বামীজীর নয়নে ফুটে উঠেছিল ভারতবর্ষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তারপর দ্বারকা থেকে তিনি যান মাণ্ডবীতে। মাণ্ডবী থেকে তিনি নারায়ণ সরোবর ও আশাপুরীতীর্থ দর্শন করেন। এরপরে কচ্ছের মহারাজার আমন্ত্রণে স্বামীজী ভুজে যান। সেখান থেকে মাণ্ডবীতে ফিরে এসে একপক্ষকাল থাকার পর পলিটানা তীর্থে যান।[১] এরপরে বরোদায় মাত্র অল্প কয়েকদিন থেকে খাণ্ডেয়া পৌঁছান। সেটা ছিল ১৮৯২ সালের ২৭শে ২৮শে এপ্রিল। খাণ্ডোয়া মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটি শহর। সেখানকার উকিল স্ত্রী হরিদাস চ্যাটার্জির বাড়িতে তিনি আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। লক্ষণীয়, সেখানেও স্বামীজী বহু জ্ঞানীগুণী লোকের মনোহরণ করতে পেরেছিলেন। তারা স্বামীজীর গভীর বিদ্যাবত্তা ও প্রজ্ঞার পরিচয় পেয়ে আবিষ্ট হয়েছিলেন। এই খাণ্ডোয়াতেই আমরা সর্বপ্রথম দেখতে পাই, স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের ইচ্ছা আন্তরিকভাবে পোষণ করেছেন। জুনাগড় বা পোরবন্দর থাকাকালীন তিনি প্রথম শুনেছিলেন আমেরিকার চিকাগো শহরে কলম্বাসের আমেরিকা অবিষ্কারের চারশো বছর পূর্তি উপলক্ষে এক বিরাট এগজিবিশন হবে এবং সেখানে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি শিল্প মেলার পাশাপাশি এক ধর্মসভাও আয়োজিত হয়েছে, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতাদের নিজ নিজ ধর্মের উপর বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ঐ ধর্ম মহাসভার খবর ঐ অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার প্রায় এক বছর আগে স্বামীজীর কাছে পৌঁচেছে। খাণ্ডেয়াতে তিনি হরিদাসবাবুর কাছে বলেন, "কেউ যদি

১. স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, স্বামীজী মাণ্ডবী থেকে পোরবন্দরে যান এবং পাঁচ সাত দিন পরে তিনি সেখানে গিয়ে তাঁর দর্শন পান। এই বর্ণনার সঙ্গে অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত Life of Swami Vivekananda গ্রন্থের বর্ণনায় পার্থক্য দেখা যায়।

আমার যাতায়াতের খরচ দেয়, তাহলে আমি নিশ্চয়ই ঐ সভায় যোগদান করবো।" এ কথা বলেন ১৮৯২ সালের জুলাই-এর শুরুতে। খাণ্ডোয়ার হরিদাস চাটার্জীকে খোলাখুলিভাবে চিকাগো যাওয়ার কথা বলার পর তিনি আবার সেই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বেলগাঁও এর ফরেষ্ট অফিসার হরিপদ মিত্রের কাছে। স্বামীজী খাণ্ডোয়া থেকে বোম্বাই যান। সেখান থেকে পুনা, মহাবালেশ্বর, তারপর বেলগাঁও-এ। হরিপদবাবুর স্মৃতিকথা থেকে পাচ্ছি '১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর এক তরুণ সন্ন্যাসী আমার একটি উকিল বন্ধুকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন'[১]। এই তরুণ সন্ন্যাসী, যাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ, তিনি একদিন বিষন্ন মুখে বসে আছেন। হরিপদবাবু তাঁর এই বিষন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে স্বামীজী যা উত্তর দিলেন, তা থেকে তাঁর পাশ্চাত্য যাওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্যটি প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তিনি সেদিন বলেছিলেন,—"এইমাত্র কাগজে পড়ছিলাম, কলকাতায় একটা লোক অনাহারে মারা গেছে। দেখ, পাশ্চাত্য দেশে সমাজের অবহেলায় লোক মারা গেলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু আমাদের দেশে ভিক্ষুক ভিক্ষাপাত্র হাতে দরজায় উপস্থিত হলেই একমুটো চাল পায়। এক দুর্ভিক্ষের সময়ে ছাড়া আমাদের দেশের লোক না খেয়ে মরে না। স্বামীজীর মন সে সময় দুর্ভিক্ষ পীড়িত আর্ত মানুষের জন্য হাহাকার করে উঠেছিল যাতে তাঁর দেশের মানুষ অন্নাভাবে অর্থাভাবে না কষ্ট পায় তার জন্য তাঁর মনে কিছু একটা করার ইচ্ছা জেগেছিল। তিনি নিশ্চয় মনে করেছিলেন, বিদেশে গিয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করে ঐসব মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দিলে ভাল হয়। যাইহোক কলকাতার ঐ সংবাদ পাওয়ার পর একদিন নির্জনে স্বামীজী হরিপদবাবুকে বলেন, চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিবার জন্য তাঁর আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছা আছে। একথা শুনে হরিপদবাবু খুব খুশি হন এবং বেলগাঁও শহর থেকে কিছু চাঁদা তোলার প্রস্তাব করেন। কিন্তু যে কারণেই হোক স্বামীজী তাতে মত দেন নি।

দক্ষিণভারত পর্যটনকালে স্বামীজী তাঁর আমেরিকা যাওয়ার অভিলাষকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন এবং কী কারণে সেখানে যাওয়া প্রয়োজন সেকথাও মহীশূরের মহারাজের কাছে বলেন। স্বামীজী বেলগাঁও ত্যাগ করে মহীশূর রাজ্যের বাঙ্গালোর শহরে এসেছিলেন। সেখানে মহীশূররাজ্যের দেওয়ান স্বনামধন্য স্যার শেষাদ্রি আয়ারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তিনিই স্বামীজীকে মহারাজের কাছে নিয়ে যান। অনতিবিলম্বে মহারাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতায় পর্যবসিত হলে মহারাজ তাঁকে বললেন "স্বামীজী, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?" স্বামীজী তখন তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য খোলাখুলি ভাবে ব্যক্ত করে বলেন, পাশ্চাত্য দেশসমূহের সঙ্গে ভারতবর্ষের এখন একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার—চাই আদান প্রদান। ভারতবর্ষের যে অধ্যাত্মসম্পদ ও দর্শন রয়েছে তার সঙ্গে

১. স্বামী বিবেকানন্দ—মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, পৃঃ ২৬১

একীভূত করা দরকার পাশ্চাত্যের জড়বিজ্ঞানের জ্ঞানকে। অপরদিকে সেদেশেরও প্রয়োজন আমাদের অধ্যাত্মজ্ঞানকে গ্রহণ করা এবং জীবনের সঙ্গে অন্বয়সাধন করা। তারা আমাদের বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প-প্রযুক্তি ইত্যাদি ব্যবহারিক শিক্ষা সকল দেবে, আর পরিবর্তে আমরা দেবো আমাদের আধ্যাত্মিক লোকের সন্ধান। সেকারণেই মূলত আমি আমেরিকায় গিয়ে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের কাছে বেদান্তের মহান সত্য সকলই প্রচার করতে ইচ্ছা করেছি।' স্বামীজীর আবেগময় কথাগুলো শুনে মহারাজা মুগ্ধ হয়ে তাঁর আমেরিকা যাওয়ার সমস্ত ব্যয় বহন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজী যে কারণেই হোক ঠিক তখনই মহারাজের কাছ থেকে কোন সাহায্য নিতে চান নি। লক্ষণীয়, রামেশ্বর দর্শনের পূর্বে ঐ সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। যাইহোক সেখান থেকে কোচিন হয়ে স্বামীজী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রমে যান। সময়টা ছিল ডিসেম্বর, ১৮৯২ সাল। ত্রিবান্দ্রমে তিনি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুন্দররাম আয়ারের অতিথি হন। এই সুন্দররাম আয়ারের স্মৃতি কথা থেকে স্বামীজীর পাশ্চাত্য যাওয়ার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ সম্পর্কে অনেক কিছু খবর পাওয়া যায়। এই স্মৃতিকথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, স্বামীজীর মন সে সময় ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নতি কীভাবে করা যায়—তার জন্য সদা সর্বদা উন্মুখ থাকতো। ত্রিবান্দ্রম থেকে স্বামীজী পূর্ব দিকে রামেশ্বরে যান। যাওয়ার পথে মাদুরায় তিনি রামনাদের রাজা ভাস্কর সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

স্বামীজীর এই সময়ের ভ্রমণ সম্পর্কে খবরাখবর আমি প্রচলিত জীবনী থেকে লিখলাম। অবশ্য শ্রীসুন্দররাম আয়ারের পুত্র প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রী কে. এস. রামস্বামী শাস্ত্রী 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে এই সময়কার ভ্রমণসূচীর একটু ভিন্ন ধরণের বর্ণনা দিয়েছেন—"১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ ত্রিবান্দ্রম হইতে কেপ কোমরিন (কন্যাকুমারী) যান,[১] (১৯৫৩ সেপ্টেম্বর, ৩৮৫)।

কন্যাকুমারী থেকে স্বামীজী পদব্রজে রামনাদে যান এবং সেখান থেকে পণ্ডীচেরীতে এবং শেষে মাদ্রাজে যান। বিবেকানন্দ গবেষক অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু স্বামীজীর এই সময়ের ভ্রমণসূচী সম্পর্কে কোন শেষ সিদ্ধান্ত করেন নি। যাইহোক, শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের জেনারেল সেক্রেটারীকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজীর চিকাগো ধর্মসমহাসভায় যাওয়ার পূর্বের বিবরণ এবং যাওয়ার ব্যাপারে কোন কোন ব্যক্তিবর্গের সাহায্য পেয়েছিলেন তার উল্লেখ আছে—"............১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে স্বামীজী মহারাজ আমাদের বাড়ী হইতে যাইবার সময় বলেন যে, তিনি কন্যাকুমারী যাইতেছেন। তারপর তিনি মাদ্রাজে যান এবং ডাক্তার স্যার জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, রামনাদের রাজা ও অপরদের সাহায্যে চিকাগো যাইয়া চিকাগোর ধর্মমহাসভায় উপস্থিত থাকিতে সমর্থ হোন।"[২]

১. স্বামী গম্ভীরানন্দের 'যুগানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ—২৬৬, ১ম খণ্ড।

২. স্বামী গম্ভীরনন্দের 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃষ্ঠা—২৬৬, ১ম খণ্ড।

পূর্বেই বলেছি, ত্রিবান্দম থেকে রামেশ্বর যাওয়ার পথে মাদুরায় রামনাদের রাজা ভাস্কর সেনাপতির সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় ঘটে। ক্রমশঃ রাজা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্বামীজী এই সুশিক্ষিত শিষ্যের কাছে জনশিক্ষা, কৃষির উন্নতি, ভারতের বর্তমান সমস্যাসমূহ এবং ভবিষ্যতের অভ্যুদয়-সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়ে খোলাখুলিভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেন। গুরুর মুখে এই সব কথাশুনে বিমুগ্ধ রাজা তাঁকে সর্বপ্রথমে চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। স্বামীজীকে তিনি বলেন, "প্রাচ্যের অধ্যাত্ম আলোকের প্রতি পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ও ভারতের উন্নতির জন্য তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মের ভিত্তি স্থাপনের উহাই সর্বাপেক্ষা অনুকূল সুযোগ।" এজন্য তিনি তাঁকে অর্থ সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের পরিব্রাজক অবস্থার সেই পর্যায়ে দেখবো, তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনোদ্দেশ্য স্থির করে ফেলেছেন। পরিব্রাজক জীবনে মাতৃভূমির নানা প্রান্ত ঘুরে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, সে অভিজ্ঞতা ছিল বড়ই মর্মান্তিক।

আমরা তাঁর লেখা সেই সময়কার চিঠি থেকে তা জানতে পারি—ভারতবর্ষের দুঃখক্লিষ্ট চিত্র, ভারত-সংস্কৃতি ও ধর্মের গ্লানিময় অবস্থা যা তাঁকে যারপরনাই ভাবিত করে তুলেছিল ঐ সময়ে। পরিব্রজ্যার শেষ পর্যায়ে তিনি রামেশ্বর দর্শন করে কন্যাকুমারীতে পৌঁছান। ভারতের শেষ উপলখণ্ডের উপর বসে তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। অতীত ও বর্তমান ভারতবর্ষের চিত্রকে মিলিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেন। কী ছিল অতীত, কী অবস্থায় উপনিত হয়েছে সেই ভারতবর্ষ, আর কী অবস্থায় রূপান্তরিত করা প্রয়োজন এই ভারতবর্ষকে—তার কর্মসূচী তিনি তখনই নির্ধারণ করে নিয়েছেন। কী চিন্তা ছিল তাঁর মাথায়? তিনি চাইছিলেন, ভারতের অগণিত মানুষের দুঃখমোচন—ভারতের পুনরোভ্যুদয়—ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানের দ্বারা পৃথিবী বিজয়। ঐ সময়ই তিনি স্থির সঙ্কল্প করলেন, ঐ সুদূর বিস্তৃত নীলমহাসাগর পার হয়ে তিনি আমেরিকায় যাবেন এবং সেখানে গিয়ে মস্তিষ্কের সাহায্যে অর্থ উপার্জন করে সেই অর্থের মাধ্যমে ভারতের জনগণের আর্থিক উন্নতির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। ঐ সময়কার স্বামীজীর গাঢ় চিন্তা উদ্ভাসিত একটি চিঠি ঃ——"এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র ও অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না ; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম—কুমারিকা অন্তরীপে মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুকরোর উপর বসে। এই যে এতজন আমরা সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে দর্শন শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না' গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবনযাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা ; পাজী (পুরোহিত) বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু'পা দিয়ে দলছে।.......আমাদের জাতটা নিজের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, সেইজন্য ভারতে এত দুঃখ কষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই করতে হবে—নীচ জাতিকে তুলতে হবে। হিন্দু,

মুসলমান, খ্রিষ্টান সকলেই পায়ে দলেছে। আবার তাদের উঠাবার যে শক্তি, তাও আমাদের নিজেদের ভেতর থেকে আনতে হবে। গোঁড়া হিন্দুদেরই এ কাজ করতে হবে। সব দেশেই যা কিছু দোষ দেখা যায়, তা তাদের ধর্মের দোষ নয়, ধর্ম ঠিক ঠিক পালন না করার দরুনই এইসব দোষ দেখা যায়। সুতরাং ধর্মের কোন দোষ নাই, লোকেরই দোষ। এই করতে গেলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই পয়সা। গরুর কৃপায় প্রতি শহরে আমি দশ পনের জন লোক পাব। পয়সার চেষ্টায় তারপর ঘুরলাম। ভারতবর্ষের লোক পয়সা দেবে! তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজগার করব, করে দেশে যাব, আর আমার বাকী জীবন এই এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিয়োজিত করব।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৪১২—১৩)

স্বামীজীর পাশ্চাত্যে যাওয়ার উদ্দেশ্য এই উদ্ধৃতির মধ্যে সুস্পষ্ট। আরও দুটি পত্রের উল্লেখ এখানে আমরা করবো। প্রথম পত্রটি ২২শে আগষ্ট জুনাগড়ের দেওয়ানজীকে লিখিত। দ্বিতীয় পত্রটি ২০শে সেপ্টেম্বর খেতরী নিবাসী পণ্ডিত শঙ্করলালকে লিখিত। দুটি পত্রই যথাক্রমে উল্লেখ করবো। এই পত্রদুখানিতেও তৎকালীন ভারতবর্ষের সমাজে ধর্মের নামে যে ঘোর অধর্মের বন্যা বয়ে ছিল, তার কথা এবং সেইসঙ্গে স্বামীজীর বিদেশ যাওয়ার উদ্দেশ্যও প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম পত্রের অংশ বিশেষ—"একটি বিষয় অতি দুঃখের সহিত উল্লেখ করছি—এ অঞ্চলে সংস্কৃত এবং অন্যান্য শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব। এতদঞ্চলের লোকদের মধ্যে ধর্মের নামে পানাহার ও শৌচাদি বিষয়ে একরাশ কুসংস্কারপূর্ণ দেশাচার আছে—আর এগুলিই যেন তাদের কাছে ধর্মের শেষ কথা! হায় বেচারারা। দুষ্ট ও চতুর পুরুতরা যতসব অর্থহীন আচার ও ভাঁড়ামিগুলোকেই বেদের ও হিন্দুধর্মের সার বলে তাদের শেখায়।.............কলির ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসদের কাছ থেকে ভগবান তাদের বাঁচান। দ্বিতীয় পত্রের বক্তব্য হলো ঃ—"আমাদের দেশে পর্যবেক্ষণ ও সামাণ্যীকরণ প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ বিজ্ঞানসমূহের অত্যন্ত অভাব দেখিতে পাই।....সুতরাং বুঝিতেছেন, আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশ যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজযন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় একটি জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংস্রব রাখিতে হইবে।" সুতরাং স্বামীজী স্থির করলেন, আমেরিকা তিনি যাবেনই এবং প্রয়োজন হলে সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ অর্থোপার্জনেও তিনি সচেষ্ট হবেন। স্বামীজী ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ পাশ্চাত্যের সর্বত্র বিতরণ করে তার বিনিময়ে অর্থোপার্জন করতে চেয়েছিলেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ স্বামীজীর চিন্তার এই বিশেষ দিকটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য ঃ "........তাঁহার (স্বামীজীর) মতে প্রাচী ও প্রতীচীর মিলন ঘটিবে এইরূপ সশ্রদ্ধ আদান প্রদানেরই মাধ্যমে। ইহা ছিল তাঁহার অন্যতম পরিকল্পনা। তিনি ইহাও চাহিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যের কর্মোদ্যমের সঙ্গে প্রাচ্যের ভগবাধ্যানের

মিলন ঘটাইতে হইবে।"[১] সেদিন তিনি তাঁর সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর করলেন। সাগর অতিক্রম করে তিনি গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দিষ্ট কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। এই ইচ্ছার পিছনে নিশ্চয়ই গুরুদেবের আদেশকে তিনি সবার উপরে মান্য করছেন। বিভিন্ন রাজা, পণ্ডিত, দেওয়ান এবং অগণিত মানুষের উৎসাহ পেলেও তিনি তখনই পাশ্চাত্য যাওয়ার ব্যাপারটিকে স্থির করে ফেলতে পারেন নি। গুরুর নির্দেশই সবার উপরে স্থান পেয়েছে। বিশ্ববিজয় করে ভারতের মান সম্মান ও ইতিহাসকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। ভারতবর্ষের মানুষের কল্যাণের জন্যই তিনি পাশ্চাত্যে পাড়ি জমিয়েছিলেন—এ কথাও চরম সত্য।

যাইহোক, ভারত পরিক্রমার শেষ পর্যায়ে স্বামীজী রামনাদে উপস্থিত হন। সেখানকার রাজা ভাস্কর সেতুপতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। সেতুপতি স্বামীজীর গুণমুগ্ধ হয়ে শিষ্যত্বও গ্রহণ করেন। স্বামীজীর মুখে ভারতীয় জীবনের তদানীন্তন সমস্যা ও সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া ভারতীয় ধর্মজীবন, ভারতীয় ধর্মের মহিমা এবং পাশ্চাত্য দেশে তা প্রচারের সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা করেন। এসব শুনে সেতুপতি স্বামীজীকে চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করার জন্য বারংবার অনুরোধ করেন এবং একথাও বলেন যে, তাঁর যাওয়া—থাকার জন্য যথাসাধ্য অর্থব্যয় তিনি করবেন। সেতুপতি স্বামীজীকে আরও বলেন যে, তিনি যদি শিকাগো ধর্মসভায় যোগদান করে ভারতবর্ষের মূল ভিত্তি আধ্যাত্মিকতাকে বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ করেন, তবে তাঁদের দৃষ্টি ভারতবর্ষের উপর পড়বে। বলাবাহুল্য, সেতুপতির দৃষ্টিও সুদৃঢ় বিস্তৃত ছিল। তাঁর কথায় স্বামীজীও গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই মুহূর্তে পাশ্চাত্যে যাওয়ার ব্যাপারে কোন শেষ সিদ্ধান্তের কথা জানান নি। কারণ তখনও দক্ষিণ ভারতের দু-একটি স্থান দর্শন করতে বাকী ছিল। তাই রাজাকে পরিত্যাগ করে রামেশ্বর এবং তারপরে কন্যাকুমারী দর্শন শেষে পথক্লান্ত স্বামীজী রামনাদ ও তারও উত্তরে মাদুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন শেষে পণ্ডিচেরীতে এসে পৌছলেন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মাদ্রাজে পৌছানোর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই স্বামীজী পাশ্চাত্য যাওয়ার ইচ্ছার কথা তাঁর ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত মহলে প্রকাশ করেছেন। কী উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যে যাওয়া দরকার, সেকথাও তিনি সর্বজন মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। জড়বাদী পাশ্চাত্য দেশে ধর্মের প্রচার কতখানি আবশ্যক তা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন। তাঁর কথার গুরুত্ব সকলে অনুধাবন করতে পেরে সকলেই তাঁকে পাশ্চাত্যে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করেন। বিশেষকরে তাঁর উৎসাহী শিষ্যেরা তাঁর ঐ উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসু করার জন্য অর্থসংগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং প্রথম দফায় পাঁচশো টাকা সংগ্রহ করে স্বামীজীকে দিতে আসেন। কামকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামীজী টাকা দেখে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। সেই মুহূর্তে তাঁর মন হয়ে উঠেছিল দ্বিধাগ্রস্থ। তিনি ভাবছিলেন, তাঁর চিকাগো

১. যুগনায়ক (১ম) পৃঃ ২৬৯।

ধর্মসভায় যাওয়া কী জগন্মাতার ইচ্ছায় হচ্ছে, না তিনি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা ও অহংকারের দ্বারা চালিত হচ্ছেন এবং এ ব্যাপারটি পরিস্কার করার জন্যই তিনি শিষ্যদের বললেন—"আমি আমেরিকা যাত্রার পূর্বে বুঝতে চাই আমার যাওয়া মায়ের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। সুতরাং তোমরা যা সংগ্রহ করেছ, তা গরীবদের বিলিয়ে দাও। আমার যাওয়া যদি মায়ের ইচ্ছায় হয় টাকা তবে আপনা থেকেই জুটে যাবে।" দ্বিধাগ্রস্থ স্বামীজীর নির্দেশে ঐ পাঁচশো টাকা দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হয়েছিল। স্বামীজী কেন এই টাকা পাশ্চাত্যে যাওয়ার জন্য রেখে দিলেন না, কেন তা বিলিয়ে দিলেন, এ সম্পর্কে ইংরেজী জীবনীতে একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। অপরদিকে স্বামী গম্ভীরানন্দ এই ৫০০ টাকা বিলিয়ে দেওয়ার পিছনে একটা লৌকিক ব্যাখ্যা-ও দিয়েছেন। আমরা দুটি ব্যাখ্যায় যথাক্রমে এখানে নিবেদন করছি। ইংরেজী জীবনীর আধ্যাত্মিক ব্যাখাটি এমন—

"But the Swami, when he saw the money, grew nervous. He said to himself, 'Am I following my own will ? Am I being carried away by enthusiasm ? Or is there a deep meaning in all that I have thought and planned ? He prayed, 'O Mother, show me thy will ! It is thou who art the Doer.Let me be only thy imstrument'.......And he said to the astonished disciples, 'My boys, I am determined to force the Mother's will, she must prove that it is her intention that I should go, for it is a step in the dark. If it be her will, then money will come again of itself, therefore, take this money and distribute it amongst the poor.' His disciples obeyed him without a word and the Swami felt as though a great burden had been taken off his shoulders"[১]

স্বামী গম্ভীরানন্দজী আধ্যাত্মিক দিকটি বজায় রেখেও যে লৌকিক ব্যাখাটি দিলেন তা উল্লেখ করছি—"এদিকে উৎসাহী ভক্তবৃন্দ প্রায় পাঁচশত টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। কিন্তু স্বামীজী সে অর্থ দেখিয়া যেন হঠাৎ দ্বিধায় পড়িলেন—এ অর্থ তো বিদেশযাত্রার পক্ষে অকিঞ্চিতকর ; তাঁহার বিদেশগমন যদি বিধাতার অভিপ্রেতই হয়, তবে আয়োজন এমন তুচ্ছ কেন, ভক্তদের প্রযত্ন এরূপ অসাফল্য গ্রস্থ কেন?" এই পর্য্যন্ত লৌকিক ব্যাখ্যা। তিনি ইংরেজী জীবনীকারের মতো একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও রেখেছেন।—অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লৌকিক দিকটিকে গুরুত্ব না দিয়ে এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটিকেই যথাযথ মনে করেছেন। লৌকিক দিকটিকে তিনি যথেষ্ট যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন।[২] আমাদের মনে হয়, স্বামীজী তখনও পাশ্চাত্য যাওয়ার ব্যাপারে কিছুটা সন্দিহান ছিলেন, ছিলেন

দ্বিধাগ্রস্থও। অথবা খামখেয়ালীপনার বশবর্তী হয়েও ঐ টাকা বিলিয়ে দিতে পারেন। অর্থের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন বিভিন্ন রাজ-রাজারার কাছ থেকে ; এমন কী আমরা ইতিপূর্বে আলোচনায় দেখেছি, অনেক রাজা স্বামীজীর পাশ্চাত্য যাওয়ার ইচ্ছা জেনে তখনই অর্থ সাহায্য দিতে চেয়েছিলেন, স্বামীজীই তখন নেন নি, পরে চেয়ে নেবেন বলেছিলেন। সুতরাং পেরুমলের সচেষ্টতায় সংগৃহিত অর্থ যথেষ্ট না হলেও স্বামীজীর পক্ষে হতাশ হওয়ার মতো নিশ্চয়ই হয় নি। বরং বলা যেতে পারে যে, সে সময় স্বামীজী সার্বিকভাবেই জগজ্জননীর উপর নির্ভর করে ছিলেন। কারণ তখনও তিনি দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন এই ভেবে যে তাঁর সঙ্কল্প সার্থক হবে কিনা! একারণেই তিনি সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ও জগজ্জননীর শ্রীচরণে আত্মনিবেদিত প্রাণ হয়ে নিভৃত জীবনযাপন করছিলেন এবং মায়ের আহ্বানের অপেক্ষায় ছিলেন।[১]

স্বামীজীর মনের অবস্থা যখন এই রকম তখন হায়দরাবাদের জনগণের পক্ষ থেকে আহ্বান এলো। স্বামীজী সেখানে গেলেন ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩। ১৩ই ফেব্রুয়ারী সেকেন্দারাবাদের একশত হিন্দু অধিবাসীর একটি কমিটির অনুরোধে স্থানীয় মেহবুব কলেজে বক্তৃতা করেন। অবশ্য তার আগের দিন ১২ ফেব্রুয়ারী নিজাম বাহাদুরের শ্যালক নবাব বাহাদুর স্যার খুরসিদ জা. কে. সি. এস. আই মহোদয়ের আমন্ত্রণ অনুসারে নিজাম বাহাদুরের রাজপ্রসাদে তাঁদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ থেকেই উভয়ের মধ্যে চরম সৌহাদ্য সৃষ্টি হয়। কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী সর্বজনীন সনাতনধর্ম প্রচারের জন্য পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর বাগ্মীতা ও যুক্তিপূর্ণ কথায় মুগ্ধ হয়ে স্যার খুরসিদ জা ১০০০ টাকা দিতে চান। স্বামীজী পূর্বের মতোই তখনই সেই টাকা নিতে অস্বীকার করেন এবং ভবিষ্যতে কার্যক্ষেত্রে নামার সময়কালে তিনি ঐ টাকা চেয়ে নেবেন এই অঙ্গীকার করেন। স্যার খুরসিদ ছাড়া হায়দারাবাদ স্টেটের প্রধানমন্ত্রী স্যার আসমান জা. কে. সি. এস. আই. পেস্কার মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর এবং মহারাজা সিউরাজ বাহাদুরও স্বামীজীর আমেরিকায় গিয়ে সনাতন ধর্ম প্রচারের প্রস্তাবের সমর্থন করেন। শুধু মহারাজ বা রাজন্যবর্গই নয়, সাধারণ মানুষও তাঁর ঐ প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়ে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। মহবুব কলেজে প্রদত্ত 'পাশ্চাত্যে দেশে আমার গমনোদেশ্য' বক্তৃতা শোনার পর বেগম বাজারের ব্যাঙ্কারগণ শেঠ মতিলালের নেতৃত্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং পাশ্চাত্য যাওয়ার ব্যাপারে সমর্থন জানিয়ে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামীজী হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করে মাদ্রাজে রওনা হন। হায়দরাবাদে বিদায়কালে এবং মাদ্রাজে পৌছানো কালে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল। স্বামীজী ঐ সময় ঐসব অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। যাইহোক, মাদ্রাজে এসে স্বামীজী

১. যুগনায়ক বিবেকানন্দ—১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৯

ধর্মালোচনা করে ভক্ত-শিষ্যদের মাঝখানে সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন ; আর অন্তরের নিভৃতে তিনি তখন গুরু ও জগন্মাতার নির্দেশের অপেক্ষায়। পাশ্চাত্য যাওয়ার প্রাক্‌মুহূর্তে ভিতরে ভিতরে তিনি গভীর চিন্তা করতেন। তাছাড়া এ ব্যাপারে শিষ্যদেরও তাড়া ছিল। তারা মার্চ ও এপ্রিল মাসে নব উদ্যমে স্বামীজীর পাশ্চাত্য যাওয়ার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে লেগে গেলেন। এঁদের পুরোধা ছিলেন আলাসিঙ্গা পেরুমল। স্বামীজীও ঐ সব শিষ্যদের বলেছিলেন, 'তোমরা মধ্যবিত্ত তথা সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করবে। তাদের দেওয়া টাকায় আমি পাশ্চাত্যে যাব।' কারণ তিনি তাঁদের কল্যাণের জন্যই পাশ্চাত্যে যেতে চান। এঁদের অসহায় জীবন-যাপনের দিকে তাকিয়ে স্বামীজী অস্বাভাবিক দুঃখ পেয়েছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দকে আবু রোড স্টেশনে (বোম্বাই এর সন্নিকটে) বলেন, ঐ সব দুঃস্থ মানুষের জন্যই তিনি পাশ্চাত্য যাচ্ছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতিকথায় এই বিষয়টি উল্লেখ আছে। আমরা রোঁলার "The life of Vivekananda" গ্রন্থ থেকে তা উল্লেখ করছি—

"I have now travelled all over india.....But alas it was agony to me, my brothers, to see with my own eyes the terrible poverty and misery of the masses and I could not restrain my tears ! It is now my firm conviction that it is futile to preach religion amongst them without first trying to remove their Povery and their Sufferings. It is for this reason—to find more means for the Salvation of thc poor of India—that I am now going to—America."[১]

আলাসিঙ্গা প্রমুখ যুবকেরা যখন স্বামীজীর বিদেশ যাওয়ার অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত স্বামীজী তখনও বিদেশ যাত্রা ব্যাপারে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। একদিকে তিনি ভাবছিলেন, এই যে যুবকেরা বিপুল উদ্যমে অর্থসংগ্রহ করছে তা নিশ্চয়ই জগজ্জননীর অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত ; আবার কখন কখনও তিনি তাঁর বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজন ও ফল সম্বন্ধে সন্দিহান। আর এই মানসিক অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জগজ্জননী ও শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে প্রাণ মন সঁপে রাখতেন। একদিন আদেশ মিললো। আদেশ কর্তা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিন রাত্রে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় স্বামীজী স্বপ্ন দেখছেন, সম্মুখে বিস্তৃত মহাসাগরের একূল থেকে অবতরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ হেঁটে অপর কূলে যাচ্ছেন এবং তাঁকেও অনুসরণ করার জন্য ইশারা করছেন। তন্দ্রাভঙ্গ শেষে স্বামীজীর কানে ধ্বনিত হচ্ছিল গুরুর বাণী "যাও"। স্বামীজী এই স্বপ্নকে গুরুর আদেশ রূপেই গ্রহণ করেছিলেন। সেই মুহূর্তে তাঁর মন প্রাণ এক অনাবিল আনন্দে ভরে উঠেছিল। মুহূর্তে তাঁর সংশয়, সন্দেহ দূরীভূত হয়ে এক প্রবল শক্তি সঞ্চারিত হয়ে উঠলো তাঁর হৃদয়ে। শুধু গুরুর

১. The life of Vivekananda, Page—30—31.

আদেশ ও আশীর্বাদ নয়, গুরু পত্নী শ্রীশ্রীমায়েরও আদর্শ ও আশীর্বাদ তিনি পেয়েছিলেন সেকথা আমরা সকলেই জানি।

যাত্রার সংকেত পাওয়ার পর আর বেশিক্ষণ বিলম্ব করতে চাননি স্বামীজী। তাছাড়া প্রস্তুতি এখনও বাকী। অবশ্য আয়োজন চলছে পুরোদমে। ঠিক এমনই সময় হঠাৎ খেতড়ীরাজ্যের প্রাইভেট সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহন স্বামীজীকে খেতড়িতে নিয়ে যাবার জন্য উপস্থিত হলেন। স্বামীজীর আশীর্বাদে রাজার পুত্র সন্তান লাভ হয়েছে। পুত্রমুখদর্শনে উৎফুল্ল রাজা রাজ্যময় এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করেছেন। রাজার আমন্ত্রণ, সেখানে অবশ্যই উপস্থিত থেকে নবজাতককে আশীর্বাদ করতে হবে। জগমোহনের কাছ থেকে একথা শুনে স্বামীজী খুব বিড়ম্বনার মধ্যে পড়লেন। আর একমাস পরে ৩১শে মে তিনি আমেরিকা যাত্রা করবেন। যাবার-প্রস্তুতির জন্য সবসময় ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। সুতরাং খেতড়ি যাবার ব্যাপরে জগমোহনের কাছে তিনি দ্বিধা প্রকাশ করলেন। জগমোহনও নাছোর ছিলেন। তিনি বললেন, মহারাজ আপনার পাশ্চাত্য যাবার বন্দোবস্ত করবেন ; আপনি উদ্বিগ্ন না হয়ে অন্তত একদিনের জন্য খেতড়ি চলুন। অবশেষে স্বামীজী সম্মত হয়ে ২১শে এপ্রিল খেতড়িতে পৌঁছান এবং মহাসমারোহে তিনি অভ্যর্থিত হন। রাজকুমারকে আশীর্বাদ করা শেষ হলে ১০ই মে তিনি খেতরি ত্যাগ করে বোম্বাই আসেন। মুন্সী জগমোহনকে খেতড়ি রাজ স্বামীজীর আমেরিকা যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করতে বলেন। বোম্বাই পর্যন্ত স্বামীজীর সঙ্গী ছিলেন জগমোহন। বোম্বাই এসে দেখলেন পেরুমলও উপস্থিত। ইংরেজী জীবনী এবং স্বামী গম্ভীরানন্দের 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' এ খেতড়ি মহারাজের স্বামীজীর বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে সাহায্যের উল্লেখ আছে। আমরা যথাক্রমে দুটো মন্তব্যই উল্লেখ করবো। কারণ এ থেকে অনুমিত হবে, খেতড়ি মহারাজ স্বামীজীর বিদেশ যাত্রার ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি তা নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন। ইংরেজী জীবনীতে আছে ;

"He (Jagmohan Lal) had been instructed to pay the expenses of the Swami's journey and to provide him with everythng necessary for his Voyage to America."

"The Maharaj of Khetri had instructed Jagmomhan Lal to make every possible arrangement for the Swami's compfort, the Swami was therefore outfitted porperly, Presented with a handsome purse and a first class ticket on the peninsular and orient company's stremer, 'Peninsular'."

স্বামী গম্ভীরানন্দ ঐ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ—"খেতড়ি রাজ ও মুন্সীজীকে বলিয়া দিয়াছিলেন, স্বামীজীর জন্য যেন সর্ব প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তিনি রাজগুরুর সম্মানেই ভ্রমণ করিতে পারেন। অতএব স্বামীজীর আপত্তি সত্ত্বেও মুন্সীজী রেশমের পোশাক

করাইয়া দিলেন—আলখাল্লা ও পাগড়ি। সঙ্গে কিছু অর্থও দিলেন এবং পেনিনসুলার অ্যাণ্ড ওরিয়েন্ট কোম্পানীর একখানি প্রথমশ্রেণীর টিকিট সহ তাঁহাকে ঐ কোম্পানীর "পেনিনসুলার" নামক জাহাজে তুলিয়া দিলেন। সেদিন ৩১ শে মে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।"[১]

স্বামীজী অবশেষে পাশ্চাত্য জগতে পাড়ি দিলেন। তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে সুদূঢ় বিস্তৃত নীল মহাসাগর আর দৃষ্টির গভীরে স্বতঃস্ফূর্ত মাতৃভূমির জন্য স্বপ্ন ও সাধনা।

॥ ২ ॥

ইতিপূর্বে আলোচনায় আমরা দেখেছি—পাশ্চাত্য যাত্রা—পরিশেষে আমেরিকা যাত্রায় ইচ্ছুক স্বামীজীকে তাঁর গুণগ্রাহী শিষ্য-ভক্তবৃন্দ অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁরা মহারাজা রাজা থেকে শুরু করে সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ পর্যন্ত—পেরুমল যাঁদের অগ্রনায়ক। সাধারণ মানুষদের কাছে আবেদন জানিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে একটু সময় লেগেছিল এবং নিঃসন্দেহে সেটা স্বাভাবিক। মাদ্রাজের লোকেরা প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। প্রতিশ্রুতি রেখেছেন রামনাদ ও মহীশূরের রাজা। কিন্তু এঁদের সকলের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা সংগ্রহ না হবার পূর্ব পর্য্যন্ত স্বামীজী গভীরভাবে হতাশাচ্ছন্ন ছিলেন—তাঁর ঐ সময়কার লেখা চিঠিপত্র পাঠ করে সেকথা আমাদের মনে হয়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে খেতড়ী পর্ব বা প্রাক পাশ্চাত্য যাত্রা পর্বের গবেষণামূলক ইতিহাস আমরা পেয়েছি শ্রীযুক্ত বেণীশঙ্কর শর্মার লেখনী মারফৎ। বইটির নাম "স্বামী বিবেকানন্দ ঃ এ ফরগটন চ্যাপটার অব হিজ লাইফ।" খেতরী পর্বে প্রামাণিক বিবরণ আমরা পেয়ে থাকি স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে এবং স্বামীজীর জীবনীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন স্বামী গম্ভীরানন্দের লেখা 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থেও এই দিকটি সম্পর্কে আলোচনা আছে। স্বামীজীর পাশ্চাত্য যাত্রার খরচ খরচার ক্ষেত্রে কার অবদান বেশি, এ নিয়ে তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছেন। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, শ্রীযুক্ত বেণীশঙ্কর শর্মার সঙ্গে গম্ভীরানন্দজীর মতামতের পার্থক্য রয়েছে। শ্রীযুক্ত শর্মা অপ্রকাশিত পত্রাবলী ও নূতন তথ্যের সাহায্যে তাঁর গ্রন্থে—স্বামীজীর ও খেতড়ির মহারাজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইতিহাস উন্মোচিত করেছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করেছেন, স্বামীজীর চিকাগো ধর্মসম্মেলনে যাত্রায় সর্বাধিক সাহায্য করেছেন খেতড়ির রাজা ; মহীশূরের মহারাজা, রামনাদের রাজা বা মাদ্রাজী ভক্তগণ নন। ইংরাজী জীবনীরও সেই মত আমরা পূর্বে তা বলেছি। স্বামী গম্ভীরানন্দ শর্মাজীর দাবীকে অতিরঞ্জিত মনে করেছেন। তিনি স্বামীজীর চিঠিপত্র এবং বক্তৃতাবলীর উপর নির্ভর করে বলেছেন, খেতড়ির মহারাজার এ ব্যাপারে সাহায্যের কোন উল্লেখ নেই। তাঁর বক্তব্য, খেতড়ির মহারাজা টিকিটের ব্যাপারে কিছু সাহায্য করেছেন ঠিকই, কিন্তু তার বেশি কিছু

১. যুগনায়ক বিবেকানন্দ (১ম) পৃঃ ২৮৯

নয়। স্বামীজীর জন্য যে নিম্নতর শ্রেণীর টিকিট কাটা ছিল জগমোহন সেটিকে উচ্চতর শ্রেণীর করে দিয়েছিলেন।

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে স্বামীজীর বহু চিঠিপত্র, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার প্রকাশিত সংবাদপত্র খুঁজে বহু নতুন তথ্যের আবিষ্কার করেছেন। তিনি-ও যথেষ্ট যুক্তির সাহায্যে স্বামীজীর পাশ্চাত্য-যাত্রার খরচ খরচার ক্ষেত্রে খেতড়ির রাজার অবদান যে সর্বাধিক—শ্রীযুক্ত বেণীশঙ্করের মতো তা বলতে চেয়েছেন। আমরাও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসুর সঙ্গেই একমত। কতকগুলি চিঠি এবং সংবাদ পত্রের বিবরণ দেখে মনে হয়, খেতড়ির মহারাজের সাহায্যের কথা স্বামীজী চিঠি-পত্রে কোথাও উল্লেখ না থাকলেও মহারাজ অজিত সিংহের কাছ থেকে আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারে সব থেকে বেশী সাহায্য পেয়েছিলেন। প্রথমে অজিত সিংহের ১১ এপ্রিলের চিঠি উল্লেখ করি। জগমোহনকে তিনি লিখেছেন ঃ—"তোমার সুদীর্ঘ চিঠি আজ সকালে এখানে এসে পৌঁছেছে। তার থেকে মোটকথা আমি এই বুঝেছি ঃ এক. খুব কিছু ভাল লোক নন এমন কোনো ব্যক্তির প্রতিশ্রুতির উপরে স্বামীজী নির্ভর করেছিলেন। দুই. রামনাদের রাজা তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে দ্বিধা করেছেন। তিন. আমরা অন্ততঃপক্ষে তিন হাজার টাকা দিতে পারব কিনা সে সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ। আমাদের রাজ্যের লোকজনের কথা ভেবে পুণ্যাত্মা স্বামীজী সম্বন্ধে তাদের মনোভাব কী দাঁড়াবে সে বিষয়ে চিন্তা করে ঐ সন্দেহ তুমি করেছ। চার, স্বামীজীর ভক্তেরা তাঁর যাত্রার জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন। পাঁচ. চাঁদার মারফত ঐ অর্থ সংগ্রহ চেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে তোমার পুরোপরি ভরসা নেই, কারণ তুমি লিখেছে যে, স্বামীজী আফগানিস্থানের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটেই যাত্রা করতে পারেন। ছয়. স্বামীজী যথার্থই ইউরোপ যেতে ইচ্ছুক। সাত. এখানকার গরম হাওয়া লু'তে স্বামীজীর অবস্থা কী হবে—সে সম্বন্ধে তুমি আশঙ্কিত। আট. তুমি খুব সংকট অবস্থায় রয়েছ মনে করছ।" জগমোহন স্বামীজীর ইউরোপ যাত্রাকে সমর্থন করে লিখেছিলেন—"ইউরোপ যাত্রা সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীকে আমি মনে প্রাণে সমর্থন করি, যখন দেখছি, ইউরোপে ঐরকম বিরাট কিছু তিনি করতে চান। এক্ষেত্রে আমি কখনই স্বার্থপর হতে পারি না বরং আমি সন্তুষ্ট ও সুখী হব যদি দেখতে পাই, যাঁকে গুরু বলে বরণ করার গৌরব ও সৌভাগ্য আমার ঘটেছে, তাঁর কাছ থেকে বিশ্বজগৎ শ্রেয়বস্তু সংগ্রহ করে নিতে পারছে।" রাজা তাঁর গুরুর জন্য প্রয়োজনীয় তিনহাজার টাকা খরচ করতে প্রস্তুত এবং সে টাকা সাধারণ তহবিল থেকে না দিয়ে নিজস্ব তহবিল বা 'হুকুম খরচ' থেকে দিতে চান—যাতে প্রজাদের দিক থেকে কোন কথা না ওঠে বা প্রজারা অসুবিধায় না পড়ে। কিন্তু অবাক লাগে স্বামীজীর লেখা মে মাসের একটি চিঠি পড়ে। সেখানে তিনি হরিদাস বিহারীদাসকে লিখেছেন, মাদ্রাজের লোকেরা এবং মহীশূর ও রামনাদের রাজা তাঁকে আমেরিকা পাঠাবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। এঁদের সাহায্যের কথা স্বীকার করেও আমরা বলতে পারি,

খেতড়ির রাজার সাহায্যের পরিমাণ খুব কম নয়—তা শুধুমাত্র স্বামীজীর পোষাক তৈরি এবং সাধারণ শ্রেণীর জাহাজের টিকিটকে প্রথম শ্রেণীতে রূপান্তর করার যে খরচ তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কতকগুলি চিঠি উল্লেখ করছি যেগুলি পূর্বোক্ত কথাগুলোকে সমর্থন করে।[১] স্বামীজীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ এবং বোম্বাই অঞ্চলে স্বামীজীর ভাবপ্রচারে সক্রিয় এবং অংশগ্রহণকারী এস. এস. সেটলুরের 'মাদ্রাজ মেলে' ১৪ই জুলাই, ১৯০২ এ প্রকাশিত একটি চিঠি,

"The Parliment of Religions came and with the help of the Rajah of Ramand and the Maharajh of Khetri and Mr. Justice Subramanya Lyer and other Madras admirers he (Swamiji) went to Amerca."

সে আমলের সর্বাধিক প্রচারিত 'মির' ১৯শে মার্চ ১৮৯৭এ লিখেছে— "His Highness the Maharajah of Khetri—helped much in Sending the Swami to America." ২৫ শে অক্টোবর ১৮৯৭-এর 'বোম্বে গেজেটে' একটি খবরের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে,—স্বামীজীকে বিদেশে পাঠানোর ব্যাপারে খেতড়ির রাজাকে উচ্চ প্রশংসা। খেতড়ির রাজা ইংলণ্ডে ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উৎসবে যোগদানের পরে ভারতে ফিরলে বোম্বাই-এ বিপুল সম্বর্ধনা করা হয়। সেই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে রাজাকে যে মানপত্র দেওয়া হয়েছিল তাতে রাজা বিবেকানন্দ নামক তরুণ প্রতিভাদীপ্ত সন্ন্যাসীকে পাশ্চাত্য জগতে বেদান্তের বাণী প্রচার কাজে উদ্দীপ্ত করেছিলেন, সে জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। চিঠিটি উল্লেখ করছি ঃ—

"The whole of India lies under a deep debt of obligation to your Highness, for your Highness was the first to discover the marvellous abilities of Swami Vivekananda and harp him to carry the mission of Vedanta to Europe and America which has extorted form the civilized world that respect and admiration for our religion it is entitied."

১৮৯৭ এর ৩১ শে অক্টোবর 'ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটর'-এ একই ধরণের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী সদানন্দ প্রেরিত (১২ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭ তে লেখা) এ পূর্বোল্লিখিত সংবাদ পত্রের খবরের সমর্থন মেলে। চিঠিটি ১লা জানুয়ারী, ১৮৯৮, ব্রহ্মবাদিনে প্রকাশিত।

"Swami.........delivered a brief Speech [at Khetri on Dec, 17]......in which he thanked the Rajha highly saying that what little he had done for the improvement of India would not have been done if he did not meet him."

[Swami Sadananda's Letter, Brahmavadin ; Jan, 1898]

সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, খেতড়ির মহারাজার সাহায্যের কথা স্বামীজীর

---

১. চিঠিগুলি শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ' ও সমকালীন ভারতবর্ষ' এর ১ম খণ্ড থেকে নেওয়া হয়েছে। পৃঃ ১৭

চিঠি-পত্রে উল্লেখ না থাকলেও স্বামীজী যে তাঁর আন্তরিকতা পূর্ণ ও প্রভূত সাহায্য পেয়েছেন উপরোক্ত সংবাদই প্রমাণ। তাহলে স্বামীজী কেন খেতড়ির রাজার সাহায্যের কথা উল্লেখ করেন নি? হয়তঃ রাজার নিষেধ ছিল। কিম্বা এ-ও হতে পারে, স্বামীজীর সঙ্গে রাজার এত গভীর ঘনিষ্ঠতা ছিল যে স্বামীজী তাঁর সাহায্যের কথা উল্লেখ করে তাঁর উদারতাকে ছোট করতে চান নি।

এবারে আসা যাক, ১১ই এপ্রিলের চিঠির সেই বক্তব্যে যেখানে জগমোহন রাজা অজিত সিং কে লিখেছেন, (১) রামনাদের রাজা তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে দ্বিধা করেছিলেন; (২) স্বামীজীর ভক্তরা (মাদ্রাজের) তাঁর যাত্রার জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করেছেন তার সাফল্য সম্পর্কে জগমোহনের ভরসা নেই। এ চিঠির ওপর নির্ভর করে বলা যেতে পারে ১১ই এপ্রিলের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত অর্থ সংগ্রহের সাফল্য সম্পর্কে শুধু জগমোহন কেন স্বামীজীও কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। জগমোহন সেই সময় স্বামীজীর কাছেই ছিলেন এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে। তিনি স্বামীজীর মনের দ্বিধাহীন অবস্থা লক্ষ করেই রাজাকে ঐ চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর মনের ঐ দ্বিধাক্লিষ্ট অবস্থার অবসান ঘটেছিল ২০শে এপ্রিলের পরেই। রামনাদের রাজা যে তাঁকে যাত্রার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন সেকথা পূর্বোক্ত এস. এস. সেটলুরের চিঠিতেই প্রমাণ মেলে। আর তিনি মাদ্রাজী ভক্তদের সাহায্যে পেয়েছিলেন তার সংবাদ পাচ্ছি ২১শে এপ্রিল স্বামীজী খেতড়ি পৌঁছানোর পর। সেখানে পৌঁছে দেখেন আলাসিঙ্গা সেখানে উপস্থিত। তাঁর কাছে জানতে পারেন, মাদ্রাজেও টাকা জোগাড় হয়েছে। সম্ভবত ২৭শে এপ্রিল হরিদাস বিহারীদাসকে যে চিঠি স্বামীজী লেখেন তাতে উল্লেখ আছে, মাদ্রাজের লোকেরা এবং মহীশূর ও রামনাদের রাজা তাঁর যাত্রার টাকা দিয়েছেন। আর একটি চিঠি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করবো। সেখানে ঐ সাহায্যের কথা উল্লেখ আছে। চিঠিটি লিখেছেন, স্বামী শিবানন্দ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায়। তা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৪ এর ১৩ই ফেব্রুয়ারী। সেখানে লিখেছেন ঃ "নরেন্দ্র বাবাজির কাছ থেকে কোনো সংবাদ পাই নি। তবে মাদ্রাজে তাঁর বন্ধুদের কাছে লেখা তাঁর কিছু চিঠি পড়েছি। ঐ সব বন্ধুরা কলেজের অধ্যাপক বা এ্যাডভোকেট বা ডাক্তার ইত্যাদি। এঁরাই প্রায় চার হাজার টাকা তুলে আমেরিকায় পাঠিয়েছেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাধারা ও জীবনচর্যার গভীর সমস্যার সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকা

নান্দী পর্ব ঃ পাশ্চাত্য পৃথিবীর সমাজজীবনে সমস্যার স্বরূপ

ঐতিহাসিক বিচারে উনবিংশ শতাব্দীকে এক গ্রোত্রহীন কাল বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। গোত্রহীন কেন বলবো? তা বলার কারণ, এই শতাব্দীতে কোন একটি বিশেষ ভাবধারা সঠিকভাবে মানব জাতির পথ প্রদর্শক রূপে সক্রিয় থাকে নি, আবার এও লক্ষ করা গেছে ঐ ধরণের একটি দ্বিধাদীর্ণ পথ দিয়ে চললেও যাত্রাপথ কখনই থেমে থাকে নি। ঐ শতাব্দীর পৃথিবী এগিয়ে চলছিল বিচ্ছিনতা—অসহযোগ এবং অনৈতিকতার ঘূর্ণাবর্তের মধ্য দিয়ে। বিচিত্র ধরণের দার্শনিক মতবাদ তখন সচেতন মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছিল। সমগ্র মানবসমাজ তখন এক অস্থিরতায় ভুগছিল—কী মনে, কী বর্হিজীবনে, বিভিন্ন চিন্তাভাবনা মানুষের মনে এক দোদুল্যমান অবস্থার সৃষ্টি করেছিল—মানুষের মন তখন আশা-নিরাশা, সন্দেহ-বিশ্বাস, ভয়-আস্থার মধ্যে দিন অতিবাহিত করছিল। স্বচ্ছন্দ একটা চলার পথ তখন কেউ তাদের জীবনযাত্রার সামনে তুলে ধরতে পারে নি। আমাদের বিশ্বাস, উনবিংশ শতাব্দীর সেই বিশ্বের তমাসাচ্ছন্ন, প্রায় গোত্রহীন জীবনধারার মধ্যে স্বচ্ছন্দ-সাবলীল পথের সন্ধান এনে দিলেন প্রাচ্যের এক মহান পুরুষ—যাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। এই নামেই তিনি সমগ্র বিশ্বে পরিচিত। সত্যিকারের নতুন পথ তিনি প্রধানতঃ পাশ্চাত্যবাসীর সামনে তুলে ধরলেন। তা কি সত্যিই নতুন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, প্রাচীন ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিদের প্রদর্শিত পথ ধরেই তাঁদের বিক্ষুব্ধ মনের জমিতে ব্যবহারিক আদর্শে প্রাচীন ভারতবর্ষের সেই বাণীকে তিনি সিঞ্চন করলেন। কেমন করে করলেন, কী তাঁর পদ্ধতি ছিল, কতটুকুই বা সে ব্যাপারে ফলপ্রসূ হয়েছিলেন তা আলোচনা করার পূর্বে আমরা ঐ শতাব্দীর সমাজ-মানসিকতার আর একটু বিস্তৃত পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করি। ঐ শতাব্দীর পরিচয় দিতে গিয়ে আলফ্রেড নর্থ হোয়াইট হেড বলেছিলেন ঃ—"বিগত শতাব্দীগুলির তুলনায় উনবিংশ শতাব্দী সত্যিই এক অস্থিরময় যুগ।.....তখন প্রতিটি মানুষেরই চেতনা ছিল দ্বিধা বিভক্ত।.....ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিকেরা সমস্যাকে ক্রমশই বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে তাঁদের মতবাদই চরমসত্য। ফলে তাঁদের সকল প্রয়াসই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়েছিল।"[১]

---

১. Science and the Modern World—Alfred North whitehead (New York, The Macmillion Company, 1925), P. 119.

বিশ্বমনের এই অস্থিরতার মূলে স্বাভাবিকভাবে দুটো কারণকে চিহ্নিত করা যায়—এক সমকালে বিজ্ঞানের দ্বারা বিরাট বিরাট আবিষ্কার এবং সেই সঙ্গে নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ; দুই প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরোধ ও বৈষম্য। আধুনিক বিশ্বে এই দুয়ের আধিপত্য ছিল সমান গতিতে ; পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতা ছিল সর্বাধিক। চিন্তাচেতনা তথা দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে এরা পস্পরের বিপরীত কোটীর। দু' পক্ষই সমানে-সমানে অগ্রসর হচ্ছিল ; দু পক্ষেই ছিলেন সমকালীন বিখ্যাত মনীষী, চিন্তাবিদ, বৈজ্ঞানিকরা এটা স্পষ্ট অনুমান করা যায়। সমকালীন যুগ চাইছিল ঐ উভয় ধারার ঐক্য ও মিলন। আর সেই যুগের প্রকৃত সমস্যা ছিল এই মিলনের চেষ্টায়। ঐ শতাব্দীর শেষের দিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই ক্রমশঃ জয়লাভের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে ক্রমপ্রসারিত জ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার মধ্য দিয়ে যা মানুষের ঐহিক সুখের উপকরণ প্রভৃত পরিমাণে যোগান দিয়ে চলছিল এবং এই অবস্থা এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টিতে সদা জাগরূক ছিল। সমকালীন চিন্তাবিদরা এই অবস্থার মধ্যে এক ধ্বংসোদ্যত পৃথিবীকে লক্ষ করেছিলেন এবং এই শতাব্দীর অস্থির জীবনের স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে এক জরাজীর্ণ পৃথিবীর কঙ্কালসার অবস্থাকে উপলব্ধি করে ভীত হয়েছিলেন। এ থেকে মুক্ত হওয়ার পথেরও সন্ধান দিয়েছিলেন কেউ কেউ, অবশ্য বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য ভ্রমণের কিছু পরে। ১৯০২ সালে জগত বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ডরাসেল ঐ প্রসঙ্গেই যা বলেছিলন তা প্রণিধানযোগ্য ঃ

"মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত ও অসহায়। তার নিজের ও সমগ্র জাতির উপর ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে এক নিশ্চিন্ত অন্ধকার। ভালমন্দ সম্পর্কে উদাসীন, ধ্বংসোদ্যত, সর্বগ্রাসী জড়পুঞ্জ অস্থির গতিতে এগিয়ে আসছে। নিজের প্রিয় জিনিষগুলি ক্রমশই চলে যাচ্ছে হাতের বাইরে, আগামীকাল মানুষকে নিজেই যেতে হবে অন্ধকারের রাজত্বে। চরম বিপর্যয় এখনও আসেনি। ভাগ্যের হাতে ক্রীতদাস হয়ে তাকে চলতে হবে, নিজের তৈরি মন্দির হবে তার উপাস্য, দৈব-ঘটনায় হতবাক্ হয়ে কাটাতে হবে জীবন। অস্থির জীবনের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হবে, নয়তো তার জ্ঞান ও অসহায় অবস্থা এক জরাজীর্ণ পৃথিবীর সৃষ্টি করবে যে পৃথিবী অচেতন শক্তির ক্রিয়া হিসাবে তার নিজেরই সৃষ্টি।"[১]

স্পষ্টতই, ঐ শতাব্দীর মানুষের অসহায় অবস্থার কথাই রাসেলের মন্তব্যের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের মানবজাতির অসহায়তার অন্যতম কারণ তাদের চেতনায় ধর্মের অভাব। বুদ্ধি-যুক্তি-মুক্তি (intellectual Deliverance) ঐ কালীন মানসিকতার মূল ধর্ম। কেউ কেউ এই বিশেষ ধর্মকে আধুনিকতা বলেছেন (G.S. Fraser)। সেই আধুনিকতায় আর যাই থাকুক, শূন্যতাবোধ ছিল এর মূলগত বৈশিষ্ট্য। ধর্ম সম্পর্কে কোন

১. 'A free Man's worships in Mysticigm and logic—Bertrand Russenll (Garden City, New york ; Doubledau and Company inc, 1957, P. 54

পরিস্কার ধারণা তাদের ছিল না। তবে অনৈতিকতা যে সব কিছুকে গ্রাস করে ফেলেছিল তা অবশ্য নয়। কিন্তু এমন এক ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে হয়েছিল যেখানে অনৈতিকতার জন্ম ও বিস্তার একান্ত স্বাভাবিক। সবকিছুর উপরেই মানুষের অবিশ্বাস, নৈতিকতা তখন তার স্বর্গীয় আসন থেকে বিচ্যুত, জাগতিক ভোগ সুখ তখন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শাশ্বত সত্তা বলে কিছু আছে—এমন বিশ্বাস খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ। বিজ্ঞানের বিরাট বিরাট আবিষ্কার পুরানো চিন্তা চেতনাকে আমূল পরিবর্তন করে দিচ্ছিল। ফলতঃ দুই বিরুদ্ধ ভাবনার মধ্যে দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলোর একটা ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরা যেতে পারে। ১৫৪৩ সালে কোপার্নিকাস আবিষ্কার করলেন সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে, সূর্য রয়েছে স্থির। এর আগে ঠিক বিপরীত জিনিষটি ভাবা হতো। প্রচলিত মতের সঙ্গে তখন থেকেই দ্বন্দ্ব শুরু। মানুষের চিন্তার জগতে তখন থেকেই গতানুগতিক চিন্তাভাবনা তথা সংস্কারের প্রতি অবিশ্বাসের জন্ম। এর পরে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসের উপর চরম আঘাত হানলেন। খ্রিষ্টিয় চার্চের ঈশ্বর প্রেমিক উদ্দেশ্যবাদকে (God—oriented teleology) গ্রহণ করার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করলেন। প্রকৃতপক্ষে গ্যালিলিও পরিবর্তিত বিশ্বসৃষ্টির ভিত্তি স্থাপন করলেন। এর পরের ভূমিকা অ্যারিষ্টটলের। তিনি মানুষকে শেখাতে চেষ্টা করলেন বিশ্বের সর্বত্র যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে এগুলির পিছনের কারণ বা উদ্দেশ্য কি? কেনই বা ঘটনাগুলো ঘটছে,—একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তা বিচার করতে মানুষ প্রবৃত্ত হলেন। বলাবহুল্য মানুষকে কেন্দ্র করেই বিশ্বের পরিব্যাপ্ত সমস্ত বস্তু ও ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা সমগ্র পৃথিবীতে চলছিল। সে সময় চার্চের পাদ্রীরা এবং পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই বাইবেল ও অ্যারিষ্টটেলীয় লজিকের সাহায্যে এই উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করছিলেন। চার্চের বাইরেও সে অনন্ত বিশ্বরহস্য আছে তা ছিল তাদের ধারণার অতীত।

গ্যালিলিও হলেন সেই প্রথম পুরুষ যিনি টেলিস্কোপ এবং কেপলারের জ্যোতির্বিজ্ঞান সূত্রাবলির সাহায্যে বিশ্বের নানান ঘটনার নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে বিশ্ববাসীকে আধুনিকতায় দীক্ষিত করে তুললেন। তিনি বিশ্বজগতের ঘটনাগুলি কীভাবে ঘটছে তার উপর জোড় দেওয়ার চেষ্টা করলেন। এডুইন আর্থার বার্ট এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা উল্লেখ করছি ঃ

"গ্যালিলিওর দর্শনে........এই জগৎ হল কতগুলি বস্তুপুঞ্জ যা গাণিতিক সূত্রাবলির সাহায্যে চলে, অর্থাৎ স্থান ও কালের মধ্য দিয়ে প্রবহমান বস্তুপুঞ্জই হচ্ছে জগৎ।"[১]

এর অর্থ হলো এই, বাস্তব পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই একটা গাণিতিক নিয়মে চলছে, এর মধ্যে কোন 'উদ্দেশ্য' খুঁজে বের করার চেষ্টা বৃথা। বার্টের আর কিছু অংশ আবার তুলে ধরছি ঃ "বাস্তব জগৎ (অর্থাৎ মৌলিক গুণাবলী সমন্বিত জগৎ) গানিতিক সূত্রানুসারে

---

১. The Metaphysical Foundation of Modern Physical Science—Edwin, Arthur Burtt (Garden City, N. Y. dubleday Ancho Books, 1954), P. 93

ভাসমান পারমাণবিক গতিসমূহ ছাড়া আর কিছু নয়। এই অবস্থায় পরমাণু সমূহের গতির মধ্যে কারণতত্ত্ব নির্দেশ করা একটা তাত্ত্বিক খেয়াল মাত্র ; যা কিছু ঘটছে তা এই সব বস্তুপুঞ্জের গানিতিক পরিবর্তন মাত্র।[১] উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে এই যে যান্ত্রিকতাবাদ, এ ধারণার ফলে গ্যালিলিও সিদ্ধান্ত করলেন যে, একটি বস্তুকে চালিত কিংবা গতিশক্তি তারতম্য করার জন্য একটা যান্ত্রিক শক্তি দরকার। পরে এটিকেই নিউটন তাঁর 'গতির সূত্রে' লিপিবদ্ধ করেন। এর ফলে বিশ্বমানসিকতার একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হলো। জাগতিক বস্তুর ব্যাখ্যায় উদ্দেশ্যের বদলে যান্ত্রিক ও গানিতিক সূত্র যুক্ত হলে, ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণার মুলোচ্ছেদ ঘটলো। গ্যালিলিও অবশ্য বস্তুজগতের সৃষ্টির প্রথম কারণ হিসেবে ঈশ্বরকেই নির্দেশ করেছেন। ঈশ্বরই যে বস্তুর মধ্যে গতিসঞ্চার করেছিলেন এবং তারপর থেকে বস্তুগুলি আপন আপন কার্য করে চলেছে, সেকথা গ্যালিলিও বললেন। গ্যালিলিও এই দৃষ্টিভঙ্গিকে স্মরণ করে এডুইন বার্ট বলেছিলেন—

"একটি প্রয়োজনীয় কর্তা হিসেবে ঈশ্বরের কাজ সেখানেই শেষ হলো। তিনি এক বিশাল যান্ত্রিক স্রষ্টা বলে পরিগনিত হলেন—যাঁর কাজ পরমাণুর প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল।"[২]

দেখা যাচ্ছে, গ্যালিলিওর ঐ সিদ্ধান্তকে খ্রিষ্টিয় ধর্মযাজকেরা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলতঃ তাঁর সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যাত হলো।

কেপলার, ডেকার্ট ও গ্যালিলিওর পরে বিশ্ব-বিজ্ঞান সভায় যিনি আসন গ্রহণ করলেন তিনি হলেন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক স্যার আইজাক নিউটন। নিউটন আধুনিক বিজ্ঞানকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করালেন। তিনি দৈব উদ্দেশ্যের বদলে যান্ত্রিক কারণ দিয়েই সমস্ত সৃষ্টিকে বিচার করার উপর জোর দিলেন। সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল। বস্তুর স্থান পরিবর্তন ও গ্রহ নক্ষত্রের গতিতে দৈব নির্দেশের যুগ শেষ হয়ে এল। পাশ্চাত্য জগতে নবজাগরণের মতোই এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নতুন প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছিল। মহাপৃথিবী সম্পর্কে মধ্যযুগীয় যে ধ্যান-ধারণা ব্যক্তিমানসকে এতদিন যে দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে নিয়ে চলছিল তা মানুষকে আর পরিতপ্ত করতে পারলো না। সমকালীন সচেতন মানুষ তা থেকে মুক্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর আস্থা স্থাপন করার চেষ্টা শুরু করলো। আর বিজ্ঞানও ক্রমশ মানুষকে অসীম শক্তিশালী করে তুলতে সক্ষম হলো।

১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দ, বিবেকানন্দের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যুর (১৯০২) পরের দু'দশক পর্যন্ত যাকে আমরা আধুনিক বিজ্ঞান ও মহাবিশ্ব পর্যটন বলছি, তার ভূমিকা ও বিস্তার উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে শক্তির অবিনাশিতা ও রূপান্তর তত্ত্ব প্রত্যক্ষ

১. The Mataphysical Foundation of Modern Phy. Sc—P.99

২. Ibid.

ও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আলোর গতি ও তরঙ্গ প্রকৃতি নির্ণীত হয়েছে। তাপ ও গতির শক্তি-পরিবর্ত, বিদ্যুৎ-চুম্বক সমবায় ব্যবহারিক বিজ্ঞানে যুগান্তর এনেছে। পাশ্চাত্য দেশে ফটোচিত্রের সাহায্যে সৌরবর্ণালীর ও ক্রমশ নক্ষত্র ও ছায়াপথের বিশ্লেষণ এবং সেই সঙ্গে নীহারিকা নক্ষত্রের গতিবেগ ও বস্তু-স্বরূপ অনুধাবনের প্রয়াস যেমন মহাকাশ গবেষণায় নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়েছে, তেমনি রসায়নেও নূতনতর মৌলবস্তু আবিষ্কার, সেগুলির আনবিক ভরসামঞ্জস্য নির্ধারণ ও মৌল থেকে বিভিন্ন যৌগের সৃষ্টি—কেবল রসায়নের ব্যবহারিক ক্ষেত্রকেই সমৃদ্ধ করেনি, পার্থিব বস্তু অতিক্রম করে সূর্য নক্ষত্রের গঠন পরীক্ষা পর্যন্ত পরীক্ষার সীমা প্রসারিত হয়েছে। অন্যদিকে ডারউইনের জীববংশধারার অভিব্যক্তির রূপ, মেণ্ডেলের বংশানুক্রম পরীক্ষা প্রাণ ও সমাজ বিকাশকে সুস্থির নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে দেখিয়েছে। উনিশ শতকের বিজ্ঞানের এই ভূমিকায় বস্তুত পক্ষে পাশ্চাত্য-মানস অভিভূত হয়ে পড়েছিল। ঐ শতাব্দীর শেষের দিকে বিজ্ঞানের আরও নব নব আবিষ্কার দেখা গেল। আবিষ্কার হলো পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে বা উভয়ের মিলিত পরিস্থিতিতে। সেই সঙ্গে মহাকাশ গবেষণারও মোর ফিরে গেল। ঋণাত্মক বিদ্যুৎরশ্মির রূপান্তরিত বেগনীপার রশ্মি ধরা পড়ল। আর স্বতোবিকিরিত ও বিশ্লেষশীল তেজস্ক্রিয় রশ্মির নির্গমন থেকে পরমানুর ধ্রুব প্রোটন-নিউটন এবং ঘূর্ণ্যমান ও পলাতকা বিদ্যুৎ কণিকার চরিত্র স্পষ্ট হলো। আর এরই ফলে ধরা গেল জ্যোতিষ্কলোকের প্রচণ্ড তাপবিদ্যুৎ বিক্ষুব্ধ গ্যাসীয় উপাদান ও সেগুলির পরিবর্তনের চক্র। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, খুব দ্রুত তৎকালীন বিশ্বে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের সামনে এক নোতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য মনে এ ধারণা দৃঢ়তর হয়ে উঠেছে যে, বিজ্ঞান তাদের জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাকে মেটাতে সক্ষম। ফলতঃ বিজ্ঞানের অসীমশক্তি সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দিহান। এবং এটাও সত্য, সে যুগে বিজ্ঞানকে যারা একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, বিশ্ব নিয়ন্ত্রক হিসেবে কোন অপর বিরাট শক্তিকে তারা বিশ্বাস করতো না।

এর পরে লক্ষ করা গেল, নিউটনের প্রভাবিত পৃথিবী-কেন্দ্রিক নক্ষত্র জগতের কল্পনা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তবুও মানুষ যুক্তির মধ্য দিয়ে জাগতিক সমস্ত রহস্যের সমাধান খোঁজবার চেষ্টা করতে থাকলো। তা থেকে নিজেও বাদ পড়লো না।

অষ্টাদশ শতাব্দীকে 'যুক্তির যুগ' (The Age of Reason) বলা হয়ে থাকে। বিচিত্র ধরণের দার্শনিক মতবাদ ঐকালে সমাজজীবনে প্রচলিত ছিল। সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও আশাবাদ। ঐকালে শুধু বিজ্ঞান নয়, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ধর্মীয় সব কিছুই গানিতিক সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হচ্ছিল। তৎকালীন মানুষ ভেবেছিল, ঐ পদ্ধতিতে যদি পার্থিব সব কিছুকে ব্যাখ্যা করা হয় তবে তা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হবে এবং একটা আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে। কিন্তু ফল হলো

বিপরীত। ঈশ্বরকে কেবলমাত্র আদি কারণ হিসেবে গ্রহণ করা এবং দৈব উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা অস্বীকার করায় মানুষের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়লো। তার কারণ এই, সব কিছুই যখন উদ্দেশ্যহীতায় পর্যবসিত তাহলে ভাল মন্দ স্থির হবে কীভাবে? পাশ্চাত্য মনেও এই প্রশ্ন দেখা দিল। পাশ্চাত্য জগতে এই ধারাগুলি মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসায় মানুষের জীবনে ধর্ম ক্রমশই কম কার্যকরী ও কম অর্থবহ হয়ে উঠতে লাগলো। ফলত গতানুগতিক ধর্মচিন্তার পুনর্জাগরণের চেষ্টা চলল, সাহিত্যে শুরু হল রোমান্টিসিজমের সুর। এই রোমান্টিসিজম উনিশ শতকের কবিদের মনকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। অবশ্য এর ফলে কোন মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হলো না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তর্কমূলক যৌক্তিক ধর্মতত্ত্ব, যাকে 'Deism' বলা হত তা মানুষের মন জুড়ে থাকলো। স্বাভাবিক ভাবেই সমাজমন থেকে দৈব-প্রেরণা, ভবিষ্যবাণী, অলৌকিকত্ব প্রভৃতি ব্যাপারগুলি অযৌক্তিক প্রতিপন্ন হতে শুরু করলো। ঐ কালীন প্রচলিত বিচারমূলক ধর্ম সম্পর্কে ভলটেয়ার বলেছেন ঃ "মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে যা নৈতিক বলে মনে হয়, তার মিলিত রূপই ধর্ম, বিচারমূলক ধর্ম।[১]

কিন্তু দর্শন-জগতে কাণ্টের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বিচারমূলক ধর্মের ভিত্তিও খুব তাড়াতাড়ি ধ্বসে পড়ল। কাণ্ট দেখলেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রধান তিনটি যুক্তির [সৃষ্টিমূলক (argument from Design), আদি কারণমূলক (argument from a first cause) এবং অধিবিদ্যামূলক (ontological argument)] কোনটিই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকলো না। কাণ্টের যুক্তি এই ঃ "আমি মনে করি যে ঈশ্বরতত্ত্বে যুক্তির অবতারণা করার সমস্ত প্রচেষ্টাই অর্থহীন এবং এই যুক্তিগুলি মিথ্যা যুক্তিমাত্র।"[২]

কাণ্টের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষিত পাশ্চাত্যবাসীর মন থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা সমূলে দূরীভূত হলো। অজ্ঞেয়বাদ ও নিরীশ্বরবাদ তখন যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে অন্বিষ্ট হয়ে গেল। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, কাণ্ট কখনোই ঈশ্বর নেই—একথা বলেন নি। তিনি 'a priori Knowledge'-এর উপরেই বেশি জোর দিয়েছিলেন। ডেভিড হিউস কাণ্টের এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছিলেন। কাণ্টের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল, সেটি হলো, ধর্মীয় জ্ঞানের একটি ভিত্তিভূমি খুঁজে বের করা। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এমন একটি জায়গায় পৌছেছিলেন যেখানে ধর্মের একটি ভিত্তিভূমি খুঁজে পেয়েছিলেন। সংক্ষেপে কাণ্টের দর্শনের বক্তব্য এই ঃ তিনি বিশ্বকে দুভাগে ভাগ করেছিলেন। এর মধ্যে একটি হলো, কাল-মহাকাশ—কার্যকারণের জগৎ (World of time, space and caustation), অর্থাৎ যে জগতে আমরা বাস করছি—, আলো বাতাস গ্রহণ করছি সেই জগৎ। এটির মূল ভিত্তি মানবমনের কতকগুলি স্বাভাবিক বৃত্তির

১. Elements de la Philosophic de Newton—Voltair, Chap.—6

২. Critiqie of Pure Reason—Kant, Cahp—1

উপর। আমাদের মন দিয়েই সেই জগৎকে দেখছি, যে জগৎ আপাত স্থানিক জগৎ (Temporal—spatial world)। সুতরাং মনের কতকগুলি সূত্র বা বৃত্তির উপরেই জগৎ-কে তখন বিচার করা হচ্ছে। সেখানে ঈশ্বর বা দৈবের কোন সক্রিয়তা নাই। মূলত তা পূর্বোক্ত যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিভঙ্গির উপরই নির্ভরশীল। অপরদিকে, তিনি আপাত স্থানিক জগৎ-বহির্ভূত আর একটি সত্য জগতের কথা বলেছেন যা মন বা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এবং কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করে তিনি বলেছেন। সেই জগৎ হয়তো ঈশ্বরের নির্দেশে পরিচালিত এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত। কিন্তু সেই জগৎকে উপলব্ধির উপায়? এ ব্যাপারে কান্টের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, ধর্মীয় উপলব্ধির তথা নৈতিকচেতনার মধ্য দিয়েই আমরা সেই জগৎকে উপলব্ধি করতে পারি। লক্ষণীয়, তিনি ঠিক সেইভাবে এ দুই বিপরীত জগতের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছিলেন। যান্ত্রিক জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যে একটা সমন্বয় সূত্রকে উনিশ শতকের মানুষ গ্রহণ করার দিকে ঝুঁকেছিলেন, তা ঐ কালীন সমাজ-মানসিকতা থেকে উপলব্ধি করা যায়। মোটামুটিভাবে, মানুষের মন তখন এমন অবস্থায় ছিল যা ঈশ্বরকে যুক্তির মাধ্যমে না পেলেও, বিশ্বাসের মন নিয়েই আবিষ্কার করতে চেয়েছিল।

পাশ্চাত্যমানুষের মনে যখন এ ব্যাপারটি জায়গা পেয়েছে তখন উনবিংশ শতাব্দী। সে মানুষের কাছে হৃদয়ের ধর্ম সবচেয়ে বড় দিক। কবি শিল্পী-দার্শনিক সকলের কাছে হৃদয়ের ধর্মই প্রেরণাশক্তিরূপে সক্রিয় থেকেছে। সমকালীন অনেক কবির কাব্য থেকে হৃদয়ের ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। স্মরণযোগ্য ওয়ার্ডওয়ার্থের কথা। সে সময় ভাববাদী দার্শনিকদের মন থেকে কান্ট বিতারিত হলেন। তাদের যুক্তি, কান্টের দর্শন দুর্বোধ্য। দার্শনিক হেগেল চরম সত্তার (Absolute) অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এই বিশ্বজগৎ চরম সত্তার কারণ-প্রজ্ঞা। দ্বান্দ্বিক কালপ্রবাহে চরম সত্তার মধ্য দিয়ে এ জগৎ নিজেকে প্রকাশ করছে। যাইহোক, উনিশ শতকের এই ভাববাদী জীবনদর্শন বহুপূর্বেই প্রত্যাখ্যাত হয়ে গিয়েছে। তবুও উল্লেখযোগ্য ঐ শতকে হেগেল, স্পেন্সার, লিণ্টে, শেলিং, কার্লাইল বা এমার্সন প্রভৃতি দার্শনিকদের চিন্তা-চেতনা পাশ্চাত্য সমাজজীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মোটামুটিভাবে পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে জানা যাচ্ছে, পাশ্চাত্য ভাবজগতে বিশ্বজগতের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে যাওয়ার পূর্বে বর্তমান ছিল। তাদের মূল সমস্যাটি ছিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি কোন যান্ত্রিক নিয়মে আবর্তিত হচ্ছে, অথবা চরম বিশ্বপ্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত? তারা কোনটিকেই সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তার কারণ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এমন কোন কিছুকে স্বীকার করে নেবে না যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। অপরদিকে বিশ্বপ্রজ্ঞা অথবা আত্মিক শক্তি—(Spiritual force) এসব সম্পর্কে তাঁদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা বা বিশ্বাস সম্ভবত ছিল না। অথবা এমন কোন প্রমাণ

তাঁরা পান নি যাতে তাঁরা আত্মিক শক্তির অস্তিত্বকে বিশ্বাস করবে। খ্রিষ্টান যাজকেরা অবশ্য যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আপোস করে ব্যক্তি-ঈশ্বরকে মেনে নেবার ব্যাপারে তৎকালীন জনসাধারণকে প্ররোচিত করছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য এই আপোস ব্যাপারটির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির অন্বয়সাধন যৌক্তিক বিচারে সম্ভব হচ্ছিল না। আর একটা দিক লক্ষণীয়, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও দুই বিরুদ্ধ মতাবলম্বী মানুষেরা বিপরীত মেরুরও অধিবাসী ছিলেন। পাশ্চাত্যের মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে মূলত তাদের প্রাণপ্রাচুর্যকে নিয়োজিত করেছিল। একের পর এক এই উভয় শাখায় আবিষ্কার ও উন্নতি তাদের বিভ্রান্তির মধ্যেও ফেলেছিল। বিভ্রান্তি এই কারণে যে, সত্যিকারের অগ্রগতির কোন সীমা পরিসীমা খুঁজে পাচ্ছিল না।

সংক্ষেপে, পাশ্চাত্য মন তখন যুক্তির মধ্য দিয়ে পারিপার্শ্বিক জগৎকে বিশ্লেষণ করে তবেই তাকে গ্রহণ করতো। কোন ধর্মীয় বিশ্বাস অথবা চিরাচরিত ধারণা থেকে পারিপার্শ্বকে সরাসরি গ্রহণ করতে চাইতো না। বরং যুক্তির মধ্য দিয়েই যে সবকিছুর সমাধান সম্ভব এটা তাঁরা মনে করতেন। এই যুক্তিকে সামনে রেখে কর্মতৎপরতা অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে পৃথিবীতে তারা স্বর্গ নামিয়ে আনতে চাইলো। এই ব্যাপারে তাদের ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মবিশ্বাসী মন এবং মানবকল্যাণী মন সক্রিয় ছিল সন্দেহ নাই। আসলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কারবারই হলো আভ্যন্তরীণ বিকাশনার ক্ষেত্রে। পাশ্চাত্যে মানুষ বহিঃপ্রকৃতির (External nature) উপরই বরাবর তাঁর চিন্তাকে সজাগ রেখেছে। নৈসর্গিক শক্তিসমূহের দিকেই এর ঝোঁক। মূলতঃ এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির উপরই তারা পরিচালিত হচ্ছিল। আর এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তার গতানুগতিক ধর্মচিন্তা যা তাকে তার জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শেখাতো যে, সে একজন মহাপাপী। সেকারণে ঈশ্বরের অনুগত হওয়া তার কর্তব্য। কিন্তু সেই ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না সে কথা আমরা পূর্বে বলেছি। পরন্তু তার কাজকর্ম কিছুই বুঝে ওঠার ক্ষমতা তাদের ছিল না। কিন্তু খ্রিষ্টান ধর্ম-যাজকেরা সব সময় চেষ্টা করতো উপরোক্ত তত্ত্বকে মানুষের মনে প্রবেশ করিয়ে ঈশ্বরানুগত করা এবং তার উপর একান্ত নির্ভর করে তোলা। সুতরাং সমকালীন পাশ্চাত্য সমাজমনের ইতিহাস খুঁজলে লক্ষ করা যাবে যে, সমাজমন বিজ্ঞান ও খ্রিষ্টধর্ম উভয়কে মেনে নেওয়ার ফলে এক মানসিক রোগগ্রস্থ আবহাওয়ার মধ্যে বর্ধিত হচ্ছিল। এই রোগগ্রস্থ আবহাওয়াকে সুস্থ করার অভিপ্রায়ে তৎকালীন পাশ্চাত্য ভাববাদী দার্শনিকরা বিভিন্ন দর্শনের মধ্যদিয়ে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু কার্যত ক্রমশ তাঁরা সমাজ মনকে আরও কঠিন সমস্যার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন ; সমাধান তো দূরের পথ!

সমস্যার সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন ঊনিবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দশকে। সে সময় বা তারও পূর্বে যা ঘটেছিল তা হলো, সমাজমন তখন যুক্তি বা বাস্তবের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে একটা রোমাণ্টিকভাবনা এবং সেইসঙ্গে ধর্মীয় ভাববাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। ফলে পাশ্চাত্য মনে বাসা বেঁধেছিল প্রেততত্ত্ব, ফেইথ-হিলার্স, থিওজফিষ্ট, জ্যোতিষী প্রভৃতি গুপ্তবিদ্যার চক্রান্তকারীরা এবং তারা এই গুপ্তবিদ্যাকে ধর্মের নামে সমাজের মধ্যে চলাচ্ছিল। কী মারাত্মক এ ব্যাপার। বিবেকানন্দ সেখানে গিয়ে শিক্ষিত লোকেরাও এসব ব্যাপারগুলিকে বিশ্বাসভরে গ্রহণ করছিলেন দেখে ক্ষুদ্ধ হলেন।[১] পাশ্চাত্য ধর্মনেতাদের মধ্যে কেউ কেউ অযৌক্তিক ও কাল্পনিক চিন্তায় গা ভাসালেন। আর অধিকাংশই নৈতিক দৃষ্টির মধ্য দিয়ে জীবনাচারণ করতে লাগলেন এবং সমাজের সর্বস্তরে এই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল করে তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট হলেন। এঁরাই সে সময় গড়ে তুললেন 'লিবারেল ক্রিশ্চিয়ানিটি'। এদের লক্ষ্য হলো আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতাকে অবহেলা করে সামাজিক ও নৈতিক আচার আচরণকেই যথাযথ রূপ দেওয়া। এঁরা অবশ্য যান্ত্রিক অপসংস্কৃতিকে দূর করতে বদ্ধপরিকর ছিল, কিন্তু শুধুমাত্র নৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করায় এই উদার খ্রিষ্টান ক্রমশ উপযোগবাদের (Utilitarian) স্রোতে গা ভাসিয়ে সময় অতিবাহিত করছিলেন। তৎকালীন পাশ্চাত্য মানস ও এই উদারচেতা খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে মেরী লুই বার্ক তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন ঃ "এই উদার খ্রিষ্টানেরা তাঁদের ব্যাবহারে ক্রমশই উপযোগবাদে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। ধর্ম তাঁদের জীবনে ঐশ্বরিক চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে থাকল। অনুরূপভাবে আর এক শ্রেণীর লোক যাঁরা মূলত একই লক্ষ্য নিয়ে চলছিলেন, তাঁরা কিন্তু ঈশ্বরকে পটভূমিকার বাইরেই রেখেছিলেন। তাঁরা ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। গত শতাব্দীর শেষ দশকে আমেরিকার পূর্ব উপকূল এবং লণ্ডন এই শ্রেণীর নাস্তিকে ভরে গিয়েছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, গত শতাব্দীর চিন্তাশীল মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনা, অথবা একটির সাহায্যে অন্যটিকে ব্যাখ্যা করা। এরই ফলে যেসব বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি হয়েছিল তার মধ্যে গতানুগতিক ক্যাথলিক মতবাদ থেকে খ্রিষ্টান সমাজতন্ত্র (Christian Socialism), উপযোগবাদ, র‍্যাডিলিজম, ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে নাস্তিক্যবাদ পর্যন্ত সবই ছিল। তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সবরকম প্রয়াসই দেখা গিয়েছিল। নানা সংগঠন তাদের পত্রিকা, অধিবেশন, বক্তৃতা ও মতবাদের মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীকে মুখর করে রেখেছিল।"[২]

---

১. বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৬৬

২. "Sciecnce, Religion and Swami Vivekananda. Swami Vivekananda's work in the West as seen against the Nineteenth Century world. (চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ গ্রন্থে স্বামী সোমেশ্বরানন্দের অনুবাদ। পৃঃ ৯৯)

১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর চার্লস ডারউইন 'ওরিজিন অব স্পিসিজ' প্রকাশ করেন। প্রকাশিত হয়েছিল ইংলণ্ডে—আধুনিক বিজ্ঞানের পীঠস্থানে। গ্যালিলিও-র 'সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বে'র মতোই এই 'ওরিজিন অব স্পিসিজ' খ্রিষ্টানদের চিন্তা জগতে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। সৃষ্টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডারউইনের ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনবাদ স্বামীজীর নিকট যুক্তিসঙ্গত মনে হয় নি। তিনি বেদান্তের আলোকেই সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে বিজ্ঞান শিক্ষিত পাশ্চাত্যবাসীদের প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁর সেই ব্যাখ্যা ক্রমবিকাশবাদের বিপরীত। বিবর্তনবাদ অনুসারে সৃষ্টির ক্রম নিম্ন থেকে উর্দ্ধগামী। প্রাণের বিকাশ যেমন এককোশাত্মক অ্যামিবা নামক প্রাণীতে। ক্রমশ বিবর্তনধারায় জটিল পরিচালক যন্ত্র সমন্বিত বহুকোশাত্মক জীব শরীরের উৎপত্তি হয়েছে। বেদান্তের দৃষ্টিতে সৃষ্টি উপর থেকে নিচের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বস্তুত বেদান্তের মতে, সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি। ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচ চলতে থাকে। ঈশ্বর থেকে অ্যামিবা, আবার অ্যামিবা থেকে ঈশ্বর—এইভাবে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টির ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচ অনাদি কাল ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে। এই ক্রমবিকাশবাদ নিঃসন্দেহে খ্রিষ্টানধর্মের উপর এক বিরাট আঘাত। অনেকে এই আঘাতকে 'হায়ারক্রিটিসিজমের' চেয়েও মারাত্মক বলে মনে করেন। হায়ারক্রিটিসিজমে বাইবেলের কাহিনী এবং ঐতিহাসিককতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল ; এমনকি যীশুখৃষ্টের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কেও। এরই সুযোগ নিয়ে উদারপন্থী প্রোটেস্টাণ্টরা খ্রিষ্টিয় তত্ত্বগুলিকে ক্রমবিকাশবাদের সঙ্গে মিশিয়ে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তাঁরা যথাসাধ্য মানব-কেন্দ্রিক করেই ওগুলিকে তুলে ধরেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, ঈশ্বর কর্মের মধ্য দিয়ে একটি আদর্শ খ্রিষ্টান-সমাজ ক্রমশ গড়ে তুলছে, যে সমাজে সকলেই সুখী, প্রত্যেকের জন্য এবং অপরের প্রতি প্রেমে আবিষ্ট হবে। পাশ্চাত্যের ইতিহাসের এই পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দ অবতীর্ণ হন। তাঁর অতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুগভীর মনন পাশ্চাত্য ইতিহাসের ঐকালীন অবস্থাকে যুক্তি পরম্পরায় বিচার করে দেখান যে, ক্রমপ্রগতির ক্ষেত্রে তাঁদের যে ধারণা তা পুরোপুরি অযৌক্তিক। বলেন, "তোমরা যাহাকে উন্নতি বলো, তাহাও তো আমি বড় বুঝিয়া উঠিতে পারি না—উহা তো বাসনারই ক্রমাগত বৃদ্ধি।"[১] অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ 'এরূপ শোনা যায়, দোষাংশের ক্রমপরিহার ক্রমিবকাশবাদের একটি বিশেষত্ব ; সংসার হইতে ক্রমাগত এইরূপ দোষভাগ পরিত্যক্ত হইলে অবশেষে কেবলই মঙ্গল থাকিবে। বেশকথা, কিন্তু এ যুক্তি আগাগোড়া ভ্রমপূর্ণ। প্রথমত তাহারা বিনা প্রমাণে স্বীকার করিয়া লয় যে, জগতে অভিব্যক্তি মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে। দ্বিতীয়ত ইহা অপেক্ষা দোষাবহ একথা স্বীকার করা যে, মঙ্গলের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান এবং অমঙ্গলের পরিমাণ নির্দিষ্ট। অতএব এমন সময় উপস্থিত হইবে, যখন অমঙ্গল-ভাগ এইরূপে ক্রমশ পরিত্যক্ত হইয়া নিঃশেষিত হইবে, তখন কেবল মঙ্গলই

---

১. বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৯৯

থাকিবে। এরূপ বলা অতি সহজ। কিন্তু অমঙ্গল যে ক্রমশ কমিতেছে, ইহা কি প্রমাণ করা যায়?.........আমাদের সুখী হইবার শক্তি যতই বৃদ্ধি পায়, যন্ত্রণাভোগের শক্তি সেই পরিমাণে বর্ধিত হইয়া থাকে। কখন কখন আমার মনে হয়, আমাদের সুখী হইবার শক্তি সমগুনিতান্তর শ্রেণীর নিয়মে বর্ধিত হইবে। অরণ্যবাসী মানুষ সমাজ সম্বন্ধে বেশি অভিজ্ঞ নহে। কিন্তু উন্নতিশীল আমরা জানি, যতই আমরা উন্নত হইব, ততই আমাদের সুখ দুঃখের অনুভবশক্তি তীব্র হইবে।....কেবল সুখের সংসার বা কেবল দুঃখের সংসার হইতে পারে না। এরূপ ধারণাই স্ববিরোধী। কিন্তু এরূপ বিশ্লেষণ দ্বারা বেদান্ত এই একটি মহারহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন যে, মঙ্গল ও অমঙ্গল দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পৃথক সত্তা নহে।"[১]

পাশ্চাত্য মানুষের মনন-ভূমির দ্বিধাজীর্ণ অবস্থা যখন, যখন তাঁরা বিজ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব জীবনকে সমন্বয় করতে পারছেন না ; পারছেন না চরম বিশ্ব-প্রজ্ঞার সঙ্গে বিজ্ঞানকে সমন্বয় করতে, একদিকে বিজ্ঞান, অপরদিকে সুযোগ-পন্থী খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্ব যখন ঈশ্বরকে নিয়ে ছেলে খেলা করছেন, ঠিক তখনই কলম্বাসের আমেরিকায় উপস্থিত হলেন বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য মানুষের হারানো বিবেককে উদ্ধার করার উদ্দেশ্য নিয়ে। আপাত সমাধানের পথ যে সমস্ত দার্শনিক ধর্মসমাজকেরা দেখাচ্ছিলেন, শাণিত যুক্তিচ্ছটায় সে-সবকে নস্যাৎ করে পাশ্চাত্য-মানুষের সামনে প্রকৃত পথের সন্ধান দিলেন প্রাচ্যের সেই তরুণ সন্ন্যাসী। পাশ্চাত্যবাসীর জাগতিক জীবন যেমন একদিকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, অপরদিকে হালকাভাবে প্রবাহিত ছিল একটি আত্মিকজীবন যার মধ্যে যুক্তির ছিটেফোঁটাও সে দেশের মনন খুঁজে পাচ্ছিল না। একটি ছন্দবিহীন অবস্থা সর্বত্র দেখা যাচ্ছিল। পাশ্চাত্যের এই ছন্দবিহীন দ্বান্দ্বিক সাংস্কৃতিক চেতনার প্রেক্ষাপটেই স্বামীজীর আবির্ভাব।

মূলত তখন প্রয়োজন ছিল, বিজ্ঞান-বাস্তবজীবন ও ধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন। স্বামীজী সে কাজটিই করেছিলেন। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটিই ছিল পূর্ব নির্ধারিত ; ঈশ্বর নির্দিষ্ট। তা নাহলে, স্বামীজী যখন পরিব্রাজক হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে মানুষের দৈন্যতা দেখে, অভাব দেখে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন ; ভারতমাতৃকার সন্তানদের অন্ততঃ দু-বেলা দু-মুঠো অন্নের জন্য কিছু একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতে চাইছিলেন তখনই প্রেরিত হলেন পাশ্চাত্যে চিকাগোর ধর্ম-মহাসভায়। তারপরের ইতিহাস তো আমাদের অনেকেরই জানা। বিজ্ঞান শিক্ষিত তরুণীরা কী গভীরভাবে স্বামীজী এবং তার বাণীকে গ্রহণ করেছিলেন তার ইতিহাস কিছু কিছু জানা থাকলেও তা পরিষ্কার নয়। আমরা সেগুলি জানার চেষ্টা করবো। তার পূর্বে জানতে হবে, স্বামীজী এমন কী করেছিলেন যাতে সমগ্র পাশ্চাত্য-ভাবজগতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। কী ছিল তাঁর মোহ-মুগ্ধ বাণী যা পাশ্চাত্য ভাবজগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল বেদান্তোক্ত

---

১. বাণী ও রচনা ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১১—১৩

সার্বভৌম একত্ব বিষয়ক। এ মতবাদ প্রথম দিকে দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী পাশ্চাত্যবাসীর কাছে উদ্ভট এবং দুরূহ বলে মনে হয়েছিল। স্বামীজী তাঁদের সমস্যাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে তা দূরীভূত করার জন্য নিজেকে মানবদরদী হিসেবে প্রতিভাত করতে চাইলেন। তিনি জাগতিক সবকিছুকে তুলে ধরলেন আত্মার আলোকে। যান্ত্রিক বিশ্ব ও অ-যান্ত্রিক বিশ্বের মধ্যে তিনি কোন আপোস করতে চাইলেন না। একটি অপরিবর্তনীয় অদ্বৈত সত্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলেই এই দু ধরণের মতবাদের সৃষ্টি—একথা তিনি পাশ্চাত্যবাসীদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন। এ দুটির কোনটিই সত্য নয়। তাঁর মতে, চরম সত্য 'এক'—সমস্ত রূপের উর্দ্ধে তা, একটি অনন্ত শ্বাশত ও অপরিবর্তনীয় সত্তা। "এই জগৎ সেই নিরপেক্ষ অপরিনামী পারমার্থিক সত্তা ; আর ব্যবহারিক সত্তা তাহাকেই বিভিন্নভাবে দর্শনমাত্র।"[১] "জড়ের মতোই জাগতিক জীব পর্যন্ত, আবৃক্ষা স্তম্ভ পর্যন্ত সেই এক মায়ার রাজত্ব। একই প্রকার যুক্তিতে ইহাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় বা নাস্তিক সিদ্ধ হয়।"[২] অন্যত্র বলেছেন ঃ—

"আমরা যে কোন ব্যবহারিক সত্তা দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, দেখিতে পাই—উহা অবশ্যই আমাদের জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ, অতএব সসীম হইয়া থাকে, আর সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা, তাহাতে তিনিও ব্যবহারিক মাত্র। কার্য কারণ-ভাব কেবল ব্যবহারিক জগতেই সম্ভব, আর তাঁহাকে সসীম রূপে ধারণা করিতে হইবে। তাহা হইলেও কিন্তু নিগুণ ব্রহ্মমাত্র। প্রকৃতপক্ষে জগৎ সেই নির্গুণসত্তা মাত্র, আর আমাদের বুদ্ধির দ্বারা উহার নাম-রূপ দেওয়া হইয়াছে। এই টেবিলের মধ্যে যতটুকু সত্য তাহা সেই সত্তা, আর এই টেবিলের আকৃতি ও অন্যান্য যাহা কিছু—সবই সদৃশ মানববুদ্ধি দ্বারা তাহার উপর আরোপিত হইয়াছে।"[৩]

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যবাসীর সামনে মানুষের চেতনার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বললেন যে, এই বিশ্বজগৎকে চেতনার একটি স্তর থেকে দেখলে মনে হবে, তা একটি জড়পুঞ্জ যা তার নিজস্ব নিয়ম ও সূত্র মেনে আবর্তিত হচ্ছে। আবার চেতনার আরও একটু গভীরে অবতরণ করলে অনুভূত হবে—এ জগৎ কেবল একটি ভাবস্রোত এবং চেতনার একেবারে গভীর প্রদেশে নিমগ্ন হলে এ জগৎকে একটি শুদ্ধ চৈতন্য বলে মনে হবে। স্বামীজী জগৎকে উপলব্ধি করার এই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণকে বেদান্তের আলোকে সহজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন বা পাশ্চাত্যবাসীকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলেন। বলেছেন ঃ—"দ্বৈতবাদে এই বিশ্বকে ঈশ্বর কর্তৃক চালিত সুবৃহৎ যন্ত্ররূপে কল্পনা করা হয় ; বিশিষ্টদ্বৈতবাদে ইহাকে জীবদেহের মতো একটি জীবন্ত ও পরমাত্মার দ্বারা অনুসৃত অখণ্ড সত্তারূপে কল্পনা করা

---

১. বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৬৯
২. বাণী ও রচনা ৩য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৬৫
৩. বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৭০

হয়।.......অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ইহা অর্থহীন কথা। অদ্বৈতবাদীগণ বলেন, দেবদূতগণ, জন্ম-মৃত্যুর অধীন অন্যান্য প্রাণী এবং চক্রবৎ ভ্রাম্যমান এই অনন্তকোটি আত্মা এই সমস্তই স্বপ্নমাত্র।"[১] জগৎ-কে স্বামীজী স্বপ্নবৎ বলেছেন। স্বপ্ন যেমন সত্য বলে মনে হয়, এই জীব জগৎ-ও স্থূলচেতনায় সত্য বলে মনে হয়। আসলে তা কিন্দু সত্য নয়। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তের ভূমিতে দাঁড়িয়ে লক্ষ করে জগৎ সম্বন্ধীয় এইসব আপাত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ বলে মনে হবে। সে কারণে পাশ্চাত্যবাসীরা স্থূলচেতনায় যে জগৎকে সত্য বলে মনে করছিলেন, স্বামীজী যে ব্যাপারে চরম সত্য কথা শিক্ষা দিলেন। বললেন, তা স্বপ্নবৎ সত্য। জাগরণে স্বপ্নের সত্য যেমন মিথ্যা বলে প্রতীয়মান হয়, ঠিক তেমনই এই জীবজগৎ স্থুলচেতনায় সত্য বলে মনে হলেও তা মিথ্যা। স্বামীজীর ভাষায় বলা যাক,—"এই জগতে নিয়ম বা সম্বন্ধ বলিয়াই কিছুই নাই, কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, পরস্পর যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। যখন আমরা এই জগদরূপ-স্বপ্নদর্শন হইতে জাগিয়া উঠিয়া ঐ স্বপ্নকে সত্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিব, তখন ঐ সমুদয়ই অসম্বন্ধ ও নিরর্থক বলিয়া প্রতিভাত হইবে—কতকগুলি অসম্বন্ধ জিনিষ যেন আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল—কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইতেছি, কিছুই জানি না, কিন্তু আমরা জানি যে, উহা শেষ হইবে।"[২]

পাশ্চাত্যবাসীদের স্বামীজী যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার চূড়ান্ত কথা ছিল, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। বেদান্তের 'জগৎমিথ্যা' সিদ্ধান্তকেই তিনি দোদুল্য পাশ্চাত্য চিত্তের সামনে রাখলেন। "নেহ নামাস্তি কিঞ্চন"—ব্রহ্মে বিন্দুমাত্র নানাত্ব নাই। ব্রহ্ম স্বগত ভেদ, স্বজাতীয় ভেদ ও বিজাতীয় ভেদ-রহিত। যেহেতু ব্রহ্ম সর্বপ্রকার ভেদ-রহিত, সেজন্য শুদ্ধ 'এক' থেকে 'বহু'র আবির্ভাব হইতে পারে না। অথচ চারিদিকে আমরা বহুর অস্তিত্ব লক্ষ করি। জড়জগৎ, প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, দেশ, কাল প্রভৃতি বহুত্বের নিদর্শন। যা ঘটতে পারে না তা ঘটলেই মায়ার সৃষ্টি হয়। জগৎকে মিথ্যা বলার কারণ এই যে, তা সদসদ বিলক্ষণ ; অর্থাৎ সৎ ও নয়, অসৎও নয়। এই জগৎ বন্ধ্যা পুত্রের মতো অসৎ বস্তুও নয়, কারণ জগৎকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেশ-কাল-কার্য-কারণ সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান হয়। অথচ বন্ধ্যাপুত্র কেউ কখনও দেখেন নি। আবার ব্রহ্মানুভূতি হলে জগৎ সম্পর্কে পৃথক জ্ঞান থাকে না ; জগদ্‌জ্ঞান বর্ধিত হয়। তখন ব্রহ্মাও আছেন, এ বস্তুজগৎ আছে এরকম মনে হয় না। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—সব কিছুই এরূপ মনে হয়। এ কারণেই জগৎ-কে মায়া বলা হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ-জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায়। স্বামীজী বুদ্ধদেবের মতো আধুনিক যুগের কিছু কিছু অভিজ্ঞতাবাদীদের মতো 'এ জগতের সব কিছুই অসামঞ্জস্য পূর্ণ' এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। আর, তিনি

---

১. বাণী ও রচনা ৩য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৩৬০—৬২

২. বাণী ও পতনা ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৪—৭৫

ইন্দ্রিয় ও অতিন্দ্রিয় জগতের দ্বৈত-অস্তিত্বও মেনে নেন নি। এ সম্পর্কে তাঁর মননধর্মী ব্যাখ্যা ঃ

"বৌদ্ধ দার্শনিক বলিতেছেন,......একটি দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, এই গুণগুলিরই কেবল অস্তিত্ব আছে। ইহার অতিরিক্ত তুমি আর কিছুই দেখিতে পাও না। ইহাই অধিকাংশ আধুনিক অজ্ঞেয়বাদীদের মত। এই দ্রব্যগুণের বিচার আর একটু উচ্চভূমিতে লইয়া গেলে দেখা যায়, ইহা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্তার বিচারে পরিণত হইয়াছে। এই দৃশ্য জগৎ—নিত্যপরিণামশীল জগৎ রহিয়াছে এবং ইহার পিছনে এমন কিছু রহিয়াছে, যাহার কখন পরিণাম হয় না ; কেহ কেহ বলেন, এই দ্বিবিধ পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে। আবার অধিকতর যুক্তির সহিত অপরে বলেন, এই উভয় পদার্থ মানিবার কোন আবশ্যকতা নাই, আমরা যাহা দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, তাহা 'দৃশ্য' মাত্র। দৃশ্যের অতিরিক্ত কোন পদার্থ মানিবার কোন অধিকার আমাদের নাই। কেবল বেদান্তের অদ্বৈতবাদ হইতে আমরা ইহার উত্তর পাইয়া থাকি—কেবল একটি বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহাই কখন দ্রষ্টারূপে কখনও বা দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা সত্য নহে যে, পরিণামশীল বস্তুর সত্তা আছে, আর তাহারই অভ্যন্তরে—অপরিণামী বস্তুও রহিয়াছে ; সেই এক অপরিণামী বস্তুই পরিণামশীল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।"[১]

স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈত বেদান্তের মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও, মায়া সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা ছিল নিজস্ব। স্বামীজীর মায়া ব্যাখ্যা বা জগতের আপাত প্রতীয়মানতা সমকালীন পাশ্চাত্যবাসীদের কাণ্টীয় দর্শনের অনরূপ বলে মনে হয়েছিল। কাণ্টীয় দর্শনে মানব-মনের দ্বারাই স্থান-কালিক জগৎ নিরূপিত হয় এবং এই মন একটি সত্য বস্তু যাকে অতিক্রম করা যায় না। এই জগতের সত্যরূপ জানা কখনই সম্ভব নয়। কান্টের মতে, বস্তুর সত্তা চিরদিনই ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে। স্বামীজীর মতে, মায়া কোন তত্ত্ব নয়, তা কতগুলো ঘটনার বিবৃতি। সেই ঘটনাগুলো হচ্ছে ঃ এক. মানুষের শক্তি বা ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। প্রকৃতির অসামান্য শক্তির সামনে মানুষ দুর্বল—সে সম্পর্কে মানুষ ক্রমশ সচেতন নয়। মানুষের জ্ঞানও আপেক্ষিক। সুতরাং সেই মানুষ তার সীমিত ক্ষমতার দ্বারা অনন্ত সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। আবার, মৃত্যুকে অবশ্যম্ভাবী জেনেও মানুষ জীবনের প্রতি আসক্ত হয়। সত্যবীর যুধিষ্ঠির মানুষের মনের এই অবস্থার কথা স্মরণ করে বিস্মিত হয়েছিলেন। জগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য জিনিষ কী?—একথার উত্তরে তাই যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন, প্রতিদিন কিছু কিছু লোকের মৃত্যু হচ্ছে, তবুও মানুষ এমনভাবে কাজ করে যাতে মনে হয় তাদের আর মৃত্যু হবে না।—জীবনের এই অবস্থাকেই মায়া বলা হয়।

১. বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৬৩

লক্ষণীয়, স্বামীজীর মতে, মায়া বলতে কতকগুলি ঘটনাকে বুঝায়, যা আমরা কখনই অস্বীকার করতে পারি না, অথচ যার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা ব্যর্থ হই। তিনি পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে এই শিক্ষায় দিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর লাভ করতে গেলে যে ইহলোক ত্যাগ করতে হবে এমন কোন কথা নেই ; বেদান্তের শিক্ষা তা নয়। তাঁর মতে, বেদান্ত জগৎকে অস্বীকার করে নি ; জগৎকে ভাগবত সত্তায় উন্নীত করেছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ঈশোপনিষদের মন্ত্র—"ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্"—ঈশ্বরের দ্বারা সবকিছু আচ্ছাদিত তা লক্ষ করতে হবে। সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন বলতে মৃত্যু বা অমঙ্গলকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরদর্শন বুঝায় না। "যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত জঃ"—অমৃতত্ব ও মৃত্যু একই সত্তার দুই দিকে। সে কারণে সংঘটিত সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বরানুভব করতে হবে। মানুষ যখন সর্বভূতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করবে, তখনই সে মুক্ত হবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, মুক্তি কোন প্রাপ্য বস্তু নয়। প্রত্যেক মানুষই স্বভাবতই মুক্ত। অ-বিদ্যা বা অ-জ্ঞানের অন্ধকারে মানুষ তার মুক্ত স্বরূপ সত্তার পরিচয় পায় না। অবিদ্যার আচরণ সরে গেলেই মানুষ তখন নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবে পরিণত হয়। উপনিষদ সেই অবস্থাকে বলেছেন 'তত্ত্বমসি'—তুমি সেই। এই অবস্থায় পৌঁছতে গেলে যে পথ দিয়ে চলতে হবে—সে সম্পর্কে পাশ্চাতবাসীদের স্বামীজী দিনের পর দিন শিক্ষা দিয়েছিলেন। মূলত তা যোগেরই শিক্ষা। তিনি শিখিয়েছিলেন ত্যাগ, অনাসক্তি, নিত্য ও অনিত্যের মধ্যে বিচার, ধ্যান, নিষ্কাম কর্ম, ভক্তিযোগ প্রভৃতি। মন যাতে শুদ্ধ ও উন্নত হয়ে জাগতিক স্থুলত্বের উপরে এক সূক্ষ্ম আনন্দময় জগতে বিচরণ করতে পারে—সেই পথ চলার শিক্ষায় তিনি দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, মানুষের সাধনা তখনই পূর্ণ, সার্থক হবে যখন মানুষ এই অবস্থায় উপনীত হতে পারবে। যুগ যুগ ধরে মুনি ঋষিরা এই অবস্থায় উপনীত হওয়ার সাধনায় ব্যস্ত থেকেছেন। চরম সত্ত্বার সঙ্গে মিলিত হওয়ার সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। স্বামীজীর মতে, "যতদিন না তোমার এই উপলব্ধি হইতেছে, ততদিন তোমাতে এবং নাস্তিকে কোন প্রভেদ নাই। নাস্তিকেরা তবু অকপট, কিন্তু যে বলে, 'আমি ধর্মবিশ্বাস করি' ; অথচ কখন উহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে না, সে অকপট নহে।"[১]

পাশ্চাত্য দেশে অবস্থানের সময় স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন, এ দেশের মানুষ যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়ে সবকিছুকে বিচার করতে চায়। মূলত বিজ্ঞানের শিক্ষায় পাশ্চাত্যে মনকে এমন অবস্থায় এনে ফেলেছিল। স্বামীজী তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন, অনন্ত চরম সত্তাকে পেতে গেলে যুক্তি তর্ক নয় ; অনুমান নয়, একে জানতে হবে অপরোক্ষ উপলব্ধির সাহায্যে। জগতের সকল মানুষেরই এ রকম উপলব্ধি হোক স্বামীজী তা চাইতেন। তিনি বলেছেন ঃ "ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয়। তর্কের বিষয় নহেন। সমুদয় যুক্তি ও তর্কই কতকগুলি অনুভূতির উপর স্থাপিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অধিকাংশ লোক

১. বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৬১

বিশেষত বর্তমানকালে ভাবিয়া থাকে, ধর্মে প্রত্যক্ষ করিবার কিছু নাই ; ধর্ম যদি লাভ করিতে হয়, তবে বাহিরের বৃথা তর্কের দ্বারাই লাভ করিতে হইবে।........যেমন বহির্বিজ্ঞানে, তেমন পরমার্থ বিজ্ঞানেও আমাদিগকে কতকগুলি সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। মতামত সেগুলিরই উপরই স্থাপিত হইবে।.......জগতের সাধু পুরুষদের আমাদিগকে শুধু এইটুকু বলিবার অধিকার আছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের মনকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপলব্ধ সত্যের কথাই তাঁহারা বলিতেছেন ; তাঁহারা আশ্বাস দেন যে, আমরা সত্য লাভ করিব। ঐরূপ করিলে তখনই আমরা বিশ্বাস করিব, তাহার পূর্বে নহে।.....এই বিষয়টি বিশেষ করিয়া বুঝা এবং অপরোক্ষনুভূতির ভাব সর্বদা মনে জাগরূক রাখা উচিৎ।......ইহাই বেদান্তের মুল কথা—ধর্ম সাক্ষাৎকার, কেবল কথায় কিছু হইবে না।”[১]

স্বামীজী যে কয়বছর পাশ্চাত্যে ছিলেন, তার বেশির ভাগ সময়ই নিয়োজিত করেছিলেন ভারতচেতনায় পাশ্চাত্য-মনকে পরিপুষ্ট করতে। সেই ভারতচেতনার সারবস্তু তিনি আহরণ করেছিলেন বেদান্ত থেকেই। পাশ্চাত্যের বহু জায়গায় বেদান্তকেন্দ্র খুলে সেই বেদান্তের বাণী প্রচার করেছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল ঐ বাণীর মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যের অস্থির মনকে শান্ত করে তোলা। মানুষের চেতনা, এষণা ও আবেগকে পরিশুদ্ধ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সর্বত্র ব্যাপ্ত আত্মাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, অনিত্য থেকে নিত্যে উত্তরণই ছিল তাঁর শিক্ষার মূল কথা। স্বামীজীর এই নতুন-চেতনার শিক্ষা পাশ্চাত্য-মনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল। পাশ্চাত্য ভাবজগতে স্বামীজীর এই প্রভাবকে কোপার্নিকাসীয় বিপ্লবের প্রভাবের থেকেও বেশি একথা আমাদের মনে হয়। সেদেশের মানুষের জীবনধারা ও চিন্তাজগতকে বিশ্লেষণ করে স্বামীজী দেখালেন, তাঁদের জীবনে কত অসামঞ্জস্য। আর এই অসামঞ্জস্যের জন্যই তাঁদের মন কোথাও স্থির আশ্রয় পাচ্ছে না। স্বামীজীর বাণীর মধ্যে তাঁরা জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেল। এই আত্মিক উদ্বোধনের শিক্ষা স্বামীজীর পূর্বে তাঁদের আর কোন ধর্মগুরুই দিতে পারে নি। তিনি সকল জীবের একত্ব ও প্রতিটি জীবের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে শ্রদ্ধা করার কথা তাঁদের বললেন। বললেন ঃ “..........সকল অবস্থাতেই সমুদয় জগৎ ঈশ্বরপূর্ণ, কেবল নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর।”[২] “যদি তোমার প্রত্যেক চালচলনে, তোমার বস্ত্রে, তোমার কথাবার্তায়, তোমার শরীরে-আকৃতিতে, সকল জিনিষে ভগবানকে স্থাপন কর, তবে তোমার চক্ষে সকল দৃশ্য বদলাইয়া যাইবে এবং জগৎ দুঃখরূপে প্রতিভাত না হইয়া স্বর্গরূপে পরিণত হইবে।”[৩] সনাতনী খ্রিষ্টধর্মের কল্পিত অনন্ত স্বর্গ ও

---

১. বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৮৭—৮৯ এবং ১৯১

২. বাণী ও রচনা ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৬৯

৩. বাণী ও রচনা ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৭১

অনন্ত নরকের কল্পনাকে খণ্ডন করে তিনি এই স্বর্গরাজ্য স্থাপনের কথায় বলেছেন। খ্রিষ্টধর্মের ঐ ধারণার দ্বারা যে জীবনে পরিপূর্ণতা আসে না—সেকথা স্বামীজী দীপ্ত কণ্ঠে তাঁদের কাছে পরিবেশন করেছিলেন। অপরদিকে, অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ততাকে চাপা রেখে জ্ঞান ও যুক্তির অতিমাত্রিক প্রাধান্যকে তিনি প্রশ্রয় দিতে পারেন নি। বলেছেন, "এখন প্রয়োজন উচ্চতম জ্ঞানের সহিত মহত্তম হৃদয়, অনন্ত জ্ঞানের সহিত অনন্ত প্রেমের সংযোগ। সুতরাং বেদান্তবাদী বলেন, সেই অনন্ত সত্তার সঙ্গে এক হওয়াই একমাত্র ধর্ম ; আর তিনি ভগবানের এই তিনটি গুণের কথাই বলেন— অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ ; আর বলেন, এই তিনিই এক। জ্ঞান ও আনন্দ ব্যতীত সত্তা কখন থাকিতে পারে না। আনন্দ বা প্রেম ব্যতীত জ্ঞান এবং জ্ঞান ব্যতীত আনন্দ বা প্রেম থাকিতে পারে না। আমরা চাই এই সম্মিলন—এই অনন্ত সত্তা জ্ঞান ও আনন্দের চরম উন্নতি—একদেশী উন্নতি নহে।"[১]

পাশ্চাত্য ধর্মকে মানবিক যুক্তি ও বিশ্লেষণী চিন্তার বিরোধী ও পরিপন্থী বলে মনে করা হত। ধর্মকে readymade একটি তত্ত্ব বা একটি dogma বলে মনে করা, কতকগুলি ভাববাদী চিন্তা বলে ধরা, এই ছিল ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের চিন্তাধারা। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের সঙ্গে তার একটা সংঘর্ষ লক্ষ করা যাচ্ছিল। পাশ্চাত্য ধর্ম ও বিজ্ঞানের নিরন্তর পারস্পরিক দ্বন্দ্বে উদার দৃষ্টিভঙ্গির অভাব দেখে স্বামীজী মন্তব্য করেছিলেন ঃ "ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ কী, তাহা আমরা জানি, আর ইহাও জানি যে, উহা প্রাচীন ধর্মতত্ত্ববাদীগণের কীরূপ ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছে, যেমন এক একটি নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইতেছে, অমনি যেন তাঁহাদের গৃহে একটি করিয়া বোমা পড়িতেছে, আর সেই জন্যই তাঁহারা সকল যুগেই এই সকল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।"[২]

স্বামীজী সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতাবোধ ও বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটা ঐক্যসূত্রে গাঁথবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেকথা পাশ্চাত্যবাসীদের শিক্ষা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে প্রতীচ্যের আর এক মনস্বী বলেন ঃ "ভারসাম্য ও সমন্বয়, এই দুইটি কথার মধ্যে বিবেকানন্দের সংগঠন-প্রতিভাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। সমগ্র সম্পূর্ণ চারিটি যোগ, ত্যাগ ও সেবা, শিল্প ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক হইতে সর্বাপেক্ষা ব্যবহারিক সকল কর্ম—এই সমস্ত মানস পথকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।.....তিনি ছিলেন সকল প্রকার মানসিক শক্তির সামঞ্জস্যের মূর্ত প্রকাশ।"[৩]

১. বাণী ও রচনা ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১০৮
২. বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৪
৩. বিবেকানন্দের জীবন, ২য় সং, পৃঃ ২৬৮

বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞানকে যথার্থ দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। যথার্থ দৃষ্টি বলতে আমরা সমধিক কল্যাণ ও সর্বাঙ্গীন প্রজ্ঞা-দৃষ্টিকে নির্দেশ করতে চায়। স্বামী বিবেকানন্দ যুগোচিত ঐ কাজটিই সম্পন্ন করেছিলেন। প্রাচ্যের ধর্মে অবদান এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানে অবদান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি 'My Master' বক্তৃতায় বলেছেন ঃ

"যে মনের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, সে-ই কেবল সুখী হইতে পারে, অপরে নহে। আর এই যন্ত্রের শক্তিই বা কি? যে ব্যক্তি তারের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করিতে পারে তাহাকে খুব মহৎ ও বুদ্ধিমান বলিব কেন? প্রকৃতি কি প্রতিমুহূর্তে ইহা অপেক্ষা লক্ষ গুণ অধিক তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করিতেছে না? তবে প্রকৃতির পদতলে নত হইয়া তাহারই উপাসনা কর না কেন?"[১]

বিজ্ঞান অনুসারী প্রতীচ্যবাসীদের কাছে তিনি প্রায়ই বলতেন যে, বিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রাদি ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে, অদ্বৈত বেদান্তের কোন বিরোধ নেই, বরং একটা সামঞ্জস্যবোধ রয়েছে। এই দুয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কোরে পাশ্চাত্যবাসীরা যে জটিল আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিলেন স্বামীজী তার সমাধান কল্পে বলেছিলেন, এগুলি চরম সত্যের বিচিত্র প্রকাশ। (একে আমরা পরমব্রহ্মের লীলাও বলতে পারি)। তিনি এরই সূত্রে বলেছেন ঃ

"মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী—সে এমন এক মীমাংসা করিতে চায়, যাহাতে জগতের সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে। প্রথমে এমন এক জগৎ আবিষ্কার কর, এমন এক পদার্থ আবিষ্কার কর, যাহা সকল জগতের এক সাধারণ তত্ত্বস্বরূপ—যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয় গোচর করিতে পারি না বা পারি, কিন্তু যাহাকে যুক্তি বলে সকল জগতের ভিত্তিভূমি, সকল জগতের মনিশন মধ্যস্থ সূত্রস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। যদি আমরা এমন এক পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারি, যাহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে না পারিলেও কেবল অকার্য যুক্তিবলে উচ্চ-নিচ সর্বপ্রকার স্তরের সাধারণ ভূমি—সর্বপ্রকার অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি—বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সমস্যা কতকটা মীমাংসের কাছাকাছি হইল বলা যাইতে পারে ; সুতরাং এই সমস্যার মীমাংসার একমাত্র উপায়—অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে।"[২]

স্বামীজী প্রতীচ্যের বিজ্ঞান সাধনার পীঠস্থান সমূহে যে রাজোচিত সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন তার অন্যতম প্রধান কারণ বোধহয় এই যে, তিনি ধর্মকে কুসংস্কারের আভরণে ঢেকে রাখতে চান নি। তা বিচার বিশ্লেষণ করেছেন বৈজ্ঞানিক যুক্তির পরম্পরার মধ্য দিয়ে। ফলে হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য যুগোপযোগী হয়ে উঠেছে। যোগ সাধনার প্রতিটি অধ্যায়কে বিজ্ঞানের শুভ্র আলোকে বিশ্লেষণ করে পাশ্চাত্যের মননভূমিতে বপন করেছেন।

১. বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ১ম সং পৃঃ ৩৭৭—৭৮

২. বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৮০—৮১

তিনি দেখিয়েছেন, বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান ধর্মে, মেজাজে ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে এক। উভয় পথেই সত্যদর্শন সম্ভব। এছাড়া, দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়েও উভয়ের মধ্যে মিল বর্তমান। স্বামী বিবেকানন্দ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন, 'আত্মার বিকাশের প্রক্রিয়া।' বেদান্ত এই আত্মাকে বলেছেন 'ব্রহ্ম' যা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুরই মূল সত্তা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই ব্রহ্ম সম্পর্কে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে তা উল্লেখযোগ্য ঃ

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসং বিশন্তি
তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ ব্রহ্মেতি ॥ (৩ ঃ ১)

—যাঁর থেকে সব কিছুর সৃষ্টি, যাঁর মধ্যে সবকিছুর অস্তিত্ব, প্রলয়ে যার মধ্যে সব কিছু বিলীন হয়ে যায়, তুমি তাকে জান ; তিনিই ব্রহ্ম। আধুনিক বিজ্ঞানিদের কাছে এসব হচ্ছে 'বাস্তব সত্য।' জ্যোতিঃপদার্থবিদ, ফ্রেড হায়লের ভাষায় তা হল সৃজনক্ষম মৌল পদার্থ বা বস্তু। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রাচীন বেদান্তের সঙ্গে এই আধ্যাত্মিক বন্ধনের কথা উল্লেখ করে স্বামীজী ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনের বক্তৃতায় বলেছিলেন—

'Manifestation, and not Creation, is thc word of Sciencc to-day, and Hindu is only glad that what hc has bcen Cherishing in his bosom for ages is going to bc bought in more forcible Language and with futher light, from thc latcst conclusions of Science."[১]

লণ্ডনে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে 'ব্রহ্ম ও জগৎ' বিষয়ে বক্তৃতাতেও বিজ্ঞান ও বেদান্তের নৈকট্যের কথায় বলেছেন ঃ

'বিজ্ঞানের গতি কোন্ দিকে তা কি আপনারা বুঝতে পারছেন না? হিন্দুজাতি মেটাফিজিকস্' যুক্তিবাদ এবং মনোবিজ্ঞানের অনুশীলনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। ইউরোপের জাতিসমূহ বহিঃপ্রকৃতি থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং এখন তাঁরাও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মনোবিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে আমরা সেই একক সত্তায়, সেই বিশ্বসত্তায় প্রতিটি পদার্থের অন্তরাত্মায়, তত্ত্বে হাজির হতে পারি।"[২]

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্বভাবসুলভ ইতিহাসচেতনার মধ্য দিয়ে বেদান্ত ও বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাকে খুব বেশি মাত্রায় মর্যাদা দিচ্ছে, কিন্তু প্রাচীন সভ্যতায় তা দেওয়া হতো না। আজ বিজ্ঞানকে তার নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে—বিজ্ঞানকে

---

১. The Complete works, Vol, 1, p. 15, 11th edn.
২. ঐ ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪০, ঐ (অনূদিত)

মানবিক কল্যাণে লাগাতে হবে। বর্তমান চিন্তাধারা অনুসারে স্বামীজীর এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান তা কম্বু কণ্ঠে ঘোষণা করা যেতে পারে।"

স্বামীজী ধর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তি-পরম্পরার উপর অত্যধিক জোড় দেবার জন্য পাশ্চাত্যবাসীদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি এ-ও বলেছেন—ধর্ম যদি বিজ্ঞানের যুক্তি নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির পরিত্যাগ করে তবে তা নিজেকেই দুর্বল করবে। তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"ধর্মের ভিত্তিগুলি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আর আধুনিক মানুষ প্রকাশ্যে যাহাই বলুক না কেন, তাহার অন্তরের গোপন প্রদেশে এ বোধ জাগ্রত যে, পুরোহিত সম্প্রদায় তাহাকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছে বলিয়াই, কোনো শাস্ত্রে লেখা আছে বলিয়াই, কিংবা তাহার স্বজনেরা চাহিতেছে বলিয়াই কিছু বিশ্বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। অবশ্য এমন কিছু লোক আছে, যাহাদিগকে তথাকথিত জনপ্রিয় বিশ্বাসে সম্মত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একথাও আমরা নিশ্চয় জানি যে, তাহারা বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা করে না। তাহাদের বিশ্বাসের ভাবটিকে 'চিন্তাহীন অনবধানতা' আখ্যা দেওয়া চলে।"[১]

অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন যুক্তির পথ ধরে সমাধানের পথে এগোতে হয়, ধর্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রেও তেমনি যুক্তি পরম্পরার মধ্য দিয়ে আত্মিক উদ্বোধন তথা পরিপূর্ণতার মুক্তিরাজ্যে পৌঁছতে হয়। সে প্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্য হলো ঃ

"অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির প্রত্যেকটিই যুক্তির যে সকল আবিষ্কারের সহায়তায় নিজেদের সমর্থন করিতেছে, ধর্মকেও কি আত্ম সমর্থনের জন্য সেগুলির সাহায্য লইতে হইবে? বর্হিজগতে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তত্ত্বানুসন্ধানের যে পদ্ধতিগুলি অবলম্বিত হয়, ধর্ম বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি সেই একই পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে? আমার মতে তাহাই হওয়া উচিত।..........পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের সিদ্ধান্তগুলি যতখানি বিজ্ঞানসম্মত, ধর্ম যে অন্তত ততখানি বিজ্ঞানসম্মত হইবে শুধু তাই নয়, বরং আরও বেশি জোড়ালো হইবে ; কারণ জড়বিজ্ঞানের সত্যগুলির পক্ষে সাক্ষ্য দিবার মতো আভ্যন্তরীণ আদেশ বা নির্দেশ কিছু নাই ; কিন্তু ধর্মের তাহা আছে।"[২]

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের উপলব্ধি এক চরম সত্যের সন্ধানে দেয়। ধর্মের স্বরূপ প্রকাশিত সত্যে, পরিপূর্ণতায়। কুসংস্কারহীন বৈজ্ঞাণিক দৃষ্টিভঙ্গিই সেই চরম সত্যের উপলব্ধিতে সহায়তা করে মানুষকে। প্রাচীন ভারতবর্ষের মুনি ঋষিরা এইভাবেই জীবনের সঙ্গে ধর্মকে অণ্বয় করতে পেরেছিলেন। উপনিষদে স্বীকৃতি আছে। সেখানে ঘোষণা করা হয়েছে প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্মকে পর্যবেক্ষণশীল বিবিক্ত বিশ্লেষণী দৃষ্টিতেই গ্রহণ করেছে। স্বামীজী পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে প্রাচীন ভারতীয় জীবনধারার সেই পথকেই নতুন করে

১. বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৩২
২. বাণী ও রচনা ৩য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৩২

তুলে ধরেছেন। বেদান্ত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এ দুয়ের সমন্বয়ে জীবনে পরিপূর্ণতা আসবে। প্রাচীন বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করার জন্য তিনি পাশ্চত্যবাসীদের দিনের পর দিন শিক্ষা দিয়েছিলেন। এ দুয়ের আত্মিকসংযোগ উপলব্ধি করে তিনি বলেছিলেন ঃ

"আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ 'সৃষ্টি' না বলিয়া 'বিকাশ' শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। হিন্দু যুগ যুগ ধরিয়া যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে, সেইভাব আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নূতনতর আলোকে আরও জোড়ালো ভাষায় প্রচারিত হইবার উপক্রম দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইতেছে।"[১]

ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের যে কোন বিরোধ নেই—একথা স্বামীজী পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বক্তৃতায় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন। নিকটবর্তী আগামীতে যে এই উভয় ধারা মিলিত হবে—এ ভবিষ্যৎ বাণীও তিনি করেছিলেন। ধর্মের পথ সব সময়ই সত্যের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে ; বিজ্ঞানও সেই একই উদ্দেশ্যে ধাবিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী মনীষী আর্ণেষ্ট হেকেলও একই মন্তব্য করেছেন—"Every effort of genuine Science makes for a knowledge of truth."[২] অধ্যাপক হাক্সলি বলেছেন, "প্রকৃত বিজ্ঞান" মানুষকে ধর্মের ছদ্মবেশে আবৃত ভেজাল বিজ্ঞানের বোঝা থেকে বিমুক্ত করে।"[৩] স্বামীজী লণ্ডনের শিক্ষিত সমাজে বক্তৃতা দেওয়ার সময় বিজ্ঞানের বিষয়ের অবতারণা করেছেন প্রকৃত একজন বৈজ্ঞানিকের মতোই। তিনি জানতেন পাশ্চাত্য জনসমাজে ভারতচেতনার যে কথায় বলি না কেন তা বৈজ্ঞানিক পন্থায় উপস্থাপনা করতে হবে ; তা না হলে সে বাণী তাঁরা বিশ্বাস করে না। প্রাচ্যদেশের তিনিই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের বাণীকে পাশ্চাত্যজগতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবতারনা করতে পেরেছেন। স্বামীজীর বিজ্ঞান শিক্ষাদানের একদিনের কথা মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় অনবদ্য ভাবে ফুটে উঠেছে। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "স্বামীজী এই দিনে অনন্ত স্থানের একটা উদ্ভুত ব্যাখ্যা বা জ্ঞান সকলকে দিয়াছিলেন। যখন তিনি নীহারিকা-তথ্যের বিষয় বলিতে লাগিলেন তখন বোধ হইল, কী অসীম স্থান পড়িয়া রহিয়াছে যাহা আমরা কখনও উপলব্ধি করিতে পারি না! এই দিনে স্বামীজী পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক হইয়াছিলেন। দার্শনিকভাব বা ভক্তিভাব তখন তাঁহার আদৌ ছিল না। একজন মহাবৈজ্ঞানিক বা Astronomer হইয়াছিলেন। জ্যোতিস্ক মণ্ডলের বিষয়ে তাঁহার কী অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান ছিল—সেই রাত্রে তিনি তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ মাত্র দিয়াছিলেন। অসীম ও অনন্ত স্থানের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা তিনি করিতে লাগিলেন। শ্রোতৃগণ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল।"[৪]

স্বামীজী প্রাণের অস্তিত্ব এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র অনুভব করতেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন আলোচনায় ও বক্তৃতায় এই উপলব্ধিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে পাশ্চাত্য- শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। 'Lifc is everywhere' এই কথাটির গূঢ় তাৎপর্যকে যাতে তাঁরা গ্রহণ করতে পারে সে ব্যাপারে সচেষ্ট হতেন। আপাতদৃষ্টিতে যাকে প্রাণহীন বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে সেখানেও প্রাণের স্পন্দন বর্তমান। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু থেকে বিরাটকায় শরীরীর অভ্যন্তরেও সেই একই প্রাণের স্রোত প্রবাহমান। স্বামীজী লণ্ডনে বক্তৃতা প্রদানকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই স্থূল সত্যটিকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন ঃ

"এই সূর্য থেকে পৃথিবী, আকাশ বায়ু, যা কিছু আমরা দেখতে পাই, বুঝতে পারি বা উপলব্ধি করতে পারি, সমস্তই প্রাণ বা জীবে পরিপূর্ণ। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম যে কোন বস্তু নিরীক্ষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তার মধ্যে প্রাণ আছে। অনুমাত্র স্থানেও জীবন্ত শক্তি বা প্রাণ আছে ; যেমন বীজ থেকে প্রাণ, পরে অবয়ব বিশিষ্ট প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে। বায়ুতে প্রাণী বা জীবাণু পরিপূর্ণ রয়েছে। সূর্যরশ্মিও এমনই প্রাণে পূর্ণ। আকাশ বাতাস সর্বত্র প্রাণী আছে। বড়ো আকারের জীব যেমন পরিবর্ধিত ও সম্মিলিত, এইসব অনুপ্রাণী তেমনি নাও হতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে জীবন্ত শক্তি বর্তমান। এই রকম অনুপ্রাণী মিলে বড়ো আকারের প্রাণী উৎপন্ন হচ্ছে। সমস্ত সৌরমণ্ডল প্রাণীতে পরিপূর্ণ এবং খগোল থেকে এই অনুপ্রাণী অন্য খগোলে যাচ্ছে। সমস্ত সৌরমণ্ডল জীবন্ত ও প্রাণ বিশিষ্ট। প্রাণহীন কোনও বস্তু হতে পারে না। আমাদের এই দেহকে কতকগুলি চেতন জীবসমষ্টি বলা যেতে পারে। আবার তা বিশ্লেষিত হলে অন্য বস্তুতে সেই বীজসমূহ চলে যাচ্ছে। এইভাবে বীজপরমানুসমূহ সর্বত্র যাতায়াত করছে।[১]

স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়ে পাশ্চাত্যের মানুষেরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর সুগভীর বিজ্ঞানবোধের পরিচয় তাঁরা পেলেন যখন তিনি বললেন একটা স্পন্দন ব্রহ্মাণ্ডের এক কোণে উঠলে তার গতি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে অনুভূত হয়। আমরা যখনই কোন চিন্তা করি, তা সৎ বা অসৎ যা-ই হোক না কেন, তা তরঙ্গাকারে সর্বত্র পরিব্যপ্ত হয়। সৎ বা অসৎ সব চিন্তাই সূক্ষ্মকারে থেকে যায়। লণ্ডনে প্রদত্ত আর একটি বক্তৃতায় এ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

'একটা wave বা ঢেউ যদি একস্থানে দেওয়া (তোলা) হয়, তাহা হইলে সেই ঢেউ বা স্পন্দন ব্রহ্মাণ্ডময় চলিবে। আমরা যদি নিভৃতে কোনও সৎ চিন্তা করি এবং সেই চিন্তা যদি প্রবল বেগ বা দৃঢ়ভাব ধারণ করে তবে সেই স্পন্দন ব্রহ্মাণ্ডময় চলিবে। এই স্পন্দনের উপরেই সৃষ্টিটা ইহাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই জন্য একস্থানে স্পন্দন উপস্থিত হইলে সর্বত্র উহা চলিবে।"[২]

১. লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২
২. লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—মহেন্দ্রনাথ তত্ত পৃঃ ১৩৭

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে স্বামীজীর বিশ্লেষণ অভ্রান্ত। তিনি সেসময় বিভিন্ন বক্তৃতায় এ প্রসঙ্গে যা মন্তব্য করেছিলেন, বহু বিখ্যাত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সেই সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করতে পারেন নি। ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল, বা বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী Abbe Lcmaitrc স্বামীজীর সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। সৃষ্টিটা সমস্তই একটা Undifferentiatcd mass of energy বা অবিভক্ত শক্তিরাশি। নূতন একটা বস্তু যদি সৃষ্টির বাইরে তৈরি করা যায়, তাহলে সৃষ্টির মধ্যে তা রাখবার স্থান নেই, কারণ সৃষ্টিটা সর্বত্রই পরিপূর্ণ—সৃষ্টি সম্পর্কে স্বামীজীর এই মন্তব্যের সঙ্গে স্থির-তত্ত্ব বা Steady theory র বেশ মিল আছে। এই তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে—বিশ্ব অনন্তকাল ধরে ছিল এবং থাকবে-ও। প্রাচীন নক্ষত্রগুলো অন্তিমদশায় পর্যবসিত হলে তার স্থানে নূতন নক্ষত্র জন্ম নেবে। অর্থাৎ আদিতে যে সংখ্যক নক্ষত্র ছিল, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে তা একই থাকবে। স্বামীজীর বক্তৃতা তুলে ধরছি ঃ 'The sumtotal of the cosmic Energy is the same.'[১] সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে শক্তি তার পরিমাণ সব সময়েই সমান। ফ্রেড হয়েল-এর বক্তব্য হলো এই যে, বিশ্ববিস্তারশীল.......একথা অস্বীকার করা যাবে না, কিন্তু বিস্তারের ফলে যে আন্তর্নক্ষত্র বা আন্তর্নীহারিকার শূন্যতা বেড়ে যাচ্ছে, তা তিনি অস্বীকার করেছেন। Abbe Lemaitrc এর বক্তব্য প্রায় এক। এখন প্রশ্ন, এই যে অনবরত সৃষ্টি হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের শূন্য স্থানকে পূরণ করে দিচ্ছে,তা কোন শক্তি থেকে, বা তার মূলই বা কি? এই শক্তির উৎস কোথায়? এ রকম হাজারো প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন জিজ্ঞাসু মহলে দেখা দিয়েছিল। এই চিরন্তন জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের আলোকে। স্বামীজী কী বলেছেন তা বলার পূর্বে একজন প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকের ঐ শক্তি সম্পর্কে কি অনুভূতি তা উল্লেখ করি। বিজ্ঞানীর নাম হ্যারে স্যাপলে। তিনি বলেছেন ঃ

".........With bold advances in cosmogony we may in future hear less of a creator and more of such things as antimatter', 'minor world,' and closed space time.' Finally However, may always elude us. That the whole universe evolves, or from where, or where to–the answers to these questions may be among the unknowable."[২]

স্বামীজীর দৃষ্টিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালের ঐ সত্যতা ধরা পড়েছিল। বেদান্ত যে ঐ শক্তির উৎসের কথা রয়েছে, স্বামীজী পাশ্চাত্যে তা কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,.. যে শক্তিতে ব্রাহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু নিশ্চয় বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আবার তার থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে বস্তুকণিকা। ব্যক্ত অব্যক্তের মাঝামাঝি 'হিরণ্যগর্ভ' কি—সে কথার সদুত্তর বেদান্তে রয়েছে। বস্তু বিজ্ঞানের পথ ধরে ঐ হিরণ্যগর্ভের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়।

১. লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ২৪

২. Harrow Shapley : On the Evidence of inorganic Evotution.

ঐ রাজ্যের সন্ধান পেতে হলে বেদান্তের আশ্রয় দরকার। বিজ্ঞান মানুষের কাছে বাস্তবের সন্ধান দেয় এবং ধর্ম সত্যের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। বিজ্ঞানের এই সীমায়িত রূপটিকে ডঃ শিশির কুমার মিত্র তুলে ধরেছেন একটি বক্তৃতায়--

"The Scientist has come to stage beyond which he can not proceed....Boundaries of Knowledge appear to have been reached which can not be crossed......The Situation has made the Scientist face questions which belong to the realm of mataphysics and Philosophy."[১]

স্বামীজী সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে বিজ্ঞান ও ধর্মকে সমসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন। উভয়ের মধ্যে যে একটি সূক্ষ্ম সম্পর্ক বর্তমান তা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। পরম সত্যকে উপলব্ধির সীমায় আনতে হলে এই দুইকেই গ্রহণ করে অগ্রসর হতে হবে। জড়বিজ্ঞান চিন্তাজগতের যে জায়গায় এসে স্থির হয়ে পড়েছে, আর অগ্রসর হতে পারছেনা, খেই হারিয়ে ফেলছে, ধর্মবিজ্ঞান সেই অসমাপ্ত পথের কর্ণধার হিসেবে মানুষকে বাকী পথটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে জ্ঞানের এক পরম জ্যোতির্লোকে। সুতরাং স্বামীজী পাশ্চাত্যে যে বেদান্তের শিক্ষা দিয়েছেন তা বিজ্ঞান ও ধর্মের সুসমঞ্জস মিলনভূমি,—তা মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সার্থক সম্মিলন। পাশ্চাত্যভূমিতে স্বামীজীর এই শিক্ষা যে কত সুদূরপ্রসারী এবং সমগ্র বিশ্বের ক্ষেত্রে কত প্রয়োজনীয় সে সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট বলেছেন—

'প্রতীচ্য জগৎ যে বস্তুবিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে প্রাচ্যের অতুলনীয় আত্মবিজ্ঞানের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। যদি স্বামীজীর এই সমন্বয়াদর্শকে কার্যকর করা না হয়, যদি নিছক মস্তিষ্কের উন্নতি ঘটিয়ে যাওয়া হয় এবং তার সঙ্গে একইভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটানো না হয়, তাহলে আমরা অনিবার্যভাবে এক সঙ্কট থেকে অন্য সঙ্কটের দিকে এগিয়ে যাব।'[২]

বিজ্ঞান ও বেদান্তের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা ভাগবতের মধ্যে প্রাচীন ঋষিরা স্বীকার করেছেন—

"প্রায়েণ মুনজা লোকে লোকতত্ত্ব বিচক্ষণাঃ।
সমদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশু ভাশয়াৎ ॥
আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োহসাধুনবিন্দতে ॥

১. Presidencial address at the Silver Jublee Session of Nahion hustitute of Science. Delhi, 1960 (উদ্বোধন—৭১ তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৪১০)

২. উদ্বোধন ৭০ তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৮ প্রবন্ধ ; স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বিংশ শতকের ধর্ম—ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার।

পুরুষত্বেচ মাং ধীরাঃ সাংখ্য যোগবিশারদাঃ।
আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্ব্বশক্ত্যুপবৃংহিতম্॥"[১]

—এই জগতে যে সব মানুষ নিসর্গের সত্যানুসন্ধানে পারঙ্গম, সাধারণত তাঁরা নিজেরাই নিজেদের সমস্ত অনুভবের উৎস থেকে মুক্ত করে বৃহতের দিকে উন্নীত করেন। বিশেষকরে মানুষের কাছেই তার নিজের মৌল সত্তাই তার গুরু, কারণ সে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় অভিক্ততা এবং তা থেকে জ্ঞাত অনুমান থেকেই শ্রেয় লাভ করে। জ্ঞানীগণ যাঁরা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানকে সম্যক আয়ত্ত করেছেন এবং নিজেদের জীবনে অধ্যাত্ম-কলাকে চর্যায় বিনিয়োগ করেছেন, তাঁরা এই মানবজীবনেই আমাকে লাভ করেন.....সর্বশক্তি সমন্বিত এবং পরিপূর্ণ প্রকাশিত এই আমাকে প্রাপ্ত হন। ['চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের স্বামী রঙ্গনাথানন্দের 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধ।]

পাশ্চাত্যে স্বামীজী এই ঐতিহ্যময় ভারতচেতনার বাণীই অকৃপণভাবে প্রচার করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ভারতের এই আধ্যাত্মিক বাণী, এই ধর্ম একটি উচ্চতর বিজ্ঞান ; বলেছেন 'ধর্ম বিজ্ঞান'। 'ধর্মের বিজ্ঞান' কথাটিকে জুলিয়ান হাক্সলি বলেছেন 'মানবীয় পূর্ণতার বিজ্ঞান'। একে আমরা আত্মিক উন্নতির বিজ্ঞানও বলতে পারি। কোন পথ ধরে অগ্রসর হলে মানুষ পূর্ণতা পেতে পারে—এই বিজ্ঞানে তা দেখিয়ে দেয়। স্বামীজী এ সম্পর্কে একটি বক্তৃতায় যা বলেছেন তা স্মরণযোগ্য ঃ

"..........আমরা কৃত্রিম উপায়ে বস্তুর বৃদ্ধির গতি দ্রুততর করিয়া তুলিতেছি। মানুষের উন্নতিই বা দ্রুততর করিতে পারিব না কেন? গতি হিসাবে আমরা তাহা করিতে পারি। অপর দেশে প্রচারক পাঠানো হয় কেন? কারণ এই উপায়ে অপর জাতিগুলিকে তাড়াতাড়ি উন্নত করিতে পারা যায়'। তাহা হইলে ব্যক্তির উন্নতিও কি আমরা দ্রুততর করিতে পারি না? পারি বই কি। উন্নতির দ্রুততার কোন সীমা কি নির্দেশ করা যায়? এক জীবনে মানুষ কত দূর উন্নত হইবে কেহ তাহা বলিতে পারে না। কোন মানুষ এইটুকু মাত্র উন্নত হইতে পারে, তাহার বেশি নয়, একথা বলার পিছনে কোন যুক্তি নাই। পরিবেশ অদ্ভুতভাবে তাহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিতে পারে। কাজেই পূর্ণতা লাভে পূর্ব পর্যন্ত কোন সীমা টানা যায় কি?......সম্প্রতি—এই সেদিনকার কথা—এরূপ একজন মানব (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) আসিয়াছিলেন, যিনি সমগ্র মানবজাতির জীবনের সবটুকু পথ অতিক্রম করিয়া চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিলেন। উন্নতির গতি ত্বরান্বিত করার এই কার্যটিকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বনে পরিচালিত করিতে হইবে। এই নিয়মগুলি আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি। এগুলির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারি এবং নিজ প্রয়োজনে এগুলিকে জাগাইতে পারি। এরূপ করিতে পারা মানেই উন্নত হওয়া। এই উন্নতির বেগ দ্রুততর করিয়া,

---

১. শ্রী মদ্ভাগবতম্--১১।৭।১৫—১৭

ক্ষিপ্রগতিতে নিজেকে বিকশিত করিয়া এই জীবনেই আমরা পূর্ণতা লাভ করিতে পারি। ইহাই আমাদের জীবনের উচ্চতর দিক এবং যে বিজ্ঞান সহায়ে মন ও তাঁহার শক্তির অনুশীলন করা হয়, তাঁহার যথার্থ লক্ষ্য এই পূর্ণতা লাভ।....এই বিজ্ঞান চায় তুমি সবল হও, প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া না দিয়া কাজটি তুমি নিজের হাতে তুলিয়া নও এবং এই ক্ষুদ্র জীবনের উর্দ্ধে চলিয়া যাও। ইহাই তাহার মহান উদ্দেশ্য।"[১]

পূর্বেই বলেছি, স্বামীজী বিজ্ঞানকে পরম উপলব্ধির ক্ষেত্রে একটি সোপান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবনসাধনার দিকে লক্ষ করলে দেখবো, পরম উপলব্ধির ক্ষণেই তাঁর মধ্যে বিশ্ববিজ্ঞানে চরম স্ফূর্তি ঘটেছে। তিনি গেয়ে উঠেছেন ঃ

"নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসমে ছবি বিশ্বচরাচর ॥
অস্ফুটমন—আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে,
ও সে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ ॥
সে ধারাও বন্ধ হ'ল, শূন্যে শূন্যে মিলাইল,
'অবাঙমনসোগোচরম্', বোঝে—প্রাণ বোঝে যার।"

আধুনিক বিজ্ঞান কি এই ভাবরূপকল্পের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না? স্বামীজীর এই গানে যেন মহাশূন্যে ইলেকট্রন-নিউট্রিনোদের নৃত্যদৃশ্য, পজিট্রনদের জন্মকথা বর্ণিত হয়েছে। একে Cosmic begining এবং Cosmic Ending এর প্রতিভাস বললে অত্যুক্তি হবে না।

পাশ্চাত্যে স্বামীজী ভারতবিদ্যার আর একটি বিষয়কে আগ্রহী ভক্ত শিষ্যদের কাছে নিয়মিত পরিবেশন করতেন তা হলো ভারতীয় 'যোগ'! কীভাবে যোগ সাধনার মাধ্যমে মনকে এককেন্দ্রিক করা যায়—স্বামীজী সে ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক পন্থায় শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং এই যোগ যে বিজ্ঞানের কত কাছাকাছি—তা তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। মন নিয়ন্ত্রিত না হলে কোন জ্ঞানই তা (সেকিউলার বা আধ্যাত্মিক যাই হোক না কেন হৃদয়াঙ্গম করা সম্ভব নয়। স্বামীজীর রচিত 'রাজযোগ' গ্রন্থে এর বিস্তৃত পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। ভারতীয় যোগীরা এই পদ্ধতিগুলি আবিষ্কার করেছিলেন—যার সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। মেরী লুই বার্কের লেখায় দেখি, স্বামীজীর যোগ সম্পর্কে বক্তৃতাগুলি ইনা আনসেল শর্টহ্যাণ্ড করেছিলেন। যোগ সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতাটি নর্দান ক্যালিফোরনিয়ায় দেওয়া তাঁর তৃতীয় বক্তৃতা।[১] যোগের ভিত্তি যে বিজ্ঞান সে সম্পর্কে স্বামীজী শিক্ষাদান

১. বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, ১ম সং

কালে শিক্ষার্থীদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'রাজযোগ' গ্রন্থের ভূমিকাতে স্বামীজীর সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। ভূমিকাটি অতি মূল্যবান, সেকারণে উদ্ধৃতিগুলি একটু বড় আকারের হবে। কিন্তু স্বামীজীর চিন্তায় বিজ্ঞান ও ধর্মের যে স্বরূপ প্রতিভাত হয়েছে তা জানার পক্ষে এই ভূমিকাটি অবশ্যই স্মরণীয়। সেখানে তিনি লিখেছেন ঃ "ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে মনুষ্যসমাজে বহুবিধ অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমান কালেও যে সকল সমাজ আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্ণালোকে বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সাক্ষ্যপ্রদানকারী মানুষের অভাব নাই। এইরূপ প্রমাণের অধিকাংশই বিশ্বাসের অযোগ্য, কারণ যে ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এই সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাদের অনেকেই অজ্ঞ কুসংস্কাচ্ছন্ন বা প্রতারক। অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত অলৌকিক ঘটনাগুলি অনুকরণ মাত্র। কিন্তু এগুলি কিসের অনুকরণ? যথার্থ অনুসন্ধান না করিয়া কোন কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া অকপট বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় নয়। যাহারা ভাসাভাসা বৈজ্ঞানিক, তাহারা মনোরাজ্যের নানা প্রকার অলৌকিক ব্যাপার পরম্পরা ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইয়া সেগুলির অস্তিত্বই একেবারে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে। অতএব যে সকল ব্যক্তির বিশ্বাস মেঘলোকের উর্দ্ধে কোন পুরুষবিশেষ অথবা দেবতাগণ তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন অথবা তাহাদের প্রার্থনার প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম করেন, তাহাদের অপেক্ষা পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ অধিকতর দোষী।"[২]

রাজযোগ মানবজাতিকে কী শিক্ষা দেয়, অথবা রাজযোগ থেকে মানবজাতি কী শিক্ষা লাভ করতে পারে, এই গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামীজী তার ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন ঃ "রাজযোগ ধীরভাবে অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় কুসংস্কাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণকে বলে যে, অলৌকিক ঘটনা, প্রার্থনার উত্তর, বিশ্বাসের শক্তি......এগুলি যদিও সত্য, কিন্তু মেঘের ওপারে অবস্থিত কোন দেবতা দ্বারা এ সকল ব্যাপার সংশোধিত হয়—এইরূপ কুসংস্কারপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা ঐ ঘটনাগুলি বোঝা যায় না। রাজযোগ সমগ্র মানবজাতিকে এই শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত সমুদ্র আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই এক একটি ক্ষুদ্র প্রণালী মাত্র। ইহা আরও শিক্ষা দেয়, সমস্ত অভাব ও বাসনা যেমন মানুষের অন্তরেই রহিয়াছে, তেমনি মানুষেরই ঐ অভাব মোচন করিবার শক্তিও রহিয়াছে। যখন সেখানে কোন বাসনা, অভাব বা প্রার্থনা পূর্ণ হয়, তখনই বুঝিতে হইবে এই অনন্তশক্তিভাণ্ডার হইতেই এই সব প্রার্থনা পূর্ণ হইতেছে ; কোন অলৌকিক পুরুষের দ্বারা নয়।"[৩] স্বামীজী অতিপ্রাকৃতকে স্বীকার করেন নি, তবে স্থূল ও সূক্ষ্ম—প্রকৃতির এই বিবিধ প্রকাশকে তিনি

২. 'ডিসকভারিজ' (সেকেণ্ড ভিজিট টু দ্য ওয়েস্ট), পৃঃ ৪৪৭, ১ম প্রকাশ, নভেম্বর,

১. বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২০৭

৩. বাণী ও রচনা ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২০৭—৮

স্বীকার করেছেন। বলেছেন, "অতিপ্রাকৃত বলিয়া কিছুই নাই ; তবে প্রকৃতির স্থূল ও সূক্ষ্ম বিবিধ প্রকাশ বা রূপ আছে বটে। সক্ষ্ম কারণ, স্থূল কার্য।" স্বামীজীর এই সিদ্ধান্তে আধুনিক পদার্থবিদ্যার দুটি স্তর লক্ষ করা যায়—এক. ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যা (Classical Physics), দুই. কণাবাদী পদার্থবিদ্যা (Micro Physics)। এই দুটি পদার্থবিদ্যার একটি স্থূল সম্পর্কিত, অপরটি সূক্ষ্ম সম্পর্কিত। একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অপরটি ইন্দ্রিয়ের বহির্ভূত এক ভাবরাজ্য নিয়ে কারবার।

ধর্মকে উপলব্ধি করতে গেলে, সেই পরম 'এক'-কে পেতে হলে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এগোতে হবে। স্বামীজী এই পদ্ধতিকেই যোগ বলেছেন। পাশ্চাত্যে এই যোগের বিশদ ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারিকভাবে তা শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—"আমাদের সকল জ্ঞানই অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আনুমানিক জ্ঞান, যেখানে সামান্য (general) হইতে সামান্যতর বা সামান্য হইতে বিশেষ (Particutar) জ্ঞানে উপনীত হই, তাহারও ভিত্তি—অভিজ্ঞতা.....যোগ-বিদ্যার আচার্যগণ তাই বলেন, 'ধর্ম কেবল পূর্বকালীন অনুভূতির উপর স্থাপিত নয়, পরন্তু স্বয়ং এই সকল অনুভূতিসম্পন্ন না হইলে কেহই ধার্মিক হইতে পারে না। যে বিজ্ঞানের দ্বারা এই সকল অনুভূতি হয়, তাহার নাম 'যোগ'। আত্মা অনুভূতি না করিয়া, আত্মা অথবা ঈশ্বর দর্শন না করিয়া 'ঈশ্বর আছেন' বলিবার মানুষের অধিকার আছে? যদি ঈশ্বর থাকেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে ; যদি আত্মা বলিয়া কিছু থাকে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। নতুবা বিশ্বাস না করাই ভালো।"[১]

স্বামীজী বলেছেন, রাজযোগের মাধ্যমেই সেই ঈশ্বরকে দর্শন করা সম্ভব। আন্তরিকভাবে শাস্ত্রনির্দিষ্ট রাজযোগ-প্রণালী অনুসরণ করলেই সেই পরম সত্য বা 'এক'-কে পাওয়া যাবে। সুতরাং এই সত্যকে জানাও পরীক্ষা-সাপেক্ষ। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বস্তু-বিশ্বের সত্যতা নির্ণয় করে, আর শুদ্ধ সভাব জ্ঞানীগণ একটি নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালীর অনুসরণ ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে চরমসত্যকে উপলব্ধি করে। সেদিক থেকে রাজযোগও বিজ্ঞান। তিনি বলেছেন ঃ

"রাজযোগ-বিজ্ঞানের লক্ষ্য এই সত্য লাভ করিবার প্রকৃত কার্যকর ও সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী মানব সমক্ষে স্থাপন করা। প্রথমত প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব পর্যবেক্ষণ প্রণালী আছে। তুমি যদি জ্যোতির্বিদ হইতে ইচ্ছা কর, আর বসিয়া বসিয়া কেবল 'জ্যোতিষ জ্যোতিষ' বলিয়া চিৎকার কর, কখনই তুমি জ্যোতিষশাস্ত্রে অধিকারী হইবে না। রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ। এখানেও একটি নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে। পরীক্ষাগারে (Laboratary) গিয়া বিভিন্ন দ্রব্যাদি লইতে হইবে, ঐগুলি মিশাইয়া যৌগিক পদার্থে পরিণত করিতে হইবে, পরে ঐগুলি লইয়া পরীক্ষা করিলে তবে তুমি রসায়নবিদ্ হইতে

১. বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২১১—২১৩

পারিবে। যদি তুমি জ্যোতির্বিদ্ হইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে মানমন্দির গিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে, তবে তুমি জ্যোতির্বিদ হইতে পারিবে। প্রত্যেক বিদ্যারই এক একটি নির্দিষ্ট প্রণালী থাকা উচিত। আমি তোমাদিগকে শতসহস্র উপদেশ দিতে পারি ; কিন্তু তোমরা যদি সাধনা না কর, তোমরা কখনই ধার্মিক হইতে পারিবে না ; সকল যুগে সকল দেশেই নিষ্কাম শুদ্ধস্বভাব জ্ঞানীগণ এই সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে একটি নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী লইয়া আন্তরিক সাধন করিতে বলেন। এইভাবে সাধনা করিয়া যদি আমরা এই উচ্চতর সত্য লাভ না করি, তখন আমরা বলিতে পারি এই উচ্চতর সত্য সম্বন্ধে যাহা বলা হয়, তাহা যথার্থ যয়।"[১]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি স্বামীজীর স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিবাদী মনের এক সুস্পষ্ট পরিচায়ক। বিজ্ঞান ও ধর্ম যে একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—স্বামীজী এইভাবে পাশ্চাত্যদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের সামনে বর্ণনা করেছিলেন। এমনকি জড় বিজ্ঞানও শেষ পর্যন্ত 'জড়' ছেড়ে "চৈতন্যে" রূপান্তরিত হয়, সেকথাও তিনি তাঁর বাণীতে ঘোষণা করছেন—"জড় সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের মধ্যে যে কোন একটি যথা—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষ বা প্রাণিতত্ত্ববিদ্যার কথা ধরুন, উহা বিশেষ করিয়া আলোচনা করুন। ঐ তত্ত্বানুসন্ধান ক্রমশ অগ্রসর হউক, দেখিবেন স্থূল ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থে লয় পাইতেছে, শেষে ঐগুলি এমন স্থানে আসিবে, যেখানে এই সমুদয় জড় বস্তু ছাড়িয়া একেবারে অজড়ে বা চৈতন্য যাইতেই হইবে। জ্ঞানের সকল বিভাগেই স্থূল ক্রমশ সূক্ষ্মে মিশাইয়া যায়, পদার্থবিদ্যা দর্শনে পর্যবসিত হয়।"[২]

উনিশ শতকের শেষ দশকে স্বামীজীর বাণীর কী গভীর প্রয়োজন ছিল তা আমরা আলোচনা করেছি। শুধু বিজ্ঞানধর্মী জীবনাচরণ পাশ্চাত্যের মানুষকে স্বচ্ছন্দ হয়ত দিয়েছিল, কিন্তু পারেনি শান্তি দিতে। জাগতিক সমস্ত সুখ স্বচ্ছন্দ সত্ত্বেও তাঁরা কিসের যেন অভাবে জীবনকে অর্থহীন বলে মনে করছিল। প্রয়োজন ছিল শান্তির। স্বামীজীর সেই বেদান্তের বাণী, বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলনের বাণী—তাঁদেরকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে। স্বামীজীর প্রদত্ত সেই শিক্ষা যে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তার জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বামীজী জীবিত থাকলে দেখতে পেতেন তাঁর সেই বাণীর প্রভাব কী বিপুলভাবে পাশ্চাত্য মননে ও ভাবজগতে, বিশেষ করে বিজ্ঞানজগতে পড়েছিল। সেই প্রভাবের কথা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করবো। পাশ্চাত্যে স্বামীজী 'সার্বজনীন ধর্মে'র যে স্বরূপ উদঘাটিত করেছিলেন, যা শুনে সেদেশের মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন, সমস্ত রকম ধর্মীয় কুসংস্কার ত্যাগ করে স্বামীজীর 'ক্লাসে' যোগ দিতেন, উপদেশ নিতেন, সেই সার্বজনীন ধর্মের কথা আলোচনা করে বর্তমান আলোচনা শেষ করবো।

১. বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২১৪—১৫
২. বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ—৯

স্বামীজীর চিন্তায় সার্বজনীন ধর্ম

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতবর্ষে যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল, সে জাগরণকে কেউ কেউ ইটালীর রেনেসাঁসের মতো পূর্ণ জাগরণ বলে স্বীকার না করলেও জাতীয়-জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে একটি বিপুল পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য,—এসবের ক্ষেত্রে যেমন নব নব রূপান্তর সাধিত হয়েছিল, পাশাপাশি ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রেও মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মভাবনাকে দূরে সরিয়ে রেখে সনাতন অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন ধর্মভাবনাও উদ্ভাসিত হয়েছিল। আর দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার শান্ত সমাহিত পরিবেশে ভাব-নিমগ্ন প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সেই নবীনধর্মের প্রবর্তক। পরে সমগ্র বিশ্বে গুরুর সেই ধর্মাদর্শকে বিতরণ করলেন তাঁরই উত্তর-সাধক বীরসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। স্বল্পায়ু জীবনের (১৮৬৩-১৯০২) মূল্যবান সময় সীমার মধ্যে সাড়ে তিন বছরের বেশি সময় পাশ্চাত্যে সনাসন হিন্দুধর্ম তথা গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার কর্মে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। সে-সময় হিন্দুধর্মের যথার্থ স্বরূপ পাশ্চাত্যবাসীর মনে জাগিয়ে তুলতেও সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া, তিনি তাঁদের মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, আধুনিক সর্বজনীন ধর্মের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে এবং সবর্ধমের মধ্যেই এই সর্বজনীন ভাব নিহত আছে ; ধর্মগুলির মূল অংশের দিকে তাকালেই আমরা তা দেখতে পাব। আমাদের সকলকেই ধর্মের এই মূল অংশের প্রতি নিবন্ধদৃষ্টি হতে হবে। তিনি বলেছিলেন, বেদান্ত অবলম্বন করেই সর্বধর্মের অন্তর্নিহিত মূলগত ঐক্য জগৎ অনুভব করতে পারবে এবং ধর্মের এই সর্বজনীনতারূপ অনবদ্য ভিত্তির উপর সারা পৃথিবী মিলিত হয়ে দাঁড়াতে পারবে।

স্বামীজী ধর্ম সম্বন্ধে এক অতি উচ্চাঙ্গের দৃষ্টি-পরিচয় রেখে গিয়েছেন আধুনিক যুগের বিদ্বৎসমাজের কাছে। স্বামীজীর চিন্তার সার্বজনীন ধর্মের স্বরূপ বুঝতে গেলে ধর্ম প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন জায়াগায় যা বলেছেন সেসব উক্তিগুলিকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে। তার পূর্বে 'সর্বজনীন' ও 'সর্বজনীন'—এই শব্দ দুটির তাৎপর্যও আমাদের জানতে হবে। কারণ প্রবন্ধে শিরোণামে 'সার্বজনীন' শব্দটি রয়েছে। 'সার্বজনীন' শব্দটির প্রকৃত অর্থ 'সর্বশ্রেষ্ঠ' এবং 'সার্বজনীন' শব্দটি সাধারণ বা সর্বজন—অর্থে প্রযুক্ত। অবশ্য সার্বজনীন ধর্ম বলতে সকল ধর্মের মূল বা শ্রেষ্ঠ অংশগুলিকে যেমন বোঝানো যেতে পারে, সেই সঙ্গে ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশগুলি যাকে স্বামীজী সকল দেশের সকল ধর্মের মধ্যেই লক্ষ করেছেন তা যে সর্বজনীন তাও নির্দেশ করা যেতে পারে। সুতরাং ধর্মের ক্ষেত্রে সার্বজনীন ও সর্বজনীন উভয় শব্দই গভীরভাবে অন্বিষ্ট।

ধর্ম কি? স্বামীজী বলেছেন, মানুষের অন্তরে পূর্ব হতেই নিহিত দেবত্বের বিকাশের নামই ধর্ম। "মানুষের প্রকৃতির মধ্যে একটি মহৎ সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যাহা অনবরত

বিকশিত হইতে চাহিতেছে। এই বিকাশের নামই ধর্ম।"[১] তাঁর মতে, সার্বজনীন ধর্ম হচ্ছে, মানুষের অভ্যন্তর হতে উদ্যত একটা উন্নতি যা মানুষকে ক্রমোন্নত করতে করতে এগিয়ে নিয়ে ক্রম-বিবর্তনের শেষ ধাপে পেঁছে দেয়, যেখানে পৌছে মানুষ পূর্ণত্ব সম্বন্ধে সব কল্পনার ও পরিপূর্ণ মুক্তির রূপ নিজেরই অন্তরে প্রত্যক্ষ করে। তাই প্রকৃত ধর্ম মানুষের উপলব্ধিতে, আচার-অনুষ্ঠানে নয়। এদিকে লক্ষ্য রেখেই ধর্মকে তিনি "মানবজীবনের অতি সহজ ও প্রকৃতিগত স্বভাব" বলে অভিহিত করেছেন।

স্বামীজী ধর্মকে মানুষের প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক স্বভাব বলেই শুধু অভিহিত করেননি, তিনি ধর্মকে মানবজীবনের একটি সর্বজনীন বিষয় হিসেবেও ধরেছেন। বলেছেন, "আমার বিশ্বাস—ধর্ম মানুষের এমনই মজ্জাগত যে, যতক্ষণ মানুষ দেহ ও মন ত্যাগ না করে, চিন্তা ও প্রাণের গতি নিরুদ্ধ না করে, ততক্ষণ ধর্ম ত্যাগ করিতে পারিবে না।"[২]

মানবজীবনে ধর্মের ভূমিকা স্বামীজীর মতে কি? আমরা আসলে যা, আমাদের ব্রহ্মভাব—যা আমাদের স্বরূপ, সেটি উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ কবাই ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের এই 'আমি' বোধকে ক্রমে দেহ-মন-বুদ্ধি থেকে সরিয়ে এনে নিজের আসল রূপ—শুদ্ধচেতনা, যা পরমানন্দময়, যা অবিনাশী, তা উপলব্ধি কারই ধর্ম। স্বামীজী এই কথাটি বহুভাবে ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন ঃ 'প্রত্যক্ষই ধর্ম', 'উপলব্ধিই ধম', 'আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধই ধর্ম', 'আত্মরাম হওয়াই ধর্ম' প্রভৃতি। আমাদের স্বরূপই 'পরমাত্মা', আমরা যখন এই স্বরূপ ভুলে নিজেদের মন-বুদ্ধির সঙ্গে জড়াই—হাসি-কাঁদি, চিন্তা করি, বিচার করি—তখনই আমরা জীবাত্মা। কিন্তু যখন আমরা নিজের আনন্দে নিজে বিভোর হই, আনন্দের জন্য বাইরের স্থূলবস্তুর উপর নির্ভর করি না ; আমি আনন্দস্বরূপ—এই উপলব্ধি হলেই মানুষ আত্মারাম হয়। আসলে যা সত্য—তা প্রত্যক্ষ করাই হচ্ছে ধর্ম। স্বামীজী ধর্মের এই প্রত্যক্ষতা সম্পর্কে বহুবার বলেছেন ঃ

" 'প্রত্যক্ষই ধর্ম—শাস্ত্রাদি পাঠ ধর্ম নয়। বুদ্ধিতে সায় দেওয়া ধর্ম নয়।' 'ধর্ম মতবাদ বিশেষ নয়, সাম্প্রদায়িকতা নয়।' এমন কি, সাধারণতঃ যাকে আমরা ধর্ম বলি—জপ, ধ্যান, মন্দির, মসজিদ বা গির্জায় যাওয়া, শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা, মনঃসযম, নিষ্কাম কর্ম ইত্যাদি—এবের কোনটিই ধর্ম নয়। এসব ধর্মলাভের,...সহায়ক মাত্র, 'ধর্মের গৌণ অংশ'। স্বামীজী বলেছেন ঃ যতক্ষণ না কারও সত্য উপলব্ধ হচ্ছে, প্রত্যক্ষ হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে 'ধার্মিক' বলা চলে না, বলা যায়, সে 'ধার্মিক হবার চেষ্টা করছে' মাত্র।"[৩]

আমরা সাধারণতঃ এইসব অনুষ্ঠানগুলিকেই ধর্ম বলে ভাবি, কিন্তু তা নয়। প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে অনুভূতির ব্যাপার। স্বামীজী নিঃসঙ্কোচে বলেছেন ঃ "যতদিন না ধর্ম অনুভূত

---

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১০।৯৮

২. স্বামী বিবেকান্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং ১০।৯৮

৩. চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৭৫

হইতেছে, ধর্মের কথা বৃথা।" "তীর্থে বা মন্দিরে গেলে, তিলকধারণ করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলে ধর্ম হয় না।...যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রাঙিয়া যায়, তবে আর বাহিরের রঙের আবশ্যক নাই।"[১]

স্বামীজী সার্বজনীন ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে অন্যত্র বলেছেন ঃ "ইন্দ্রিয়ের, এমন কি মনেরও সমুদয় সুখ অনিত্য ; কিন্তু আমাদের ভিতরেই সেই নিরপেক্ষ সুখ রয়েছে, যে সুখ কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না।"...সুখের জন্য বাইরের বস্তুর উপর নির্ভর না ক'রে যত ভিতরের উপর নির্ভর ক'রব—যতই আমরা 'অন্তঃসুখ, অন্তরারাম' হবো, আমরা ততই আধ্যাত্মিক হবো।"[২]

স্বামীজী ধর্মের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা করেছেন। যে অর্থে ধার্মিক হওয়া বলতে তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা বা জ্ঞান লাভ করাকে বুঝিয়েছেন ; এ অর্থে ধর্ম ও মোক্ষ সমার্থক। সাধারণতঃ আমরা ধর্মকে যে অর্থে ব্যবহার করি তা উভয়ার্থক। কোন বাঞ্ছিত ফল—ইহলোক ও পরলোকে কোন বাঞ্ছিত বস্তুলাভ বা অভ্যুদয়ের জন্য অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকেও ধর্ম বলি, আবার ইহপর লোকাতীত ভগবান লাভের জন্য অনুষ্ঠিত প্রচেষ্টাকেও ধর্ম বলি। এ-প্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্য এই ধরনের ঃ আমাদের চরম লক্ষ্য মোক্ষলাভ বা জ্ঞানলাভ বা ভগবানলাভ হলেও মীমাংসকদের অর্থে ব্যবহৃত ধর্ম চতুর্বর্গের ধর্ম, যা ক্রিয়ামূলক, যা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয় আনে, তা অধিকাংশ অধিকারীর পক্ষেই একান্ত প্রয়োজন। ক্রিয়ামূলক বলেই তা প্রয়োজন, কারণ তা তামসিকতা বা জড়ত্বকে কাটিয়ে দিতে পারে। আর এই কর্মের সঙ্গে ভগবচ্চিন্তা বা আত্মচিন্তাকে যে-কোনভাবে জড়িয়ে রাখলে তার ফল রাজসিকতাকে দমিয়ে ক্রমে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় ঘটিয়ে মানুষকে মোক্ষলাভের যথার্থ অধিকারী করে তোলে। কর্মসহায়ে তামসিকতাকে কাটিয়ে ঈশ্বরচিন্তা সহায়ে রাজসিকতার দোষ কাটিয়ে যেতে হবে। এজন্যই " 'ধর্মের' চেয়ে 'মোক্ষ'টা অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই।"[৩] স্বামীজী মানুষের ভিতরের 'অহং'টাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাজ করতে বলেছেন, ভক্তি বা জ্ঞান অবলম্বনে কাজ করতে বলেছেন, যা কর্মযোগ। যা গীতার 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম', 'মামনুস্মর যুধ্য চ' প্রভৃতি ভক্তিভাবাশ্রিত বাণীর অনুসরণ করে, অথবা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে" (৩।২৭), সব কিছু করেও "নৈব কিঞ্চিত করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ" (৫।৮)—এই জ্ঞান অবলম্বন করে কর্ম করারই নির্দেশ দিয়েছেন।

বক্ষ্যমাণ আলোচনার লক্ষণীয়, স্বামীজী কখনোই ধর্মকে জগৎ-বহির্ভূত বলে নির্দেশ

---

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৫।১৭৯

২. ঐ, ৪।২১১

৩. ঐ, ৬।১৫৩

দেননি। বলেছেন,..."ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে এক অনন্ত সত্তা রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্রপিণ্ড, যাহাকে আমরা জগৎ বলি এবং ইহার অতীত অনন্ত সত্তা—এই দুইটি বিষয়ই ধর্মের অন্তর্গত। যে ধর্ম এই উভয়ের মধ্যে কেবল একটিকে লইয়াই ব্যাপৃত, তাহা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। ধর্মকে এই উভয় বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতে হইবে।"[১] তাঁর মতে, যথার্থ ধর্মে, সর্বজনীন ধর্মে এ দুটোই থাকা চাই। কারণ সাধারণ মানুষকে স্থূল অবলম্বন করেই সূক্ষ্মকে ধারণা করতে হয়, তাছাড়া উপায় নেই। স্বামীজীর এই কর্মাশ্রয়ী ধর্মের আদর্শ তাই সর্বজনীন এবং সর্বদেশের সর্ববিধ অধিকারীরই উপযোগী। ভগিনী নিবেদিতা গুরুর এই ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। বলেছেন ঃ এ ধর্ম "জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ভেদের সীমারেখাটি মুছে দিয়েছে এবং আমাদের শিখিয়েছে গৃহস্থালি, অফিস, বিদ্যায়তন, খেতখামার, কলকারখানা—সবকিছুতে মন্দিরের, সাধুর আশ্রমের পরিবেশ নিয়ে আসতে। এ আদর্শ, যাকে 'মোক্ষ' ও 'ধর্মের' সমন্বয় বা 'মোক্ষাভিলাষী ধর্ম'ই বলব মানবজাতির প্রগতির একমাত্র পথও।"[২] বর্তমান মানবজাতির কাছে স্বামীজীর নির্দেশিত এ পথ চরম সত্য।

সার্বজনীন ধর্মের পথে যেতে হলে ত্যাগ ও বৈরাগ্যকে জীবনের সঙ্গে একীভূত করে নিতে হবে। স্বামীজী বলেছেন, ত্যাগ ছাড়া কিছু হবে না। ত্যাগেই, বৈরাগ্যেই ধর্মের সূত্রপাত এবং সেইসঙ্গে একাগ্রতা। সকল মানুষকেই সংসার ত্যাগ করতে হবে—এমন কোন কথা ধর্মের মধ্যে নেই ; কিন্তু ভোগত্যাগ, ভোগেচ্ছাত্যাগ—এ সকলের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এরই নাম সংযম। সংযম ছাড়া মন অন্তর্মুখী হয় না। একাগ্রতা আসে না। তাই ধর্মলাভের জন্য স্বামীজী বারবার নানাভাবে সংযম ও একাগ্রতা অভ্যাসের উপর জোর দিয়েছেন।

স্বামীজীর চিন্তায় সার্বজনীন ধর্ম একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পন্থায় ধর্মকে বিশ্লেষণ করায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী। তাঁর কথায়, "জ্ঞানের একমাত্র উৎস অভিজ্ঞতা। জগতে ধর্মই একমাত্র বিজ্ঞান যাহাতে নিশ্চয়তা নাই, কেন-না অভিজ্ঞতামূলক শাস্ত্রহিসাবে ইহা শিখানো হয় না। এইরূপ উচিত নয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ধর্মশিক্ষা দেন, এমন কিছু লোক সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের রহস্যবাদী (mystic) বলা হইয়া থাকে এবং প্রতি ধর্মেই এই রহস্যবাদিগণ একই ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন এবং একই সত্য প্রচার করেন। ইহাই প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞান।"[৩] আধুনিক যুগে ধর্ম কিভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে সমতা রেখে জীবনে পরিপূর্ণতা

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১।৩২৬

২. চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, সংঃ ১৬৩

৩. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১০।২৪১

আনবে, তা সর্বজনীন হয়ে উঠবে সেকথাও স্বামীজী স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন তাঁর বাণীতে ঃ

"বুদ্ধদেবের মধ্যে আমরা দেখি মহৎ সর্বজনীন হৃদয়, অনন্ত সহিষ্ণুতা ; তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য উহাকে যুক্তির প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমরা এখন চাই এই প্রখর জ্ঞানের সহিত বুদ্ধদেবের এই হৃদয়—এই অদ্ভুত প্রেম ও করুণা সম্মিলিত হউক। খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক, উহা যুক্তিলাভ হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয়, গভীর প্রেম ও করুণার যোগ থাকে। তবেই মণিকাঞ্চনযোগ হইবে, তবেই বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরকে কোলাকুলি করিবে। ইহাই ভবিষ্যতের ধর্ম হইবে।"[১]

স্বামীজীর মতে, উপরোক্ত পথই মানুষকে প্রকৃত ধর্মের পথে যেতে সাহায্য করবে। আর এই ধর্মই হবে সর্বকালের, সর্ববস্থার উপযোগী। একেই সার্বজনীন ধর্ম বলা যেতে পারে। মানুষের জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্বামীজী যেমন বলেছেন, তেমনি জীবনের উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি ধর্মকে সর্বোপরি স্থান দিয়েছেন। বলেছেন ঃ "মানব-জীবনের উদ্দেশ্য-আধ্যাত্মিক উন্নতির নিয়মগুলিকে উত্তমরূপে আয়ত্ত করা। খ্রিষ্টানরা এ-বিষয়ে হিন্দুদের নিকট হইতে শিখিতে পারে। হিন্দুরাও খ্রিষ্টানদের নিকট হইতে শিখিতে পারে। ইহাদের প্রত্যেকেরই বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে মূল্যবান অবদান রহিয়াছে।"[২]

স্বামীজীর এই সর্বজনীন ধর্মে জাগতিক লাভালভের কথা গৌণ, আত্মিক উদ্বোধনই মুখ্য—'awakening of the spirt within us'। আমরা কর্ম করে যাব কর্মের জন্যই, পুরস্কারের জন্য নয় ; ঈশ্বরকে ভালবাসব অন্তরের তাগিদে। আর এইভাবেই মানুষ ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করবে।

বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দ ঋষির দৃষ্টি নিয়েই ধর্মের এই সর্বজনীন দিকটাকে সদাসর্বদা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, জগতের ধর্মগুলি পরস্পর বিরোধী নয়, একই চিরন্তন ধর্মের বিভিন্ন দিক। একই চিরন্তন ধর্মকে অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ করা হয়েছে। সব ধর্মেরই মূল ভাবগুলির উপর থেকে বিশেষ নাম, প্রথা ও প্রভাবের আভরণগুলি খুলে ফেললে দেখা যায় তাদের ভিতর পার্থক্য আর নাই, একই চিরন্তন ধর্মের ভাব সেগুলি। স্বামীজী তাঁর মানসনেত্রে দৃষ্ট সর্বজনীন ধর্মের এই স্বরূপটি আধুনিক বিক্ষুব্ধ মানুষের দৃষ্টিপথে তুলে ধরেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সর্বজনীন ধর্মের মহিমোজ্জল রূপ ধারণায় আনতে পারলে সমস্ত ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরাই নিজ নিজ ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকেও অপরাপর ধর্মমতগুলিকে অসীম উদারতার

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ২।১০৪
২. ঐ, ৩।২৮৯

চোখে দেখতে পারবে। স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির এই উদারতা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। তিনি জানতেন, কীভাবে ধর্মবিজ্ঞানের অন্তর্গত মূল ভাব ও আদর্শগুলিকে জগতে ছড়িয়ে দিয়ে সর্বজনীন ধর্মের প্রতি সমগ্র মানবপ্রজাতির দৃষ্টিভঙ্গিকে নবারুণরঞ্জিত করা যেতে পারে। তিনি এই সর্বজনীনধর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"সেই ধর্মের নীতিতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকিবে না ; উহাতে প্রত্যেক নরনারীর দেব-স্বভাব স্বীকৃত হইবে এবং উহার সমগ্র শক্তি মনুষ্যজাতিকে দেব-স্বভাব উপলব্ধি করিতে সহয়তা করিবার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকিবে।"[১] জগৎকে সর্বজনীন ধর্মের এমন এক মহিমাময় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন তিনি যা "কোন বিশেষ স্থানে বা কালে সীমাবদ্ধ নয়, তার প্রতিপাদ্য ভগবানের মতই যা অনন্ত ; যারা সূর্য কৃষ্ণের উপাসক ও খ্রীষ্টের উপাসক, সাধু ও পাপী, সকলের ওপরেই সমভাবে কৃপাকিরণ বর্ষণ করবে ; যা ব্রাহ্মণদের ধর্মও নয়, বৌদ্ধদের ধর্মও নয়, খ্রিষ্টান বা মুসলমান ধর্মও নয় ; কিন্তু যা এসবের সমষ্টি-স্বরূপ।"

মানুষকে সর্বজনীন ধর্মকে বিশ্বাস করানোর জন্য তিনি শিষ্যত্বের ভাবনুপ্রাণিত হয়ে বলেছেন ঃ "অতীতে যত ধর্মসম্প্রদায় ছিল, আমি সবগুলিই সত্য বলিয়া মানি এবং তাহাদের সকলের সহিতই উপাসনায় যোগদান করি।...আমি মুসলমানদিগের মসজিদে যাইব, খ্রিষ্টানদিগের গীর্জায় প্রবেশ করিয়া ক্রুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে নতজানু হইব, বৌদ্ধদিগের বিহারে প্রবেশ করিায় বুদ্ধের ও তাঁহার ধর্মের শরণ লইব,...শুধু তাহাই নয়, ভবিষ্যতে যে-সকল ধর্ম আসিতে পারে তাহাদের জন্যও আমার হৃদয় উন্মুক্ত রাখিব।"[১৩]

এইভাবে স্বামীজী যুক্তি গ্রাহ্য কথায় ধর্মের মূল তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বজনীন ধর্মের মহান রূপ অতি স্পষ্টভাবে চিত্রিত করার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন সাধনায় উপলব্ধ ও তাঁর নিজ উপলব্ধিতে পুনরায় প্রত্যক্ষ করা বৈদিক ভারতের আধ্যাত্মিকতার বাণী প্রচার করেছেন।

১. ঐ, ১।২৭

২. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৩।১৩১-১২

পাশ্চাত্য ভাষায় স্বামীজীর রচনা ঃ বিষয় ও রচনা সৌকর্যের সার্থকতা

স্বামী বিবেকানন্দ শুধুমাত্র মাতৃভূমি ভারতবর্ষের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের সংকট-ত্রাতারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা, কর্ম, তাঁর জীবনাদর্শ ভারতবর্ষের মানুষ—তার সংস্কৃতি থেকে প্রলম্বিত হয়ে বিশ্বসংস্কৃতি বিশ্বজনগণের সেবার মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। 'বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় (জগদ্ধিতায়)—এই ছিল তাঁর জীবনসাধনা। ভারতীয় সংস্কৃতি তথা জীবনবোধের মূল ভিত্তি যে বেদান্ত, তাকেই নোতুনরূপে পৌঁছেদিলেন পাশ্চাত্যের মননভূমিতে। ভারতবর্ষে পরিব্রাজক অবস্থায় পায়ে হেঁটে বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ করে নানা ভাষাভাষী মানুষের মনের নিভৃত কোণে এই সুমধুর অথচ প্রাণদীপ্ত বেদান্তের অমৃতবাণী শুনিয়ে তিনি মানবপ্রেমিক বৈদান্তিক রূপে সুপরিচিত হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, তখন তিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন নি। সে সময় তিনি যে ভাষায় সে বাণী শুনিয়েছিলেন তা মূলতঃ ইংরেজি এবং কিছু কিছু জায়গায় হিন্দী এবং সংস্কৃতে। অপরদিকে ১৮৯৩, সেপ্টেম্বরের আমেরিকা বিজয় থেকে সমগ্র পৃথিবী বিজয়করা পর্যন্ত তিনি ইংরেজি ভাষাকেই ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, স্বামীজী ভারতচেতনাকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-শিক্ষিত, ভোগসর্বস্ব জড়বাদী মানুষের মনের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাঁদের চোখে দুর্বল, অসভ্য ভারতবর্ষকে, তার ধর্মাদর্শকে মহীয়ানরূপে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, সেই ভাব বা চেতনা প্রকাশের মাধ্যম ছিল ইংরেজি ভাষা। আমাদের গর্বের বিষয়, ভারতবর্ষেরই এক যুবক-সন্ন্যাসীর প্রতিভার বৈদ্যুতিকস্পর্শে পাশ্চাত্যসাহিত্য ধন্য। ধন্য এই কারণে যে, সাহিত্যভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন রসের সন্ধান পেলেন পাশ্চাত্য পৃথিবীর মানুষেরা বিবেবকানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতা, পত্রাবলি, পুরাণকাহিনী ও কবিতাবলীর মধ্য দিয়ে।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, স্বামীজী প্রদত্ত বক্তৃতা ও রচনার মধ্য দিয়ে ইংরেজি ভাষাও ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আপনার হয়ে উঠলো। সমকালীন বা পূর্বে বহুজনের লেখনী অথবা বক্তৃতার মাধ্যম ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হলেও সেসব রচনা বা বক্তৃতা আমাদের মনে সাড়া জাগাতে পারে নি। বরং একটা আত্মভিমান আমাদেরকে ঐ ভাষা সম্পর্কে অনীহা জাগিয়েছে। আমরা মধুসূদনের রচিত ইংরেজি কাব্যগ্রন্থের কথা স্মরণ করতে পারি। 'Coptive Ladie' কাব্যের বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর মধ্যে উঁচুমানের সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় থাকলেও ওই কাব্য শুধু বর্তমানে কেন, মনে হয় কোন কালেই তা ভারতীয় পাঠকের কাছে আপনার হয়ে উঠতে পারে নি। উনিশ শতকের আর এক বিখ্যাত

সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিতে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'Rajmohons wife' লেখেন। কিন্তু গ্রন্থটি সেকালে খুব একটা সমাদৃত হয় নি। কারণ সেসময় ইংরেজি ভাষা একটি বিদেশি ভাষারূপেই ভারতবাসীর কাছে গৃহীত হতো। প্রকৃতপক্ষে, উৎপত্তির দিক থেকে ইংরেজি নিঃসন্দেহে একটি বিদেশী ভাষা, কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিচার করলে ইংরেজিকে ভারতীয় মন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সাধারণত একটি ভাষা বিদেশি হোক্ বা কোন আঞ্চলিক ভাষা হোক, তা যখন সেই দেশের প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুভূতির প্রকাশের বাহক হয়, তখন সেই ভাষা সেই দেশের মানুষের কাছে একটি স্বাভাবিক ভাষা হিসেবেই গণ্য হয়। সেদিক থেকে ইংরেজি ভাষা আমাদের কাছে দেশিয় ভাষার সমগোত্রতা লাভ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় মনন ও ব্যক্তিত্ব বহুলাংশে ঐ ইংরেজি ভাষাকে অবলম্বন করেই তাঁদের সুমহান আদর্শকে প্রকাশ করেছে। যাঁদের অগ্রনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ। বিশেষ করে, ভারতচেতনাকে তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। একটি বিদেশী ভাষাকে মাধ্যম করে ভারতচেতনা প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে ভারতবর্ষ এবং পাশ্চাত্যবিশ্ব—দুই পৃথিবীর মানুষই উপকৃত হয়েছিলেন। সেইসঙ্গে ইংরেজি ভাষার গৌরবও বৃদ্ধি পেয়েছিল—"Long after the English Language has disappeared from India, the Gift that has here been made through that Language, to the world, will remain and bear its fruit in East and West alike." [C.W.I., IX]

ইংরেজি ভাষা একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। ঐ ভাষায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনা বিশ্বাবাসীর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল খুব দ্রুত ; যার ফলে বিশ্ববাসী ক্রমশ ভারতবর্ষের মানুষকে,—তাঁর সংস্কৃতি ও ধর্মকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। কী বিপুল প্রভাব পড়েছিল পাশ্চাত্য-মননে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর তার ইতিহাস পাওয়া যাবে বিবেকানন্দ-প্রাণা গবেষিকা মেরী লুই বার্কের 'Swami Vivekananda in the west : New Discoveries' নামে মহাগ্রন্থে। অপরদিকে, ইংরেজি ভাষাও সমৃদ্ধি লাভ করেছে নতুন ভাব জগতের প্রকাশ মাধ্যম হয়ে। তাছাড়া, ইংরেজি ভাষায় স্বামীজীর রচনা হওয়ায় ভারতবর্ষের চিন্তাজগৎ ও সাংস্কৃতিক জগতে ঐ ভাষা সর্বকালের জন্য নিজ স্থান পাকাপাকি করে নিয়েছে। দেশপ্রেমিক থেকে শুরু করে আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ—সকলেই স্বামীজীর ইংরেজিতে লেখা মৌলিক রচনাগুলিই পাঠ গ্রহণ করেন। গীতা-উপনিষদের মতোই তা মৌলিক গ্রন্থ-রূপে বিবেচিত হয়।

ইংরেজি ভাষায় বিবেকানন্দের রচনা মৌলিক সৃষ্টি-সুষমায় বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। তাঁর বক্তৃতা ও আলোচনাগুলি ইংরেজি সাহিত্যের সম্পদ। আর যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে তাঁর ইংরেজি ভাষায় রচিত কবিতাগুলিতে। বিবেকানন্দের কবি-সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঐ সমস্ত কবিতাগুলি। সংখ্যার দিক থেকে অতি সামান্য হলেও, ভাবের

গভীরতায় তো মন্ত্রসমান। চেতনার গভীর তলদেশ থেকে কবিতাগুলির উৎপত্তি বলেই কবিতাগুলির আবেদন চিরকালীন। আর যে সাহিত্য পাঠক-মনে চিরকালীন আবেদন রাখতে পারে, তাই-ই আধুনিক পদবাচ্য। সেদিক থেকে বিচার করলে ইংরেজি কাব্যের ইতিহাসে বিবেকানন্দের কবিতাগুলিও আধুনিক হিসেবেই চিহ্নিত হতে পারে।

বিবেকানন্দের কবিতা আধুনিক এই কারণে, যে ভাবনা বা বিষয় কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশিত, ইতিপূর্বে পাশ্চাত্য সাহিত্যে তা পরিলক্ষিত হয় নি। বরং সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের বহু ইংরেজি কবি-সাহিত্যিকের মনন তথা চেতনাপ্রদেশে বিবেকানন্দের সৃষ্টিত ভাবের প্রভাব পড়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মূল ভিত্তি ভারতীয় দর্শন, পুরাণ-সাহিত্য ও ধর্ম-ইতিহাস। ভারতচেতনার এমন সার্বিক প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আমরা ইতিপূর্বে অন্য কারও রচনায় পাই না। বিবেকানন্দের কিছু পরে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবী-দার্শনিক কবিমহলে সাড়া জাগিয়ে ছিল ঠিকই, কিন্তু সমকালে পাশ্চাত্য সমাজ-মনের সর্বস্তরে ঐ গ্রন্থের ভাবসম্পদ প্রভাব বিস্তার করেনি। বিবেকানন্দের জীবনসাধনা, বাণী ও রচনার মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতি ও সংস্কৃতির মধ্যে এক মহামিলন সংঘটিত হয়েছে। তাঁর পূর্বে মধুসূদনই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনের যোগসূত্রকারী ব্যক্তিত্ব।

দুই

সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির মধ্যে শিল্পী-ব্যক্তিত্বের প্রকাশ মহৎ সৃষ্টির লক্ষণ। স্বামীজীর ইংরেজি রচনাবলীতে তাঁর শৌর্যদৃপ্ত আত্মসমাহিত ব্যক্তিত্ব একটি বিশেষ বাগভঙ্গী বা শৈলির সৃষ্টি করেছে ; ইংরেজি সাহিত্যে তা নতুন সংযোজন। জাগতিক কল্যাণেই তিনি আত্মত্যাগিতে কলম ধরেছিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছিলেন। কোন আবেগের তাড়নায় এসব করেন নি বলেই তাঁর রচনায় যুক্তি ও বিচারের ঘনপিণদ্ধরূপ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর রচনা বা বক্তৃতা পাঠ করার সময় পাঠকমন যুক্তি-বিচারের পথ ধরে এগোতে এগোতে এমন একটি অবস্থায় এসে পৌঁছয়, যেখানে যুক্তি নয়, এক অমোঘ আকর্ষণে পাঠক আত্মদর্শন করে ; জীবন-দর্শনের রহস্য খুঁজে পাই। স্বামীজীর প্রত্যেকটি শব্দ অনুভূতির গভীর জগৎ থেকে উৎসারিত। বিষয়-সম্পদ ও পরিবেশনা—সর্বত্রই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজী তাঁর ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যসাধনার স্বরূপটি বিশ্লেষণ করেছেন এই ভাষায়—

To put the Hindu ideas into English and then make out of dry Philosophy and intricate mythology and queer, Startling Psychology, a religion which shall be easy, Simple, popular and at the Sametime meet the requirements of the highest minds, is a task which only those can understand who have attempted it. The abstract Advaita must become

living—poetic—in everyday life and out of bewildering yogism must come the most Scientific and Practical Phychology—and all this must be put into such a form that a child may grasp it. That is my life's work."

আপন ইংরেজি রচনা সম্পর্কে স্বামীজীর এই মন্তব্য সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচনা। ভারতীয় দর্শনকে কবিত্বময় করে তুলে জীবনের কাছাকাছি আনা ; যোগ শাস্ত্রগুলির বৈজ্ঞানিকভাবে উপস্থাপনা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ তিনি অতি সহজ সরল ও কবিত্বময় ভঙ্গিতে রূপায়িত করেছিলেন। বাস্তবিকই সেসব রচনা ইংরেজি সাহিত্যের সম্পদ। জ্ঞান ও ভক্তি, ধ্যান ও কর্ম, আত্মস্থ সমাধি ও বিগলিত মানবপ্রেমের যুক্তবেণীরূপে বিবেকানন্দ-রচনাবলী ক্লাসিক সাহিত্য শ্রেণীভূক্ত।

বিবেকানন্দ দেশপ্রেমিক, হিন্দুধর্মের প্রবক্তা ; কিন্তু তারও চেয়ে তাঁর বড় পরিচয়—তিনি কবির্মনীষী। সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি তাঁর আকৈশোর অনুরাগ। তাঁর মধ্যমভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথায় অগ্রজের সাহিত্যপ্রীতি সম্পর্কে যে পরিচয় আছে তা উদ্ধৃত করছি ঃ

"বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের বিদ্যাচর্চায় বিশেষ আগ্রহ ছিল। পাঠ্যাবস্থা হইতেই তিনি নানাবিধ গ্রন্থপাঠ করিয়াছিলেন। বি.এ. পরীক্ষার সময় তাহার পঠিত কোরিওলেনাস এবং মিলটন, বাইরন, হ্যামিলটন প্রভৃতির পুস্তকগুলি মঠের পুস্তকাগারে প্রদত্ত হইয়াছে। ইংরেজি কাব্যের ভিতর মিল্টন নরেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল এবং তিনি তাহা হইতে মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেন। মিল্টন আবৃত্তি পদ্ধতি তাঁহার অতি সুন্দর ছিল। গম্ভীর ও তরঙ্গায়মান শব্দে তিনি মিল্টনের শ্লোকগুলি অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতেন। সেক্স্‌পীয়রের গ্রন্থগুলির সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন.......। বাইরণ তিনি খুবই পড়িতেন এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। ইহা ব্যতীত সাধারণ ইংরেজী কাব্য তিনি প্রধান অধ্যাপকের ন্যায় পড়াইতে পারিতেন।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি বিবেকানন্দের সবিশেষ অনুরাগ ছিল। একদিকে, মিল্টন ও বাইরণের কাব্যে পেয়েছিলেন বীর রসের সন্ধান ; অপরদিকে, ওয়ার্ডওয়ার্থের কবিত্বের জগতে সন্ধান পেয়েছিলেন অতিন্দ্রীয় রস। সাহিত্যের ভাবাদর্শ সম্পর্কে বিবেকানন্দ ছিলেন খুবই আদর্শবাহী। সাহিত্য যদি যথাযথ ভাবপ্রকাশক না হয় ; —তা পাঠ করে পাঠক যদি উচ্চাঙ্গের রস গ্রহণ করতে না পারে—সেক্ষেত্রে ঐ রচনা চিরস্থায়ী মূল্য পায় না ; যুগান্তকারী হয়ে ওঠে না। স্বামীজী মনে করতেন, সাহিত্যের অভ্যন্তরে একটি বিশেষ আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। সেই আদর্শের অনুভবে পাঠক-হৃদয়ে একটি অনুরণনের সৃষ্টি হতে বাধ্য। তার প্রভাব পাঠক মনে সুদূর প্রসারী এবং ফলশ্রুতিও মঙ্গলময়।[১]

১. শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ ঃ দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ

ব্যক্তিগত জীবনসাধনায় স্বামীজী ছিলেন অতিমাত্রায় শুদ্ধাচারী। অপরদিকে সাহিত্য সাধনায়-ও তিনি ছিলেন গভীর আদর্শবাদী। সদাসদ বিচার তিনি যেমন কর্মজীবনে করেছেন, সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রেও সৎ ও অসৎ বিচার করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। জীবন-জিজ্ঞাসার সমস্ত উত্তর স্বামীজীর বাণী ও রচনার মধ্যে পাওয়া যাবে। জীবন আত্মা—ধর্ম—বিজ্ঞান, ভারতীয় ঐতিহ্য, প্রাচীন সাহিত্য থেকে শুরু করে তুলনামূলক আলোচনা, মানুষের প্রকৃতবিচার, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগের মতো গভীর বিষয়গুলোও সহজ সরল ইংরেজি ভাষায় ব্যাখা-বিশ্লেষণ করে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি জায়গায় তিনি বিভিন্ন বিষয়ে যেসব বক্তৃতা করেছিলেন সেগুলি মূলতঃ আধ্যাত্মিক-চেতনা বিষয়ক। যেমন—'Religion, its methods and purpose, The Nature of the Soul and its goal, Importance of Phychology, Nature and Man, Concentration and breathing, introduction to Jnana-Yoga, Religion and Science, Freedom of the Self, The low of life and death. The Practice of Religion, Addresses on Bhakti—Yoga, thoughts of Gita, The Great Teachers of the world, Reincarnation, Indians Religious thought প্রভৃতি। ভারতীয় আধ্যাত্মিক চেতনা উপরোক্ত বক্তৃতাগুলোর বিষয়বস্তু। আবার তুলনামূলক দর্শন ও ধর্মালোচনাও তিনি কিছু কিছু বক্তৃতায় করেছেন, যেমন—'Similarity between the Vedenta Philosophy and christanity। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য ও স্বরূপ সম্পর্কে ১৯শে জানুয়ারী, ১৮৯৬ ও ২৬শে জানুয়ারী ১৮৯৬, দুটি মূল্যবান বক্তৃতা দেন। আমরা 'পাশ্চাত্যে বিবেকবাণী ও ভারচেতনা থেকে বিশ্বচেতনা' অধ্যায়ে সেগুলির আলোচনা বিশদভাবে করবো। স্বামীজীর বক্তৃতার মূল বিষয়ই ছিল বেদান্তদর্শন। কর্মজীবনে বেদান্ত-এর প্রভাব নিয়ে পাশ্চাত্যে বহু জায়গায় মূল্যবান বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিশেষকরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা 'Vedanta Philosophy at the Harvard University'. সমকালীন পাশ্চত্যমননে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিলেন। ইংরেজি ভাষা ও দর্শনের ইতিহাসে বিবেকানন্দের এই বক্তৃতাগুলি চিরকালের সম্পদ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

স্বামীজীর বক্তৃতার ভাষা ছিল অত্যন্ত সরল ও সাধাসিধে। পোষাকি ভাষা ও জাঁকজমকপূর্ণ গুরুগম্ভীর ভাষা ব্যবহার তিনি কদাচিৎ করেছেন। গভীর অনুভূতি ও জ্ঞানের সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলিকে কী সুন্দরভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন দেখুন। ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটিতে দেওয়া একটি বক্তৃতায় জীবনের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে বলেছেন—"The object of life is to learn the laws of spiritual Progress. Christians Can learn from Hindus and Hindu can learn from Christians. Each has made a Contribution of value to the wisdom of the world." ঐ বক্তৃতায় ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন—"Ture religion comes not form the

teaching of men or the reading of Books, it is awakenigg of the spirit within us, consequent upon pure and heroic action.'[১]

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলো বিষয়বস্তুর কারণে এবং মূলতঃ পরিবেশনের গুণে অগণিত পাশ্চাত্য নর-নারীর মনোজগৎ-কে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য শত শত নর-নারী দূরদূরান্তর থেকে প্রেক্ষাগৃহে এসে হাজির হোতেন। নারী হয়েও ম্যাকলাউড কতদূর থেকে কত কষ্ট করে স্বামীজীর পদপ্রান্তে এসে পৌছেছিলেন সেকথা অনেকেই জানেন। সেখানকার নামকরা পত্রিকায় স্বামীজীর বক্তৃতার উপর দিনের পর দিন রিপোর্ট বেড়িয়েছিল। এখানে New York Critique থেকে একটি রিপোর্ট দিচ্ছি—

'But eloquent as were many of brief speeches, no one expressed as well as the spirit of the Parliament (of religions) and its limitations as the Hindu work. I copy his address in full, but I can only suggest its effect upon the audience ; for he is an orator by divine right and his strong intelligent face in its pictureqe setting of yellow and orange was hardly less interesting than these earnest words and the rich rhythmical utterance he gave them."[২]

আমেরিকার কতকগুলি বিখ্যাত পত্রিকায় স্বামীজীর অসাধারণ বাগ্মীতার প্রশংসা করে লেখা হয়েছিল। 'নিউ ইয়র্ক ক্রিটিক'-এ লিখেছিল—

'সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার অনেকগুলিই বিশেষ বাগ্মিতাপূর্ণ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসী ধর্মমহাসভার মূল নীতি ও উহার সীমাবদ্ধতা যেরূপ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, অন্য কেহই তাহা করিতে পারে নাই। তাঁহার বক্তৃতার সবটুকু আমি উদ্ধৃত করিতেছি এবং শ্রোতৃবৃন্দের উপর উহার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, দৈবশক্তিসম্পন্ন বক্তা তিনি এবং তাঁহার অকপট উক্তিসমূহ যে মধুর ভাষার মধ্য দিয়া তিনি প্রকাশ করেন, তাহা তদীয় গৈরিক বসন এবং বুদ্ধিদীপ্ত দৃঢ় মুখমণ্ডল অপেক্ষা কম আকর্ষণীয় নয়।'[৩]

'তাঁহার শিক্ষা, বাগ্মিতা এবং মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব আমাদের সম্মুখে হিন্দু সভ্যতার এক নূতন ধারা উন্মুক্ত করিয়াছে। তাঁহার প্রতিভাদৃপ্ত মুখমণ্ডল গম্ভীর ও সুললিত কণ্ঠস্বর স্বতই মানুষকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করে এবং ঐ বিধিদত্ত সম্পদসহায়ে এদেশের বহু ক্লাব ও গির্জায় প্রচারের ফলে আজ আমরা তাঁহার মতবাদের সহিত পরিচিত হইয়াছি। কোন প্রকার নোট প্রস্তুত করিয়া তিনি বক্তৃতা করেন না। কিন্তু নিজ বক্তব্য বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিয়া অপূর্ব কৌশল ও ঐকান্তিকতা সহকারে তিনি মীমাংসায়

১. Swami Vivekananda's works, Vol—IV page—186 Mayabati Memorial Edition, 1921

২. Leters of Swami Vivekananda, P. 58

৩. পত্রাবলী (৭ম), পৃঃ ৩২

উপনীত হন এবং অন্তরের গভীর প্রেরণা তাঁহার বাগ্মীতাকে অপূর্বভাবে সার্থক করিয়া তোলে।[১]

সেখানকার বিখ্যাত প্রত্রিকা 'হের‍্যাল্ড'এ লিখেছিল—

"Vcvakananda is undoubtedly thc grcatest figurc in the Parliament of Rcligions. After hearing him, we fcel how foolish it is to send missionarics to this lcarned nation.."

দেশ বিদেশের সংবাদ পত্রের বিবরণে তাঁর বক্তৃতার ভাষার ভুরি ভুরি প্রশংসা প্রকাশিত হতে লাগলো। বক্তৃতার অবয়ব গঠিত হয় ভাষার মাধ্যমে। বক্তব্য বিষয়ানুযায়ী বক্তৃতার ভাষা কখন অলংকার পূর্ণ, কখনও বা সহজ অনাবিল হবে। বিবেকানন্দের ভাষা এ দুয়ের মিশ্রণে। ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস যে বিষয়েই তিনি পাশ্চাত্যদেশের অগণিত শ্রোতার সামনে বক্তৃতা দিতেন, ভাষার গুণে তা শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করতো। বিশিষ্ট বিবেকানন্দ-গবেষক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুও এই ভাষার দিকটিতে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন।—

"বিবেকানন্দের বাগ্মীতার যে সমুচ্চ-প্রশংসা অবিরাম করা হচ্ছিল—তার এক প্রধান অংশে ছিল ভাষার প্রশংসা—কারণ বাগ্মীতার সঙ্গে ভাষা, বাচনভঙ্গী, কণ্ঠস্বর, চেহারা, ব্যক্তিত্ব, সমস্ত কিছু জড়িত হলেও, ভাষাশক্তিই সাফল্যের প্রথম শর্ত, কারণ তাছাড়া শ্রোতৃবৃন্দের মন ও হৃদয়ে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। যখন বলা হয়েছে—তিনি 'দিব্যার্ধিকার প্রাপ্ত বাগ্মী' কিংবা তাঁর ভাষণ 'মানবভাবণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শিখর'—তখন তাঁর অসাধারণ ভাষার স্বীকৃতিও ওরই মধ্যে আছে।"[২]

বিবেকানন্দের বক্তৃতাসমূহ পাঠান্তে এই মন্তব্য যুক্তিযুক্তি হবে যে, তাঁর বক্তৃতার ভাষা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্লেষণ,—এর সঙ্গে অলংকারময় ভাষার ব্যবহারে তাঁর বক্তব্যের যে-কোন বিষয়ই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। সমকালীন সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে তাঁর প্রশংসাপূর্ণ কিছু বর্ণনা দিচ্ছি। আমেরিকার 'প্রেস' পত্রিকার সংবাদ (মিরার ; ১৮৯৩, ৩০ নভেম্বর) ঃ "এই বৃহৎ সমাবেশের কাছে সবচেয়ে আকর্ষক ব্যক্তিত্বের অন্যতম হলেন হিন্দু-তাত্ত্বিক এবং বিরাট পণ্ডিত অধ্যাপক স্বামী বিবেকানন্দ।........মানুষটির বাগ্মিতা, তাঁর পীতাভ মুখে মাখা মনস্বিতার দীপ্তি, তাঁর কাল—সম্মানিত ধর্মমতের সৌন্দর্য-উন্মোচনের অনবদ্য ইংরেজি ভাষা—সবকিছু সম্মিলিত হয়ে শ্রোতাদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করলো।"

নিউইয়র্ক ক্রিটিক (মিরার ; ১৮৯৩, ২৭ শে ডিসেম্বর) ঃ "বিবেকানন্দের সংস্কৃতি, বাগ্মিতা, মোহকর ব্যক্তিত্ব হিন্দুসভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের নতুন চেতনা দিয়েছে।........বক্তৃতার

---

১. Lcters of Swami Vivekananda—P—59

২. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (প্রথম খণ্ড)—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পৃঃ ১৭২

সময়ে তিনি কোন নোট রাখতেন না ; সর্বোত্তম শিল্পকৌশলের সঙ্গে নিজ বক্তব্যকে উপস্থিত করেন ও সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান।'

বে সিটি ট্রিবিউন (মিরার ; ১৮৯৪, ১৭ই আগষ্ট) ঃ "গতকাল বে সিটিতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি বহুকথিত হিন্দু স্বামী বিবেকানন্দ, সেনেটার পামারের অতিথি।........তাঁর কণ্ঠস্বর কোমল এবং সুনিয়মিত ; ইংরেজি বলেন অদ্ভুত ভালো। বস্তুতপক্ষে অধিকাংশ আমেরিকানের চেয়ে ভালো তাঁর ইংরেজি।"

ব্রুকলিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড (হিন্দু ; ১৮৯৫, ২৩শে জানুয়ারী) ঃ তাঁর বৈদগ্ধ ও পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা ও সরল বাক্‌পটুতা, পবিত্রতা, ঐকান্তিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার কথাও তাঁরা জেনেছিলেন।

"প্রায় নিখুঁত ইংরেজিতে শোনালেন প্রেম সহানুভূতি আর সহিষ্ণুতার বাণী—, তখন মনে হয়েছিল তিনি সত্যই হিমালয়ের বিখ্যাত ঋষিগণের এক অপূর্ব নমুনা, সত্যই নবধর্মের প্রফেট, যিনি সম্মিলিত করেছেন খ্রিষ্টিয়-নৈতিকতার সঙ্গে বৌদ্ধদের দর্শনকে।"

নিউইয়র্ক হেরাল্ড (মাদ্রাজ মেল ; ১৮৯৬, ১২ই মার্চ) ঃ "স্বামী বিবেকানন্দ বিশুদ্ধ রক্ত হিন্দু ; বছর তেত্রিশ আগে বাংলা প্রদেশে জন্ম ; শিক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে তিনি ইংরেজি ভাষা অনর্গল বলতে শিখেছেন।"[১]

স্বামীজীর ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে আমেরিকা এবং এমনকি ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উচ্চকিত প্রশংসা করা হয়েছিল। আমরা এখানে যেসব উল্লেখ করছি না। জিজ্ঞাসু পাঠক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষে' সেসব বিবরণ পেয়ে যাবেন।

বিবেকানন্দের বক্তৃতার মধ্যে পাশ্চাত্য মানুষ পেয়েছিলেন বিশ্বভ্রাতৃত্বের সন্ধান। তিনি বলেছেন, এই বিশ্বে নানা জাতির বাস,—তাদের আচার আচরণ, ভাব-ভঙ্গী-তাষা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের ; এক কথায় বিচিত্র। কিন্তু একটা জায়গায় সকলের মধ্যে গভীর মিল বা নৈকট্য রয়েছে, তা হলো আত্মা। এক মানবত্মার সঙ্গে আর এক মানবাত্মার ঘনিষ্টতা ধর্মের কারণেই। প্রকৃতধর্ম আত্মায় আত্মায় মিলন ঘটায়। আবার ধর্মই আত্মার প্রকাশ ঘটেছে। 'ইউনিটারিয়ান চার্চে' Similarity between The Vedanta Philosophy and Christianity' নামে একটি বক্তৃতা স্বামীজী দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতার একটি জায়গায় তিনি বলেছেন —ঃ

'Religion is fundamental in the very soul of humanity—and as all life is the evolution of that which is within,—it of necessity expresses itself through various peoples and nations.

The language of the Soul is one, the language of nations are many. Thier customs and methods of life are widely defffernt. Religion is of

১. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (১ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ,

the soul and finds expression through various nations, languages and custom. Hence it follows that the difference between the religions of the world is one of the expression and not of substance ;and their points of similarity and unity are of the soul, arc imtrinsic, as the language of the Soul is one, in what ever peoples and under whatever circumstances it manifests itself."[১]

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতধর্মকেই বিশ্বজনীন করে তুলেছেল। 'জগদ্ধিতায়' তিনি এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেকারণে ভারতচেতনাকে উপলব্ধি করে এবং গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনায় তাকে পরিপূর্ণরূপে লক্ষ করে এবং নিজ জীবনসাধনায় তাকে আত্মস্থ করে গুরুর নিদের্শিত পথেই জগতের মানুষকে হাঁটবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 'নরেন শিক্ষে দেবে'—পরমহংসের এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে সার্থকতা লাভ করেছিল। সেকথা আজ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মজয়ন্তীর ১৫০ বছর পরেও কী গভীর ভাবেই না এ প্রজন্মের মানুষ উপলব্ধি করছে।

২

লেটারস্ অব বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতায় তাঁকে পাচ্ছি ভারতাত্মার জীবন্ত প্রতিমূর্তিরূপে, অপরদিকে তাঁর পত্রাবলি (ইংরেজী ও বাংলা) তাঁকে উদ্ঘাটিত করেছে একজন সংগ্রামী মানুষ হিসাবে। শুধু তাই নয়, অন্তরঙ্গ স্বামীজীকে জানতে গেলেও তাঁর পত্রাবলির আশ্রয় নিতে হবে। একথা ঠিক, পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ই ঘনান্ধকার রহস্যময় জগৎ থেকে উদ্ঘাটিত হয় তাঁদের পত্রাবলির মারফৎ। এদিক থেকে চার্চিল, কীট্‌স্, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীদের ব্যক্তিগত জীবন ও সাধনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁদের পত্রাবলিতে। গবেষকদের কাছে তাঁদের পত্রাবলি তাঁদের জীবনী রচনার সময় বিশেষ সামগ্রীরূপে গৃহীত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি পত্রসাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। পত্রলেখকদের ব্যত্তিত্ব সে পত্রকে কী জীবন্ত ব্যক্তিত্বে ভাস্বর করে তোলে, তার আশ্চর্য উদাহরণ স্বামীজীর পত্রাবলি। তাঁর সাধনা, উপলব্ধি ও মানসিকতার সঠিক পরিচয় লাভের জন্য এই পত্রগুলি অমূল্য পাথেয়। সেইসঙ্গে বিবেকানন্দের সাহিত্যপ্রতিভার অভ্রান্ত স্বাক্ষর। সচেতন সাহিত্যের শিল্প-নৈপুণ্য এসব পত্রগুলির মধ্যে মিলবে না ঠিকই, কিন্তু অন্তরঙ্গ মানুষ বিবেকানন্দকে জানার পক্ষে এই পত্রাগুলি বিশেষ দলিল। আপন অন্তরের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে এইসব পত্রগুলিতে। আবার নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদেও বহু চিঠি স্বামীজী লিখেছিলেন। তবুও সব ধরনের চিঠিই লেখনীর গুণে আপনি সাহিত্য হয়ে উঠেছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় স্বামীজীর ইংরেজি পত্রাবলি।

---

১. The complete works of Swami Vivekananda, Mayavoti Memorial Edition Part VI. Page 44

স্বামী বিবেকানন্দের ঐ সব পত্রাবলি ইংরেজি পত্রাবলির ইতিহাসের এক বিশেষ সংযোজন। বক্তব্য এবং ভাষা—উভয় দিক থেকেই এগুলি ইংরেজি সাহিত্যের সম্পদ। তাঁর গদ্যশৈলি ওজোগুণ সম্পন্ন এবং একেবারে মুখের ভাষার মতোই দ্রুত চলনে তার কৃতিত্ব। ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত গতিশীলতাই পত্রগুলির বক্তব্য ও ভাষার মধ্যে অনুরণিত হয়ে থাকে। জগৎ ও জীবনের নানা দিক বৈদান্তিক ঋষির মত তিনি এসব চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন। একটি ছোট শব্দ, কিন্তু তার বিস্ফোরণের ক্ষমতা অসীম, প্রেম তথা বিশ্বপ্রেম এই পত্রগুলির অন্তর্নিহিত আর্তি। এইসব পত্র পাঠান্তে একটি কথাই মনে হয়, স্বামীজী 'জগদ্ধিতায়' এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মানুষের সেবা, সর্ব মানবের প্রতি অপরিমেয় প্রেম—এইসব পত্রাবলির ভাষার মধ্যে ব্যক্ত। একদিকে অগাধ আত্মবিশ্বাস আর একদিকে সুগভীর মানবপ্রীতি—এই দুই সম্পদে তাঁর পত্রাবলির ভাষা সমুজ্জ্বল। পত্রগুলির মধ্যে স্বামীজীর বৈদান্তিক ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানা মুহূর্তের ছবি এগুলির মধ্যে ভাস্বর যা অনায়াসে আমাদের মনের কোণে স্থান করে নেয়। শুধু তাই নয়, পত্রাবলির মধ্যে সমকালীন বিশ্বের, বিশেষকরে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক চেহারা, ভারতবর্ষের মানুষের দুর্দশা, তার সঙ্গে সম্পর্কিত নানা মানুষের চিত্র চরিত্র, তাঁর কঠোর জীবনসাধনার পরিচয়, মঠ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও তার তৎকালীন অবস্থা, বিশেষকরে পাশ্চাত্যে ভারতচেতনার প্রচার ও প্রসারের নানা বিচিত্র ঘটনা ঐ সব পত্রাবলির মধ্যে উদ্ঘাটিত হতে পারে। চিঠিপত্রের মাধ্যমেও তিনি বহু অনুরাগী ভক্ত ও শিষ্যকে ধর্ম বিষয়ে, চরিত্র গঠন সম্পর্কে শিক্ষাও দিয়েছেন। কপর্দকহীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী-সম্রাটে পরিণত হওয়া পর্যন্ত—সমস্ত ইতিহাস এই পত্রাবলির মধ্যে উদ্ঘাটিত হতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্বিষ্ট। কুসংস্কার ও স্থবিরতার অন্ধকারময় জগৎ থেকে স্বামীজী চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের মানুষকে উদ্ধার করতে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মীয় আদর্শকে তিনি নোতুন ভাবে রোপণ করতে চেয়েছিলেন তাঁর স্বদেশ ভারতবর্ষের মনন-ভূমিতে। ভারতের মানুষকে ঘোর তন্দ্রা থেকে জাগানোর জন্যই তিনি জীবন-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সে কাজ ছিল পাহাড়-প্রমাণ। স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা ছিল কঠিন কাজ। আর তিনি তো মানুষ! কিন্তু তিনি বীজ বপন করেছিলেন ; শস্য উৎপাদনও বেশ কিছুটা পরিমাণে দেখে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নয়ণের জন্য কী কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন চিঠিগুলির ভাষায় তা ব্যক্ত। ভারতসংস্কৃতির অচল স্থবির যন্ত্রকে তিনি সচল করতে সমর্থ হয়েছিলন। আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস—এ দুই বস্তু তাঁর স্বদেশের মানুষেরা হারিয়ে ফেলেছিল। স্বামীজী স্থির করে নিয়েছিলেন, তাঁর জীবন-সাধনায় হবে ঐসব মানুষের ভিতর আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তাঁদের আত্মসম্মানকে ফিরিয়ে আনা। তিনি মাঝে মাঝেই তাঁর ঐ উদ্দেশ্যের কথা বলতেন।

কীভাবে স্বামীজী তা সম্পন করতে পেরেছিলেন তার ইতিহাস এই সব পত্রাবলির মধ্যে প্রকাশিত। তাঁর উদ্দেশ্য যে বাস্তবায়িত হয়েছে বা এখনও হচ্ছে ও হবে—সেকথা কেউই আর অস্বীকার করতে পারবে না। একথা ঠিক, এখনও স্বামীজীর অনেক উদ্দেশ্যই পরিপূর্ণ হয়নি। তাঁর পত্রাবলি বর্তমান যুবসমাজের কাজে পথ নির্দেশকের কাজ করতে পারে। কীভাবে কোন পথে অগ্রসর হলে স্বামীজীর সেসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে—পত্রগুলি যা নির্দেশ দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দ শুধুমাত্র দেশপ্রেমিকই ছিলেন না ; প্রাথমিকভাবে তিনি ছিলেন ঋষি ভাবীদর্শী, পরে তিনি দেশপ্রেমিক। প্রেমিক হিসেবে, গুরু হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে তিনি বন্ধুজনের বহু গুরুভার সমস্যার সমাধান করে দিতেন, যার প্রমাণ ঐ সব চিঠিপত্রে। যাঁদের সঙ্গে তাঁর পত্রে আলাপ হতো তাঁরা কী ধন্য তা ভেবে অবাক হতে হয়! কী বৈদ্যুতিক প্রভাব পড়েছিল সেসব মানুষদের জীবনে যাঁরা স্বামীজীর ঐ স্বল্প পরিসরের চিঠি উপহার হিসাবে পেয়েছিলেন। মানুষের জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে ঐসব চিঠিপত্র। এখনও এসব চিঠিপত্রে ভাষার প্রাণস্পন্দন অনুভূতি হয়। মন্ত্রের গভীর শান্তি এনে দেয় তাঁর চিঠিপত্রের আদেশ ও উপদেশ।

স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী পত্রাবলি মায়াবতী থেকে ১৯৪০ সালের ১লা জানুয়ারী প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের সভাপতি। ১৮৮৮ সালের ১৯শে নভেম্বর থেকে ১৯০২ সালের ১৪ই জুন পর্যন্ত যেসব চিঠি তিনি লিখেছিলেন বলাবাহুল্য সেগুলির বেশির ভাগই ইংরেজিতে সেগুলি ঐ সংকলনে ক্রমানুযায়ী প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দিকে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা চিঠিই বেশি। ১৪ খানি চিঠির মধ্যে দু তিনটি মাস্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, স্বামী অখণ্ডনন্দ এবং বলরাম বসুকে লেখা। এগুলি বাংলা থেকে ইংরেজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। মূলের একেবারে কাছাকাছি রূপান্তর বলে এগুলিকে স্বামীজীর ইংরেজি চিঠিরই অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের লেখা এইসব চিঠিগুলিতে স্বামীজী সবসময়ই সংযত ও প্রগাঢ়। তবে কোন কোন জায়গায় তাঁর মানসপরিমণ্ডলের ব্যথা-বেদনাও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মূলতঃ ধর্মসাধনা ও শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গই ঐসব চিঠিগুলিকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। সাধনার সূক্ষ্মজগতে অগ্রসর হওয়ার কালে কী গভীরভাবে শ্রদ্ধেয় প্রমদাদাস মিত্রের সাহায্য পেয়েছিলেন তার স্বীকৃতি মেলে স্বামীজীর তাঁকে লেখা ৪ঠা জুলাই ১৮৮৩ এ লেখা একটি চিঠিতে। লিখেছেন— "I am indebted to you for the advice which comes from you as the outcome for your experience and spiritural practice." ঠিক এর দু'এক লাইন আগে লিখেছেন—"My heart felt Charmed enough to accept you as a near relative and friend in spiritual life !"

স্বামীজী যাঁকে আধ্যাত্মিক জীবনের সহয়াক বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁকে মনের

একান্ত ইচ্ছার কথা বলতে বাধা কোথায়? নিজে সন্ন্যাসী হলেও মা ভাইদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা সম্পর্কে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। তাঁদের কথা প্রমদাদাসকে লিখেছেন ঐ চিঠিতেই। পিতার মৃত্যুর পর তাঁদের সংসার আর্থিক অসংগতির মধ্য দিয়ে চলছিল। এমনকি কখনো কখনো অনাহারেও দিন কাটাতে হয়েছে। তাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে আত্মীয়স্বজনেরা পৈত্রিক বাড়ি থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে। ঠিক ঐ সময় কলকাতার নিকটে থেকে স্বামীজী এসব ব্যাপার দেখে শুনে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর মন বিদ্রোহ ঘোষণা করতো। স্বামীজীর মনের ঐ কালীন অবস্থাকে আমরা এই চিঠিতে পাচ্ছি। ১৮৮৯-এর দিকে স্বামীজীর মনের বৈরাগ্যের অভ্যন্তরে ব্যথা বেদনার আগুন যে ধিকিধিকি জ্বলছিল তার খবর আমরাও পেয়ে থাকি ঐ চিঠির মাধ্যমে। দুই ভাই-এর তখন নেহাতই অল্প বয়স। পড়াশোনা করছে। "In Calcutta live my mother and two brothers. I am eldest ; the second in preparing for the first Arts Examinations and the third is young.

They were quite well off before, but since my father's death, it is going very hard with them—they even have to go fasting at times ! To crown all, some relatives, taking advantage of their helplessness, drove them away from the ancestral residence. Though a part of it is recovered through seeing at the High Court, destitution is now upon them—a matter of course in litigation.

Living near calcutta I have to witness their adversity and the quality of Rajas prevailing, my egotism sometimes develop in to the form of a desire that rises to plunge me into action, in such moments, a firce, fighting ensues in my mind and so I wrote that the state of my mind was terrible."[১]

১৮৮৯ এর দিকে স্বামীজীর মনের বৈরাগ্যের অভ্যন্তরে ধিকিধিকি ভাবে ব্যথা-বেদনার আগুন জ্বলছিলো, তার স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে উপরোক্ত পত্রে।

ভারতীয় হিন্দু-মন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান স্বামীজীর ছিল। তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি দিয়ে তিনি হিন্দু মানসিকতাকে বিচার করেছেন। আর্য-সভ্যতার চরম বিকাশ একদিন লক্ষ করা গিয়েছিল ঋষিমুনিদের মধ্য দিয়ে এই তপোময় ভারতবর্ষে। ক্রমশ কালেরযাত্রায় পুরোহিত কূলের হাতে কীভাবে সেই বিকাশ থেমে গিয়েছিল ; তার পিছনে কারণই বা কী—এসব স্বামীজী ভারতবর্ষের সামাজিক মানুষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করেছিলেন। এসব সম্পর্কে ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর বোম্বে থেকে খেতরীর পণ্ডিত শঙ্করলালকে লিখেছেন—"The Hindu mind was ever deductive and never synthetic or inductive. In all our philosophies, we always find hair-

---

১. Letters of Swami Veivekananda

splitting arguments, taking for granted some general proposition, but the propsoition itself may be as childish as possible. Nobody ever asked or searched the truth of these general propositions. Therefore,. independent thought we have almost none to speak of and hence the dearth of those sciences which are the results of observation and generalization. And why was it thus ? From two causes the tremendous heat of the climate forcing us to love rest and cotempation better than activity and the Brahmins as priests never undertaking journeys or voyages to distant lands. There were Voyagers and people who travelled for ; but they were almost always traders, i.e. people from whom priestcraft and their own sole love for gain had taken away all capacity for intellectual development. So this observatons instead of adding to the store of human knowledge rather degenerated it. For, their observations were bad and their accounts exaggerated and tortured into fantastical shapes until they passed all recognition."[১]

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের সমাজের অবক্ষয়কে লক্ষ করেছিলেন তাঁর স্বভাবসুলভ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে। তিনি এই সমাজকে পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। সেকারণে তাঁর মনে বিদেশ ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। বিদেশ গিয়ে তিনি জানতে চেয়েছিলেন কীভাবে সেইদেশে সমাজযন্ত্র গড়াচ্ছে। ঐ একই চিঠিতে পণ্ডিত শঙ্করলালকে লিখেছেন— "So you see, we must travel, we must go to foreign parts. We must see how the engine of the society works in other countries and keep free and open communication with what is going on in the minds of other nations, if we really want to be a nation again."

ব্যক্তিগত চিঠি রচনার প্রসাদগুণে সাহিত্য-মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। পৃথিবীর বহু মনীষীর ব্যক্তিগত চিঠি এ গুণে আজও বহু পাঠকের মন অনুরঞ্জিত করে। যাঁরা এসব চিঠি লিখেছেন তাঁদের কেউ সংস্কারক, কেউ শিল্পী, কেউবা ধর্মগুরু আবার কেউবা রাষ্ট্রনায়ক। মহাত্মা গান্ধী বা শ্রীঅরবিন্দুর আত্মজীবনী বা অন্যানা চিঠি পত্রের মধ্যে ওঁদের সাহিত্য-মননের পরিচয় ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চিঠিও (রাশিয়ার চিঠি, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র প্রভৃতি) ঐ সাহিত্য গুণে বিশ্বগত। স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি ইংরেজী ও বাংলা পত্র সাহিত্যে নিঃসন্দেহে আদর্শস্থানীয়। সেগুলি একই সঙ্গে শিক্ষামূলক ও সুখপাঠ্য। কাব্যিক সুষমা ও দার্শনিক সূক্ষ্মতায় পত্রগুলি ক্লাসিক সাহিত্যের মর্মাদায় ভূষিত হতে পারে। ২৩শে মে, ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের বোম্বাই থেকে ডি. আর. বালাজীকে লেখা একটি পত্রে স্বামীজী জীবনের অস্তিত্বের পশ্চাতে চাবিকাঠি কী সেকথা দার্শনিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন।

১. Letters of Swami Vivekananda—15 নং

লিখেছেন—"Naked came out of my nother's womb and naked shall I return there ; the Lord gave and the Lord hath taken away, blesssed be the name of the Lord."

Thus said the old Jewish saint when suffering the gretest calamities that could be fall man and he essed not. Here in lies the whole secret of Existence. Waves may roll over the surface and tempest rage, but deep down there is the stratum of infinite calmness, infinite peace and infinite bliss. "Blessed are they that mourn, for they shall be comforted." And Why ? Because it is during there moments of visitations when the heart is wrung by hands which never stop for the fathers cries or the mother's wail, when under the loud of sorrow, dejection and despair the world seems to be cut off from under our feet and when the whole horizon seems to be nothing but an impenetrable sheet of misery and utter despair...that the internal eyes open, light flashes all on a sudden, the dream vanishes and intuitively we come face to face with the grandest mystery in nature—Existence."[১]

স্বামীজী পাশ্চাত্য পাড়ি দিয়েছিলেন পেনিনসুলার জাহাজে করে। দেশকে অতিক্রম করে অবশেষে পৌঁছেছেন আমেরিকায়। যাত্রাকালে জাহাজ থেকে নেমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বহু বিচিত্র দেশকে দেখেছেন। সেসব দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সামাজিক দিকগুলিকে তিনি দেখিয়েছেন অতি নিষ্ঠার সঙ্গে। তার পরিচয় আছে একটি পত্রে। পত্রখানি লিখেছেন ১০ই জুলাই, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রধানতঃ যাঁদের সহযোগিতায় তিনি চিকাগোর ধর্মসভায় যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, যাত্রাকালে তাঁদের উদ্দেশ্যেই এই চিঠি। আলাসিঙ্গা, বালাজী, জি. জি. এবং অন্যান্য মাদ্রাজী বন্ধুদের তিনি এ চিঠি দিয়েছিলেন। পত্রখানির সাহিত্যমূল্য এবং ঐতিহাসিক মুল্য যেমন অপরিসীম, অপরদিকে তৎকালীন মালয়, চীন, জাপান, হংকং প্রভৃতি দেশের জীবনযাত্রা আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি প্রভৃতির অপূর্ব-বিশ্লেষণ আমাদের মনে বিস্ময় জাগায়। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-হিসেবেও এই পত্রখানি বিবেচ্য হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'র স্বাদ অনেকটাই এ চিঠিতে মেলে। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'র বহুপূর্বে লেখা হয়েছে এই পত্রখানি।[২] সহজ ও স্বাভাবিক বর্ণনা স্বামীজীর ঐ পত্রখানিকে ইংরেজি পত্রসাহিত্যের মহামুল্য সম্পদ করে তুলেছে। তাঁর লেখনীর মুন্সিয়ানায় যে কোন দেশের চালচিত্র সজীব ও জীবন্ত হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে। হংকং-এর বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—"Hong Kong next. you feel that you have reached China, the Chinese element predominates so

---

১. Letters of Swami Vivekananda, page 32, 18 নং পত্র

২. Letters of Swami Vivekananda, page 32 ১নং পত্র, পৃঃ ৩৪

much. All labour. all trade seemed to be in their hands. And Hong Kong is real China. As soon as the steamer casts anchor, you are besieged with hundreds of Chinese boats to carry you to the land. Thess boats with two helms are rather peculiar. The boatman lives in the boat with his family. Almost always, the wife is at the helms, managing one with her hands and the other with one of her feet....The Chinise child is quite a Pholosopher and calmly goes to work to an age when your Indian boy can hardly crowl on all fours. He has learnt the philosophy of necessity too well. Their extreme poverty is one of the causes why the Chinese and the Indians have remained in a state of mummified civilization. To an ordinary Hindu or Chinese, everyday necessity is too hideous to allow him to think of anything else."[১]

বলা বাহুল্য এই পত্রখানিতে প্রতিফলিত হয়েছে স্বামীজীর সমাজবিজ্ঞান চিন্তা। 'পেনিনসুলার' জাহাজ যেসব দেশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল স্বামীজী সেসব দেশের জনজীবনের খুঁটিনাটি দৈনন্দিন জীবনাচার প্রভৃতি লক্ষ করে তাঁর স্বদেশের জীবনাচারের সঙ্গে মূলতঃ বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন—উপরোক্ত চিঠিতে তার সাবলীল কবিত্বময় প্রকাশ ঘটেছে। পত্রখানি সুদীর্ঘ। এই পত্রটির শেষ দিকে স্বদেশপ্রেমিক বিবেকানন্দের নোতুন ভারত গড়ার স্বপ্নের প্রকাশ ঘটেছে। ভারতবর্ষ প্রব্রজ্যাকালে তিনি স্বদেশের দেখেছেন কঙ্কাল-সার চেহারা। মধ্যযুগীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া প্রাচীন আর্য-সংস্কৃতির রুগ্ন ক্ষয়িষ্ণু চেহারা দেখে তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। ভারতবর্ষের মানুষকে স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে বলেছেন—

Come, be men ! Kick out the priests who are always aginst progress, because they would never mind, thier heart would never become big. They are the offspring of centuries of superstition and tyranny. Root out priest craft first. Come, be men ! come out of your narrow holes and have a look abroad. See how nations are on the march ! Do you love man ? Do you love your country ? Thus come, let us struggle for higher and better things, look not back, no, not even if you see the dearest and nearest cry. Look, not bock, but forward ![২]

মাতৃভূমির পুনর্গঠনে স্বামীজীর এই আহ্বান স্মরণ করিয়ে দেয় সেই মহামন্ত্রকে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবেধত'। ভারতবর্ষের মানুয়ের জন্য চিন্তায় তাঁর প্রাণ গভীরভাবে আচ্ছন্ন ছিল। স্বদেশের কল্যাণ ছিল তাঁর জীবনের পরম ব্রত। লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীর জন্যে তাঁর প্রাণ অনুক্ষণ কাঁদতো। পাশ্চাত্যে থাকাকালীন তাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ দেখে তিনি

---

১. Letters of Swami Vivekananda, 19 নং. পত্র। পৃঃ—৩৪

২. Lettes of Swami Vivekananda, page 37

স্বদেশবাসীর করুণ অবস্থার জন্য বিষাদক্লিষ্ট হয়ে থাকতেন। উপরোক্ত চিঠিতে স্বামীজীর সেই মানসিক অবস্থার কথা ব্যক্ত হয়েছে। পরবর্তী চিঠি ২০শে আগষ্ট, ১৮৯৩-এ লেখা। আলাসিঙ্গাকে, মাসাচুসেট থেকে লিখেছেন ভারতবর্ষের ঐ দুঃখ পীড়িত মানুষের কথা। স্বামীজীর পাশ্চাত্যে গমন সে তাদেরই জন্য সেকথা তিনি উল্লেখ করে আলাসিঙ্গাকে লিখেছেন—

'Look Aharp, my boy, take courage. We are distiend by the Lord to do great things in India. Have faith. We will do, we, the poor and the despised, who really ful and not those....'[১]

পাশ্চাত্যে স্বামীজীর কর্মযজ্ঞের পিছনে কি উদ্দেশ্য সেকথা স্বামীজী অকপুটে এই চিঠিতে আলাসিঙ্গাকে বলেছেন। এক সুমহান আদর্শ যে তাঁর সামনে ছিল সেকথা এই চিঠি পাঠ করার পর কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নতির জন্য তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমেরিকায় সংশোধনাগার (কারাগারকে সেখানে সংশোধনাগার বলা হয়) দেখে তিনি যারপরনাই বিস্মিত সেখানে হয়েছিলেন। কারাবাসীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার সব রকম ব্যবস্থা সেখানে করা হয়ে থাকে। চরিত্র সংশোধনের দিকে সেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশী পরিমাণে যা আমাদের দেশে বিন্দুমাত্র হয় না। স্বামীজী পাশ্চাত্যে ঐ বিশেষ ধরণের বৈজ্ঞানিক পন্থা দেখে শুধু বিস্মিতই হননি, গভীরভাবে বেদনাক্লিষ্ট হয়েছিলেন। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপীরা দিন দিন অধোমুখি হয়ে পড়েবে। এদের পাশে সাহায্যের হাত কেউ বাড়িয়ে দেয় না। কোন বন্ধু এদের নেই। বলেছেন, তারা দিন দিন ডুবে যাচ্ছে। তারা যে মানুষ, সে কথা তারা ভুলে গিয়েছে। পর্বতপ্রমাণ দাসত্ব ও পশুত্বই ভারতবর্ষের মানুষের 'ডুবে' যাওয়ার কারণ। কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি হিন্দুধর্মের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন। আসলে তা নয়। স্বামীজী হিন্দুধর্মের মূল আদর্শকে তুলে ধরে বলেছেন, জগতের যত প্রাণী আছে সকলেই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কার্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব হৃদয়ের ও অভাব। এসব কথা ঐ চিঠিতে আলা সিঙ্গাকে লিখেছেন। আশ্বাস দিয়ে লিখেছেন—

"Despair not ! Remember the Lord says in the Gita , "To work you have the right, but not to the result." Gird up your lions my boy. I am called by the Lord for this. I, have been dragged through a whole life full of crosses and tortures. I have seem the nearest and dearest die, almost of starvtion ; I have been ridiculed, distrusted and have suffered for my.sympathy for the very men who scoffand scorn.....Trust not to the so-called rich, they are more dead than alive. The hope lies in

১. Letters of Swami Vivekanada., Page—37

you—in the meek, the lowly, but the faithful. Have faith in the Lord ; no policy, it is nothing. Feel for the miserable and look up for the help—it shall come. I have travelled twelve years with this load in my heart and this idea in my head.

ভারতবর্ষের দীন দরিদ্র অজ্ঞ মানুষের জন্য প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়িয়েছেন। হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করে এইভাবে তিনি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করে পাশ্চাত্যে গিয়ে পৌঁচেছেন। তথাকথিত ধনীরা তাঁকে অবিশ্বাস করে অবহেলা করেছেন ; ভেবেছে জুয়োচোর—এসব কথা তিনি ঐ চিঠিতে জানিয়েছেন। স্বামীজীর ঐসব উক্তি যথার্থ। আমরা মেরী লুই বার্ক-এর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল 'Swami Vivekananda' in the West ; New Discovcries' গ্রন্থ এবং বিশিষ্ট বিবেকানন্দ গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর "বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" গ্রন্থ থেকে স্বামীজীর সেই লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত জানতে পারি। ঈশ্বরের উপর গভীর বিশ্বাস রেখে এবং ত্যাগ ও সেবাকে পরম পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে স্বামীজী ভারতবর্ষের মানুষের কল্যাণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তখন থেকে আর পিছন ফিরে তাকাননি। তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল নিজের উপর এবং সেই সর্বকর্ম নিয়ন্ত্রা ঈশ্বরের উপর। ঐ চিঠিতে লিখেছেন—

"Go now this minute, to the temple of Parthasarathi, and before Him who was friend to the poor and lowly cowhards of Gokula, who never shrank to embrace the Pariah Guhaka, who accepted the invitition of a prostitute preference to that of the nobles and saved her in His in curnation as louddha—year, down on your faces before Him and make a great sacrifics, the sacrifice of a whole life for them, for whom he comes form times to time, whom he loves above all, the poor, the lowly, the oppressed. Vow, then, to devote your whole lives to the cause of the redemption of these there hundred millions going down and down everyday.

তারপরেই লিখেছেন, এ কাজ একদিনের কাজ নয়। তার পথও খুব কান্টকাকীর্ণ। আমাদের পথ দেখাছেন পার্থসারথী। তাঁর নামে, তাঁর প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাস রেখে ভারতের শত শত যুগ সঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নি সংযোগ কর, অবশ্যই সে ভস্মীভূত হবে। স্বামীজীর এসব চিঠি পড়ে মনে হয়, তাঁর জীবনের মূল শক্তি ছিল নিজের উপর বিশ্বাস এবং সবোপরি ঈশ্বরে বিশ্বাস। এ চিঠি তার নিশ্চিত প্রমাণ।

স্বামীজীর এই চিঠি অনুপ্রেরণায় ভরপুর। এই অনুপ্রেরণার পিছনে সদা সর্বদা জাগরুক বীররস। শৌর্যতার চরম অস্ত্র। শুধু এ চিঠি নয় তাঁর অনেক চিঠি, অনেক রচনা ও বক্তৃতায় এই বিশেষ দিকটি প্রকাশিত। তাঁর কবিতার অভ্যন্তরেও এ রস বর্তমান। সেসব কথা

পরবর্তীতে জানাবো যাবে। বীর রসের প্রকাশ, বীর ভঙ্গীতে। ভাবের সঙ্গে ভাষার এক অপূর্ব সামঞ্জস্য। 'চরৈবেতি চরৈবেতি'র মন্ত্রই ধ্বনিত হয়েছে স্বামীজীর এই পত্রের নিম্নোক্ত অংশে—

'Lord—march on. the Lord is our General. Do not look back to sec falls—Forward onward ! Thus and this wc shall go on, breath in. One falls and another takes up the work.

পাশ্চাত্যভূমিতে বিবেকানন্দের সংগ্রামের যে ইতিহাস, যে বিরাট কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান তিনি করেছিলেন সেখানে, তার গোড়ার কথা জানতে গেলে এ পত্রখানি অবশ্যই পাঠ করা কর্তব্য। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারের কাজে রাজা রামমোহন থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের অনেকেই সমাজের অবনতির কারণ হিসাবে ধর্মকে দায়ী করেছেন। পৌরহিত্যের বিবিধ অত্যাচার ও অবনতির জন্য তাঁরা ধর্মকেই দায়ী করেছেন এবং সেকারণে তাঁরা হিন্দুর ধর্ম রূপ ঐ অবিনশ্বর দুর্গকে ভাঙতে উদ্ধৃত হলেন। আর তার ফল হল শুধুই নিস্ফলতা। স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লেখা একটি পত্রে (২রা নভেম্বর ১৮৯০) তাঁর পূর্ববর্তী ভারতীয় সংস্কারকদের ভুল পথের কথা নির্দেশ করে হিন্দুধর্মকে যে পরিত্যাজ্য করা উচিত নয়, সেকথা বলেছেন—

'The Hindu must not give up his religion, but must keep religion within its proper limits and give up freedom to society to you. All the reformers in India made this serious mistake of holding religion accountable for all the horrors of priestcraft and degeneration and went forth with to pull down this indestractible structure and what was the result ? Failures ! Biginning from Buddha down to Ram Mohon Roy everyone made, the mistake of holding caste to be a religious institution and fried to pull down religion and caste all together and failed.

স্বামীজী ভারতবর্ষের এই গম্ভীর সমস্যার সমাধানের পথও নির্দেশ করেছেন ঐ পত্রে। বলেছেন, 'এ বিষয়ে পুরোহিতগণ যতই আবোল তাবোল বলুন না কেন, জাতি একটি অচলায়নে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া কিছুই নহে। উহারা নিজের কর্ম শেষ করিয়া এক্ষনে ভারত-গগণকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহা দূর হইতে পারে, কেবল যদি লোকের হারানো সামাজিক স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি ফিরাইয়া আনা যায়।........স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক।'[১]

মুক্তির জন্য চাই বুকভরা সাহস এবং শিক্ষা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে শিক্ষিত

---

১. পত্রাবলী ঃ স্বামীজীর বাণী ও রচনা—৬ খণ্ড, পৃঃ ৩৮২

করার প্রয়োজনের কথা স্বামীজী বলেছেন। পাশ্চাত্যের একজন রেলের কুলি ভারতবর্ষের অনেক রাজরাজরা এবং সাধারণ মানুষদের থেকে অনেক বেশি শিক্ষিত। আমাদের নারী শিক্ষা পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবস্থা করার উপর জোর দিয়েছেন তিনি। মার্কিন মুলুকের অধিকাংশ নারীকে শিক্ষিত দেখে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে আলাসিঙ্গাকে আমাদের নারীশিক্ষার প্রয়োজনের কথা বলেছেন। স্বামীজী বিশেষভাবে জানিয়েছেন ঈশ্বর তাঁর এবং আমাদের উপর ভারতের আমূল সংস্কারের দায়িত্ব দিয়েছেন। তার প্রকাশ এই পত্রখানিতে—

"Be of good cheer and believe that we are selected by the Lord to do great things and we will do them. Hold yourself in readiness, i.e. be pure and holy, and love for love's sake. Love the poor, the miserable, the down trodden and the Lord will bless you.[১]

ভারতবর্ষই ছিল স্বামীজীর কর্মক্ষেত্র। বিদেশে স্বামীজী যা কিছু করেছেন, সবকিছুই ভারতবর্ষের স্বার্থে। তিনি বলেছেন, বিদেশে আমাদের কার্য সমাদৃত হওয়ার এইটুকু মূল্য যে, তাতে ভারত জাগবে। এখানে ভাববিস্তারের জন্য প্রয়োজন ছিল সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি। উন্নতির জন্য প্রথম চাই স্বাধীনতা। আমাদের পূর্বপুরুষেরা আত্মার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, সে কারণে এদেশে ধর্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও বিকাশলাভ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তাঁরা যখনই দেহকে বন্ধনের মধ্যে ফেললেন, তখন থেকেই সমাজের বিকাশ স্তব্ধ হয়ে পড়লো। পাশ্চাত্য দেশে স্বামীজী এর বিপরীত দিকটিই লক্ষ করেছেন—সেখানকার সমাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা কিন্তু ধর্মের লেশ নাই। কার্যত সেখানে ধর্ম নিতান্ত অপরিণত, কিন্তু সমাজ সুন্দর ভাবে গড়ে উঠেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনপ্রবাহের মূলে দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্য কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে। স্বামীজীর মতে, 'ভারতের আদর্শ ধর্মমুখী বা অন্তর্মুখী ; পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক বা বহির্মুখী। পাশ্চাত্য এতটুকু আধ্যাত্মিক উন্নতিও সমাজের উন্নতির ভিতর দিয়া করিতে চায়, আর প্রাচ্য এতটুকু সামাজিক শক্তিও আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়া করিতে চায়।'[২] একটি পত্র কিন্তু তাতে ভারতবর্ষ এবং সেইসঙ্গে পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রার ভিত্তিমূল নিরূপিত। বর্তমান ভারতের ভগ্নহৃদয় ও হতাশাচ্ছন্ন মানুষের মনে এই পত্রখানি নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করার শক্তি রাখে।

গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং দূরদৃষ্টি ছিল স্বামীজীর। আমেরিকার মতো ধনী দেশে স্বামীজীর গমন, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের মতো ম্লেচ্ছ প্রধান দেশে স্বামীজীর হিন্দুধর্ম প্রচারের ব্যাপার নিয়ে অনেকে সন্দিহান ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি উদ্দেশ্যহীন ভাবে পাশ্চাত্য গিয়েছেন—একথা অনেকে বলেছেন। স্বামীজী সেটা জানতেন এবং সে জন্য চিকাগো থেকে ১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৪-এ শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে ঐ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "I am neither a sightseer nor an idle traveller ; but you will

১. Letters of Vivekananda—P---56

২. Letters of Swami Vivekananda, P. 58

see, if you like to see, and bless me all your life'.[১] (আমি অলস পর্যটক নহি, কিংবা দৃশ্য দেখিয়া বেড়ানোও আমার পেশা নহে। যদি বাঁচিয়া থাকেন, তবে আমার কার্যকলাপ দেখিতে পাইবেন এবং আজীবন আমাকে আশীর্বাদ করিবেন')।

বিবেকানন্দ ছিলেন স্পষ্টাবক্তা। চিঠিতেও তার ছাপ সুস্পষ্ট। ঐ পত্রের শেষে লিখেছেন—আমাদের ভারতবর্ষের মানুষেরা মোটেই জ্ঞাত নয় যে, পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে কি ঘটছে! 'I cease from quoting more lest you think me conceited ; but this was nesessary to you who have become nearby frogs in the well and would not see how the world is going on else where. I do not mean you personally, my noble friend, but our nation is general.'

এই পত্রখানি স্বামীজী যখন লিখেছিলেন, আমেরিকায় তখন তিনি সবদিক থেকেই স্বাচ্ছন্দভাবে বিহার করছেন। অর্থাভাব আর নেই, সেখানকার মানুষেরাও তাঁকে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। বহু পণ্ডিত শিক্ষিত, এমন কি সাধারণ মানুষদের সহানুভূতি এবং সহযোগিতা তিনি পাচ্ছেন। তাঁর মনে একটি চাপা ক্ষোভ এই যে, বিদেশের এই অজানা ভূমিতে তাঁকে যেমন অনেকে গ্রহণ করেছে, বুঝেছে, ভারতবর্ষের মানুষের কাছে থেকে তা তিনি পাননি। পাননি বলে তিনি ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য কিছু করতে চান না, তা নয়। বরং এজন্য তাঁর মনে এক গভীর দুঃখবোধ জায়গা করে নিয়েছিল। ভারতবর্ষের বাইরে বেড়িয়ে এসে বিদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে স্বাচ্ছন্দ দেখে ভারতবর্ষের নিদারুণ অবস্থার জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদতো। কী মহান হৃদয় ছিল তাঁর! পত্রখানির প্রায় শেষের দিকে লিখেছেন—বাংলা তর্জনায় যা দাঁড়ায়—"আমেরিকার জনসাধারণ ভিন্নধর্মাবলম্বী হইয়াও আমার প্রতি যে সহায়তা, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ও আনুকূল্য দেখাইয়াছেন, যাহার সহিত আমার নিজ দেশের স্বার্থপরতা অকৃতজ্ঞতা ও ভিক্ষুক মনোবৃত্তির তুলনা করিয়া আমি লজ্জা অনুভব করি এবং সেই জন্যই আপনাকে বলি যে, দেশের বহিরে আসিয়া অন্যান্য দেশ দেখুন এবং নিজ অবস্থার সহিত তুলনা করুন।"[২] পাশ্চাত্যের মানুষের বিশাল সফলতার অন্তরালে তিনি লক্ষ করেছেন তাদের সংগঠন এবং সম্মিলিত হওয়ার ক্ষমতা। তা সম্ভব হয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতা, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। দেওয়ানজীকে একটি পত্রে লিখেছেন— "The secret of success of the West erners is the power of organization and combination. That is only possible with mutual trust and co-operation and help."[২]

স্বামীজীর ইংরেজি পত্রাবলির মধ্যে তাঁর স্বভাবকবিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। সেই

কবিত্বের ভিতর কখনো বীর সংগ্রামী চেতনার প্রকাশ, আবার কখনও বা বৈদিকঋষির ভাবগম্ভীর মন্ত্রের মতো দার্শনিকচেতনা সম্পন্ন ভাব মূর্ত হয়েছে। নোতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার জন্য আলাসিঙ্গাকে উদ্বুদ্ধ করে অনেক চিঠি দিয়েছেন। তারই মাঝে মাঝে সেই কবিত্ব রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছে। তার থেকে কিছু চয়ন করছি। স্বামীজীর সেই কবিত্বময় বাণী ঃ—'Up, up, the long night is passing, the day is approaching, the wave has rise, nothing will be able to resist its tidal fury. The spirit, my boys, the spirit, the love, my children, the love ; the faith, the belief and fear not ! The greatet sin is fear.'[১]

মিসেস মেরী এবং এইচ. হেলকে লেখা একটি পত্রে সেই কবিত্বের ঘনীভূত প্রকাশ ঃ

'Thou music of my Beloved's flute, lead on, I am following. It is *impossible to express my pain, my anguish at being separated from* you, noble and sweet and generous and holy ones. Oh ! how I wish I had succeeded in becoming a Stoic !'[২]

স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণের গভীরে একটি কবিসত্তা সবসময় জাগরুক থাকতো। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি এবং ঋষিকবি বললেও আশাকরি অযৌক্তিক হবে না। আমাদের মনে হয়, বিবেকানন্দের এই কবিসত্বার পিছনে দুটি জিনিষ সক্রিয় ছিল—যৌক্তিক অনুভূতির জগতে তিনি ছিলেন সম্রাট ; গভীর অনুভূতির জগতে নিমগ্ন থাকতে তিনি ভালোবাসতেন। স্বামীজীর এই ভাললাগার চরমতম ইচ্ছার প্রকাশ ঠাকুরের কাছে তিনি যখন নির্বিকল্প সমাধি চান। বলাবাহুল্য অনুভূতির সেই গভীর জগৎ থেকেই কবিতার সৃষ্টি। দুই—সারাজীবন বেদ-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, সংস্কৃত সাহিত্য প্রভৃতি পাঠ করেছেন একদিকে, অপরদিকে পাশ্চাত্য কবিদের কাব্যপাঠও কবিমনের গড়নে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। পত্রাবলির মধ্যে বহু জায়গায় শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, রামায়ণ প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃতি ইংরেজিতে অনুবাদ করে লিখেছেন। উদ্দেশ্য, ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্যে জীবনের পাথেয় তথা অবলম্বনকে তুলে ধরা তাদের কাছে যারা ভারতীয় বন্ধু-ভক্ত শিষ্য বা অনুরাগী অথবা পাশ্চাত্যের প্রিয় বন্ধু-বান্ধব বা স্নেহের পাত্র-পাত্রী। মিসেস মেরী এবং এইচ. হেলকে ইল্লিখিত উপরোক্ত পত্রে প্রথমেই স্বামীজী তুলসীদাসের রামায়ণ থেকে অনুবাদ করেছেন— "I bow down to both the wicked and holy ; but alas ! form me, they are both equally tortures, the wicked begin to torture me as soon as they come in contact with me— the good, alas ! take my life away when they leave me."[৩]

---

১. Letters of Swami Vivekananda—P. 107

২. Letters of swami Vivekananda—P. 119

৩. Letters P—119

এরকম অজস্র উদাহরণ তাঁর পত্রাবলির মধ্যে।

স্বামীজীর ইংরেজি পত্রাবলির বেশ কিন্তু পত্র আলাসিঙ্গাকে দেওয়া। ভরতবর্ষে গুরু প্রদর্শিত কর্মের রূপায়ণ করার প্রাথমিক পর্বে তিনি পত্র-পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। আলাসিঙ্গাকে সেই প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে একটি পত্র দিয়েছিলেন ইউ, এস এ. থেকে, ১৮৯৪ এর ৩১এ আগষ্ট। নতুন ভারতের রূপায়ণের কর্মে নিবেদিত প্রাণ্যের মধ্যে যাঁদের নাম সর্বাগ্রে করতে হয় তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন আলাসিঙ্গা।

তাঁর মধ্যে স্বামীজী দেখেছিলেন নিঃস্বার্থ কর্মপ্রাণতা এবং দেশপ্রাণ আত্মাকে। এরকম বৃহৎ আত্মা ছিলেন বালাজী, জি.জি. কিডি প্রভৃতি মাদ্রাজের বন্ধুগণও। স্বামীজী বিভিন্ন পত্রে এঁদের উৎসাহিত করেছেন। শুধু তাই নয়, উৎসাহিত করে এবং সচেতন করে দিয়ে তিনি আলাসিঙ্গাকে বলেছেন, সবসময় ঈশ্বরের কর্ম হিসেবে কাজ করে যাও, নেতা হিসাবে নয়। তাঁর উপরেই স্বামীজী একটি সোসাইটি গড়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাঁকে লিখিত ঐ চিঠিটিতে একটি ইংরেজি এবং একটি বাংলা কাগজ প্রকাশনার দায়িত্ব এবং ঐ সোসাইটি গঠন করার দায়িত্বও স্বামীজী দিয়েছিলেন। স্বামীজীর ভারত-গড়ার ইতিহাসে ঐ চিঠিটি দলিল বিশেষ।[১] পত্রিকা প্রকাশনার জন্য প্রাথমিক পর্বে যে অর্থের প্রয়োজন পরবে, তা-ও দেবার আশ্বাস তিনি দিয়েছিলেন। ঐ পত্রের একটি জায়গায় স্বামীজীর ত্যাগ, বিশেষ করে অর্থ বা টাকা পয়সার প্রতি নির্মোহ প্রকাশ পেয়েছে। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তিনিও টাকা পয়সা স্পর্শ করতে পারতেন না। লিখেছেন, 'You know the greatest difficulty with me is to keep or even to touch money. It is disgusting and debasing. so you must organize a society to take change of the practical and pecuniary part of it. I have friends here who take care of all my monetary concerns.

'Give the society a non sectarian name......Do you write to my brathers at the Math to organise in a similar fashion......Great things are in store for you Alasinga.'

স্বামীজী প্রদত্ত দায়িত্ব আলাসিঙ্গা বহন করেছিলেন সত্যিকারের নিঃস্বার্থ কর্মীর মতোই। তাঁর উপর স্বামীজীর গভীর আস্থা ও প্রেম পত্রখানির উপরোক্ত অংশে স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁকে উজ্জবিত করে তিনি ঐ পত্রখানির শেষে যা লিখেছিলেন তা 'মাভৈঃ' মন্ত্রের মতো শোনায়। উজ্জীবনের এমন কবিত্বময়, অথচ বীরত্বপূর্ণ বাণী ইংরেজি পত্রসাহিত্যে দুর্লভ। লিখেছেন—

'Are you sincere ? Unselfish even unto death and loving ? Then fear not, not even death. On ward, my lads ! The whole world requiers light. It is expectant ! India alone has that light, not in magic

১. Letters.. .P – 134

mummeries and charlatanism, but in the teaching of the glories of the spirit of real religion....of the hightest spiritual truth....Now the time has come. Have faith that you are all, my brave lads, born to do great things ! Let not the barks of puppies frighten you—no not even thunder bolts of heaven but stand up and work !

স্বামীজীর আমেরিকা থেকে লেখা ঐ সব পত্রগুলো আলাসিঙ্গা প্রমুখ কর্মীদের কাছে 'টনিক' হিসেবে কাজ করেছে। ভারতবর্ষকে আমূল সংস্কার করার কার্যে বিবেকানন্দ এঁদেরকে সাথী করে ঝাঁপিয়ে পরেছিলেন। সেই কাজে এগোনোর সময় অনুকূল অবস্থানের চেয়ে প্রতিকূল অবস্থাই এসেছে বেশি। সেসব ক্ষেত্রে স্বামীজী কখনোই পিছপা হন নি। বিশ্বাস কখনো হারাননি নিজের উপর। বিশাল সমস্যার সামনে গুরুর পণ এবং আশীর্বাণীকে স্মরণ রেখে পথ চলেছেন। পত্রগুলির নানান জায়গায় জীবনের সেসব সংকটময় অবস্থার কথা এবং গুরুর আদর্শকে গ্রহণ করে তা থেকে উত্তরণের ইতিবৃত্ত ভাস্বর হয়ে রয়েছে। এছাড়া বহু পত্রেই পাশ্চাত্য জীবন চর্চা, আচার-আচরণ, তাঁদের সামাজিক সমস্যা প্রভৃতি খুঁটি-নাটি ব্যাপার লিখেছেন ; পাশাপাশি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জীবন সমস্যার সমাধানের পথ ও পাথেয়-র কথাও লিখেছেন ঘনিষ্ঠদের। শুধু মাত্র ইংরেজি পত্রাবলি পড়েই স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন ও সাধনাকে উপলব্ধি করা যাবে। আমাদের যুবসমাজের কাছে আজকের সংকটময় মুহূর্তে স্বামীজীর পত্রাবলি গীতাস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে, এই আমাদের বিশ্বাস ॥

৩

স্বামীজীর ইংরেজি কবিতা

জগৎ জীবন শিল্প—এই তিন বস্তুতে আপাত বৈসাদৃশ্য থাকলেও আসলে একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে অন্বিষ্ট। সমগ্র জগৎটাই যেমন পরমেশ্বরের অসাধারণ সৃষ্টি-তৃষ্ণা থেকে উদ্ভুত, তেমনি মানবজীবনও। একটু সচেতনভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই জগৎ জীবন ও শিল্প সেই অমোঘ পুরুষের ঐশ্বরিক যাদুস্পর্শে লীলায়িত। আর মানুষ তাঁরই সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি। কবিকুল নিঃসন্দেহে মানবশ্রেষ্ঠ এবং সেই ভূমা পুরুষের অখণ্ড ঐশ্বরিক সত্তার এক সত্তা। কবি এক অর্থে সত্যদ্রষ্টা বা ঋষি। যিনি জগৎ ও জীবন তথা বিশ্বচরাচরের মাঝের সত্যতাকে আপন চিত্ত-দর্শনে প্রতিফলিত হতে দেখেন এবং তাকেই কল্পনা ও বোধের যাদুস্পর্শে প্রকাশ করেন তিনিই কবি। এদিকে থেকে বিচার করে আমরা স্বামী-বিবেকানন্দকে কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু'—এক পরম সত্যের বিচিত্র বিকাশের উপলব্ধি বিবেকানন্দের কবিতার অন্যতম মূল প্রেরণা। আমাদের আলোচ্য বিষয় বিবেকানন্দের কবিসত্তা ও ইংরেজি কবিতা। বলে রাখা উচিত,

স্বামীজী প্রচলিত অর্থে কবি নন। কারণ ঐ অর্থে কবি হতে গেলে তাঁর কাব্যসৃষ্টি প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল এবং বক্তব্য প্রত্যয়ান্বিত হতে হবে—'He has three qualities which are seldom found together except in the greatest poet : abundance, variety and complete competence.'[১]

স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি কবিতা সংখ্যার বিচারে অতি স্বল্প। আধুনিক কবিদের মতো বিষয়ের বৈচিত্র্যও তাঁর কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর ঐ স্বল্প কটি কবিতা বিষয়-মাধুর্যে অপূর্ব ও সুগভীর প্রত্যয়ান্বিত বা চির আধুনিক। আধুনিকতা এক অর্থে ঐতিহ্যবাহী ও শ্বাশত চেতনাবাহী। সেদিক থেকে স্বামীজীকে আধুনিক কবি হিসেবেও আখ্যা দিতে পারি। শ্বাশতকালীন ভাবনাচিন্তা যেসব কাব্য-কবিতায় প্রকাশ পায় তাই আধুনিক কাব্য বা কবিতা। যদিও সময়ের বার্তা কিছু কিছু আধুনিক কাব্যের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধেরও পরিবর্তন হয়, তখন সেসব কাব্য-কবিতা আর চিরকালীন আধুনিক কবিতা হয়ে থাকে না। মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' অথবা দূর অতীতের কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্য, আরও আধুনিক কালের রবীন্দ্রনাথেব 'গীতাঞ্জলি' আমাদের কাছে আধুনিক ভাবব্যঞ্জক। এই অর্থে বাংলার সুধীন দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী ; ইংরেজ কবি শেলী, ওয়াডসওয়ার্থও বিবেচ্য। প্রসঙ্গত মহাভারতের আদি পর্বের একটি শ্লোকের কথা স্মরণে আসছে.....

আচক্ষঃ কবয় কোচিৎ সম্প্রত্যাচিক্ষাতে পরে।
আখ্যাসন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসসিসং ভূবি ॥[২]

বর্তমান কালাবধি পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের প্রধান কবিদের কাব্যসুষমা গড়ে উঠেছে সেই দেশের পুরাণ তথা প্রাচীন সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণের প্রচুর উদাহরণ মেলে। পাশ্চাত্যে মিলটন এদিক থেকে স্মরণীয়। এঁদের কাব্যভাবনা প্রাচীন আদর্শেরই বিবর্তিত রূপ। বিবেকানন্দের ইংরেজি কবিতায় প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শ ও জীবনচর্যার ঘনীভূত রূপ প্রকটিত হয়েছে। তাঁর কাছে উপনিষদের বাণী ছিল মন্ত্র সমান ; পথ চলার পাথেয়। বেদ-বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্য তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছিলেন। সেসব থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন অলৌকিক কাব্যরস। অদ্বৈতানুভূতির কাব্যরূপায়ণের আদর্শ তিনি পেয়ে ছিলেন উপনিষদ থেকে। তাঁর বক্তৃতায় ও কথোপকথনে উপনিষদের গভীর মননের পাশাপাশি যে গভীর অনুভব সৌন্দর্যরস ধারায় নির্ঝরিত হয়েছে তা তিনি নানাস্থানে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর কবিমনের গড়নে উপনিষদের যে গভীর প্রভাব ছিল

---

১. T. S. Eliot Selected prose : T. Hoyward. 1963 Edition. P—116

২. ব্যাস মহাভারতম্ আদিপর্ব। দ্রঃ মহাভারত সারানবাদ রাজশেখর বসু ১৩৫৬, মহাভারতে কালীপ্রসন্ন সিংহ বসুমতী সাহিত্য মন্দির, মহাভারতম্ হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ, ১৯৫২....

তার প্রমাণ অজস্র। উপনিষদের আধ্যাত্মিক দিক ছাড়াও যে একটি কবিত্বের ধারা রয়েছে তা স্বামীজী অনেক স্থানে বলেছেন। তাঁর ভক্তি—'জ্ঞান যোগ' গ্রন্থে বলেছেন............

আমাদের চোখে সামনে ভূমার ভাব ও ছবি তুলে ধরাই উপনিষদসমূহের উদ্দেশ্য। তবু এই অপূর্ব ভাবগাম্ভীর্যের আড়ালে মাঝে মাঝে কবিত্বের আভাস মেলে ; যেমন—

ন তত্র সূর্যো ভাতিন্ চন্দ্র তারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভাতি কুতোহয়মগ্নিঃ।

এই অপূর্ব চরণ দুটির হৃদয়-স্পর্শী কবিত্ব শুনতে শুনতে আমরা যেন ইন্দ্রিয়ের জগৎ থেকে, এমন কী মনের জগৎ থেকে দূরে অতিদূরে এমন এক জগতে উপনীত হই, যে জগৎ সবসময় আমাদের একান্ত কাছেই রয়েছে, অথচ যা কোনো কালেই আমাদের জ্ঞানের বিষয় নয়।"

"উপনিষদের মত অপূর্ব কাব্য জগতে আর নেই। বেদের সংহিতা ভাগেও লক্ষ করলে মাঝে মাঝে অপূর্ব কাব্য সৌন্দর্যের পরিচয় পাই। উদাহরণস্বরূপ ঋগ্বেদ সংহিতার 'নাসদীয় সূক্ত' অংশটি আলোচনা করি। এইখানেই প্রলয়ের গভীর অন্ধকার বর্ণনায় সেই শ্লোকটি আছে........'তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে'—ইত্যাদি। "যখন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল"....এ অংশটি পড়লেই অপূর্ব গাম্ভীর্যময় কবিত্বের অনুভূতি জাগে।" (সর্বায়ব বেদান্ত—জ্ঞানযোগ)

"প্রাচীন উপনিষদসমূহ অতি উচ্চস্তরের কবিত্বপূর্ণ। এই সব উপনিষদ স্রষ্টা ঋষিরা ছিলেন মহাকবি। তোমাদের অবশ্যই প্লেটোর কথা মনে আছে। কবিত্বের মধ্য দিয়েও জগতে অলৌকিক সত্যের প্রকাশ হয়। কবিতার মধ্য দিয়ে মহত্তম সত্যোপলব্ধি রাশি জগৎকে দান করার জন্যে বিধাতা উপনিষদের ঋষিদের সাধারণ মানব থেকে অনেক উর্দ্ধে কবিরূপে সৃষ্টি করেছিলেন।" (প্রেম ও জগৎ—জ্ঞানযোগ)

উপনিষদ স্বামীজীর মনে কবিত্বের জগৎ তৈরি করে দিতে পেরেছিলো ; তার প্রভাব তাঁর একটি গানে—

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর
ভাসে ব্যোম ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর ॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি' এই ধারা অনুক্ষণ ॥
সে ধারাও বন্ধ হলো, শূন্যে শূন্যে মিলাইল,
অবাঙ্‌মানসো গোচরম্, বোঝে—প্রাণ বোঝে যার ॥

শুদ্ধ মন কেমন করে নামরূপের জগৎ থেকে নিজেকে বিশ্লেষিত করে অহংচৈতন্যের

পারে ব্রহ্মস্বরূপে লীন হয়, এই সঙ্গীতটিতে সেই বিশেষ মানসিকঅবস্থার বা ভাবের কথায় ব্যক্ত। স্বামীজীর প্রিয় উপনিষদ শ্লোক 'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্। নেমা বিদ্যুতা ভাতি কুতোহয়মাগ্নঃ।'[১]—এর ছায়ানুসরণে এ গানের জন্ম।

স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনদর্শন উপনিষদের 'অভী' মন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল তা তাঁর জীবনসাধনা থেকেই অনুধাবন করা যায়। তাঁর পত্রাবলির আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, তিনি শুধুমাত্র ঐ মন্ত্রটিকে সম্বল করেই কর্ম-সংগ্রামের সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করেছেন।—সেকথা তিনি নানান পত্রেও জানিয়েছেন। আমরা তার পুনরাবৃত্তি করছি না। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, স্বামীজী তাঁর ধ্যান ও সংগ্রামের বাণী আহরণ করেছেন ভারতচেতনার বাণীময় গ্রন্থ উপনিষদ থেকে। কেবল আধ্যাত্মিক সুক্ষ্ম জগতের সন্ধান ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সকল কর্ম প্রচেষ্টায় অন্তরের সুপ্তশক্তির মহাজাগরণের ক্ষেত্রেও তিনি উপনিষদ থেকে পাথেয় পেয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, বিবেকানন্দের সংগ্রামী হৃদয় গঠনেও উপনিষদ সুগভীর প্রভাব ফেলেছিল। উপনিষদকে আর একজন বিখ্যাত ভারতীয় কবি জীবনবেদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন—তিনি রবীন্দ্রনাথ। মানবমনের অনন্তানুভবকে কাব্যরূপ দেবার চেষ্টা এ দুই কবিই করেছেন এবং সার্থকও হয়েছেন। পাশ্চাত্যের কবিরা এদিকথেকে ঠিক ততখানি সার্থক নন। তারা বহিঃপ্রকৃতির মহান ভাবকে রূপদানের চেষ্টা করছেন। উদাহরণস্বরূপ মিল্টন, দান্তে, হোমার বা অন্য যে কোন পাশ্চাত্য কবির কাব্য আলোচনা করা যাক—তাঁদের কাব্যে মাঝে মাঝেই মহান ভাববাঞ্জক অপূর্ব শৈলি দেখতে পাওয়া যায়—"কিন্তু সর্বত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা চেষ্টা, বহিঃপ্রকৃতির বিশাল ভাব, দেশকালের আনন্দ ভাবের বর্ণনা"।[২]—পাশ্চাত্য কাব্য কবিতার সমালোচনা আমরা বিবেকানন্দের কাছ থেকে পাচ্ছি। অনন্তানুভবকে কাব্যরূপ দিয়ে তিনি কাব্য সাহিত্যের ভাণ্ডারে নতুন রসের সন্ধান দিলেন।

(খ)

আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি ইংরেজি সাহিত্য পাঠে স্বামীজীর অনুরাগ ছিল অপরিসীম। মিল্টন ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কবি। 'প্যারাডাইস লস্ট' খুব কম বয়সেই পড়ে ফেলেছিলেন। শয়তান চরিত্র তাঁকে খুব আকৃষ্ট করেছিলো। মিল্টনের কবিতা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন। সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী তিনি পাঠ করেছিলেন। বায়রন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ,—শৈলি প্রভৃতি ইংরেজি গীতিকবিদের কাব্যপাঠও তিনি একনিষ্ঠ পাঠকের

১. সেখানে সূর্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র-তারকাও নহে, বিদ্যুৎ সেখানে আলোকিত করিতে পারে না—সামান্য আর কথা কি?

২. বিশ্ববিবেক—সম্পাদক অসিত কু. বন্দ্যোঃ শঙ্কর ও শঙ্করীপ্রসাদ বসুঃ প্রবন্ধঃ বিবেকানন্দ কবিমনীষী লেখক ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ।

মতো করেছিলেন। কবিতার প্রতি তাঁর আবাল্য একটা আকর্ষণ ছিল.......সে যে কোন দেশের কবির কাব্যই হোক না কেন! কবি মধুসূদন ছিল তাঁর আদর্শ কবি ; তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য' ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কাব্য। বিবেকানন্দের কবি মানসিকতায় একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বিশেষকরে বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, গীতার এবং সংস্কৃত সাহিত্যের কবি কালিদাসের প্রভাব পড়েছিল, পাশাপাশি ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের মহাকবি ও গীতিকবিদের প্রভাবও পড়েছিল প্রভূত পরিমাণে। কিন্তু সব কিছুকে তিনি আত্ম-প্রতিভায় স্বীকরণ করে নিয়েছিলেন। যদিও উপনিষদের ভাবনা তাঁর হৃদয়ের গভীর তলদেশে সবসময় ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হতো। একে জীবন থেকে বিনিষ্ট করতে তিনি কখনোই পারেন নি। তাঁর ইংরেজি কবিতায় এর প্রমাণ অজস্র। তবে পরম সত্যের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে শেলি ও ওয়ার্ডওয়ার্থের কবিতাও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ ব্যাপারে দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁকে শেলীর কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করেন। শেলীর Hymn to Intellectual beauty তাঁকে শুষ্ক দার্শনিক বিচারের অনেক উর্দ্ধে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। ব্রজেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য অনুযায়ী শেলির কবিতালোকে প্রবেশের পর তাঁর কাছে "জগৎ আর প্রেমহীন প্রাণহীন যন্ত্রমাত্র রইল না—এক অধ্যাত্ম ঐক্যের সূত্রে বিধৃত হলো।"[১] [স্বামীজী যে একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন তার বিস্তর প্রমাণ তুলে ধরেছেন বিবেকানন্দ গবেষক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু তাঁর 'বিবেকানন্দ সমকালীন ভারতবর্ষ' (৫ম খণ্ড) গ্রন্থে পৃঃ ১৪৩—১৪৮। অত্যুৎসাহী পাঠক তা দেখতে পারেন।]*

বিবেকানন্দের কাব্যদর্শ ছিল তাঁর জীবনাদর্শের মতোই সুগম্ভীর ও সূক্ষ্ম ভাববাহী। কবিতার বাহ্যিক চটকদারীতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রমথনাথ বসু এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "তিনি মন্ত্র ঝংকার পূর্ণ শব্দবিন্যাসকেই কবিতা মনে করিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল প্রকৃত কাব্য বহুবর্ণাঙ্কিত শিল্পপটের ন্যায় একটি মনোরম শব্দময় চিত্রবিশেষ। ইহা যেন আদর্শকে লোকলোচণের সমক্ষে উপস্থিত করিবার শ্রেষ্ঠতম শিল্প—সত্যকে সাধারণ জগতের অঙ্গীভূত করিবার একমাত্র কৌশল।"[১]

এই বিশেষ কারণেই তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভক্ত-পাঠক ছিলেন। "ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থকেই তিনি কাব্য সমূহের ধ্রুবতারা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং ভক্তগণের উচ্চভাবপূর্ণ কবিতার অধিকাংশ স্থলই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।"[২] ঐ কবির কবিতাসূত্রেই যুবক নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ঘটেছিল তাঁর জীবনের নিয়ন্ত্রক শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। নরেন্দ্রনাথ তখন এফ. এ ক্লাসের ছাত্র, পড়েন জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ক্লাস ছেড়ে চলে যান (তা অসুস্থতার কারণেই হোক, অথবা

১. বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য—ডঃ প্রনবরঞ্জন ঘোষ। পৃঃ ১২৬ ;
২. প্রমথনাথ বসু, পৃঃ ৩৩—৫৪
৩. তদেব— পৃঃ ৫৩

বারংবার বোঝানো সত্ত্বেও ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা ছাত্ররা না বোঝার কারণেই হোক) ; তখন অধ্যক্ষ হেস্টিসাহেব গণ্ডগোল শুনে এবং ব্যাপারটি জেনে ইংরেজির ক্লাসটি নেন। তিনি ওয়ার্ডওয়ার্থের কবিতাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুভবে ভক্ত কবির ভাবসমাধি হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ সমাধির কথা বুঝিতে না পারায় তিনি তাহাদিগের উক্ত অবস্থার কথা যথাবিধি বুঝাইয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, চিত্তের পবিত্রতা ও বিষয়বিশেষে একাগ্রতা হইতে উক্ত অবস্থার উদয় হইয়া থাকে। ঐ প্রকার অবস্থার অধিকারী ব্যক্তি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। একমাত্র দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আজকাল ঐরূপ অবস্থা হইতে দেখিয়াছে। তাঁহার উক্ত অবস্থা একদিন দর্শন করিয়া আসিলে তোমরা এ বিষয় হৃদয়াসঙ্গম করিতে পারিবে।"[১] এর পরের ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা। বলাবাহুল্য, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যের 'ভাবসমাধির জগৎ থেকে রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম সমাধির জগতে উপনিত হয়ে নরেন্দ্রনাথ অবশ্যই অনুভব করেছিলেন—কাব্যের রসাবস্থা 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর'—কিন্তু তা ব্রহ্মস্বাদ নয়। তথাপি ঐ সহোদরত্ব দান করে যে সাহিত্য, তার বিষয়ে তিনি গভীর শ্রদ্ধাবোধ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ কি!"[২]

কিন্তু সবার উপরে স্বামীজীর কাছে সত্য ছিল বৈদিক সাহিত্য। সেসব গ্রন্থ পাঠ করেই তিনি পেয়েছিলেন সত্যদর্শন। তিনি অনেকগুলি বৈদিক স্তোত্র উদ্ধৃত করে তাদের রহস্যময় সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন। ঋগ্‌বেদের 'নাসদীয় সূক্তে'র প্রলয়বর্ণনা স্বামীজীর কবিহৃদয়কে আলোকিত করেছিল। তিনি বহুক্ষেত্রে কালিদাস বা মিল্টনের অনুরূপ রচনাংশের সঙ্গে ঋগ্‌বেদের ঐ বর্ণনার তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন।

"ঋগ্‌বেদ-সংহিতার নাসদীয় সূত্রে প্রলয়ের গভীর অন্ধকার-বর্ণনাত্মক শ্লোক আছে—তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে ইত্যাদি। 'যখন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল'—এটি পড়িলেই অনুভব হয়, ইহাতে কবিত্বের কোন্ অপূর্ব গাম্ভীর্য নিহিত। ভারতে এবং বর্হিভারতে গম্ভীর ভাবের চিত্র অঙ্কিত করার অনেক চেষ্টা হইয়াছে। ভারতের বাহিরে এই চেষ্টা সর্বদাই জড় প্রকৃতির অনন্ত ভাব বর্ণনার আকার ধরিয়াছে—কেবল অনন্ত বহিঃপ্রকৃতি, অনন্ত জড়, অনন্ত দেশের বর্ণনা। মিল্টন, দান্তে বা অপর কোন প্রাচীন বা আধুনিক বড় ইউরোপীয় কবি যখন অনন্তের চিত্র আঁকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাঁহারা কবিত্বের পক্ষ বিস্তার করিয়া জড়প্রকৃতির মধ্যে অনন্তকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনরূপ চেষ্টা ভারতেও হইয়াছে। বেদ-সংহতিায় এই বহিঃপ্রকৃতির অনন্ত বিস্তার যেমন অপূর্বভাবে চিত্রিত হইয়াছে, এরূপ আর কোথাও দেখা যাইবে না। সংহিতার এই.....তম-আসীৎ তমসা গূঢ়ম্—স্মরণ রাখিয়া তিন জন বিভিন্ন কবির অন্ধকারের বর্ণনা

---

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (২য় ভাগ) ঃ স্বামী সারদা নন্দ ২য় খণ্ড পৃ ৯৮

২. সমকালীন ভারতবর্ষ ও বিবেকানন্দ ঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু পৃঃ ১৫২

তুলনা করো। আমাদের কালিদাস বলিয়াছেন 'সূচীভেদ্য অন্ধকার।' মিল্টন বলিয়াছেন ; আলোক নাই, পরন্তু অন্ধকারই দৃশ্যমান। (No Light but...darkness is Visible)। কিন্তু ঋগ্‌বেদ-সংহিতা বলিতেছেন—'অন্ধকার—অন্ধকার দ্বারা আবৃত ; অন্ধকার অন্ধকারে লুক্কায়িত।'"[১]

স্বামী বিবেকানন্দের কাব্যপ্রতিভার বিচারকালে উপনিষদের কাব্যত্বের ভিত্তি সম্পর্কে তাঁর ধারণাটি জেনে নিলে তাঁর কবিত্ব ও কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে আমাদের কোন বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। উপনিষদের কাব্যত্বের ক্ষেত্রে তিনি শব্দশরীর তথা ছন্দসুষমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন ঠিকই, তবে ঐ শব্দ বা ছন্দ যাকে উন্মোচিত করতে সচেষ্ট, সেই মহাভার-রহস্যের অনুমান উন্মোচিত করার সাফল্যের উপরেই তিনি এই গ্রন্থের কাব্যত্বকে নিরীক্ষণ করেছেন এবং বিস্মিতভাবে এর অপূর্ব কাব্যরস পান করেছেন। বাণী ও রচনায় তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ—

"তাই এই বিরাট প্রশ্ন উঠিতেছে ঃ এই বিশ্ব কোথা হইতে আসিল, কেমন করিয়া আসিল, কি রূপেই বা অবস্থান করিতেছে? এই প্রশ্নের সমাধানে বহু স্তোত্র রচিত হইয়াছে, তাহারা যথাযথ আকার গ্রহণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু নিম্নের স্তোত্রে যে অপূর্ব কাব্যত্বে প্রকাশিত হইয়াছে, এমন আর কোথাও নয় ঃ—

নাসদাসীন্নো সদাসীওদানীং নাসীদ্রজোনো ব্যোমো পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নভঃ কিমাসীদ্যাহনং গভীরম্ ॥
ন মৃত্যুরাসীদমতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাধন্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥

তত [যখন অসৎ ছিল না, সৎ-ও ছিল না ; যখন অন্তরীক্ষ ছিল না ; যখন কিছুই ছিল না—কোন্ বস্তু সকলকে আবৃত করিয়া রহিয়াছিল, কিসে সব বিশ্রাম করিতেছিল? তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, দিবারাত্রির বিভাগ ছিল না। ইত্যাদি] অনুবাদে মূলের কাব্যসৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যায়—অথচ সংস্কৃত ভাষার শব্দ ধ্বনিমাত্রে কি সুরময়! 'তখন "এক" (অর্থাৎ ঈশ্বর) অবরুদ্ধ প্রাণে নিজেতেই অবস্থান করিতেছিলেন ; তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই ভাবটি উত্তমরূপে ধারণা করা উচিত—ঈশ্বর অবরুদ্ধ প্রাণরূপে (গতিহীন) অবস্থান করিতেছিলেন—কারণ অতঃপর আমরা দেখিব, কিভাবে পরবর্তীকালে এই ভাব হইতে সৃষ্টিতত্ত্ব অঙ্কুরিত হইয়াছে। হিন্দু দার্শনিকগণ সমগ্র বিশ্বকে একটি স্পন্দন সমষ্টি......এক প্রকার গতি—মনে করিতেন। সর্বত্রই শক্তি প্রবাহ। এই গতি সমষ্টি এক সময়ে স্থির হইতে থাকে এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থায় গমন করে এবং কিছুকালের জন্য সেই অবস্থায় স্থিতি করে। এই স্তোত্রে ঐ অবস্থার কথাই বর্ণিত হইয়াছে—এই জগৎ

---

১. বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ২২৬

২. সমকালীন ভারতবর্ষ ও বিবেকানন্দ (৫ম) শঙ্করী প্রসাদ বসু, পৃঃ ১৫২

স্পন্দনহীন হইয়া নিশ্চল অবস্থায় ছিল। যখন সৃষ্টির সূচনা হইল, তখন উহা স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করিল এবং উহা হইতে জগৎ বাহির হইয়া আসিল। সেই পুরুষের নিঃশ্বাস....শান্ত স্বয়ংপূর্ণ—ইহার বাহিরে কিছুই নাই।"[১]

বিবেকানন্দের কবিত্বের জগৎ সামগ্রিকভাবে উপনিষদের ঐ বিশেষ ভাবপুষ্ট। তিনি কখনোই ঐ বিশেষ জগৎ থেকে নির্বাসিত হন নি। আমরা তাঁর রচিত ইংরেজি কবিতাগুলো পাঠে নিমগ্ন হলে এ ব্যাপারটি অনুধাবনে সক্ষম হবো।

কালানুক্রমিকভাবে বিবেকানন্দের ইংরেজী কবিতাগুলি আমরা পরপর আলোচনা করবো। সর্ব মোট একুশটি কবিতা পাচ্ছি যেগুলি তিনি ইংরেজি ভাষায় লিখেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম লেখা কবিতা 'O'r hill and dale and mountain range'। কবিতাটি লেখেন ১৮৯৩ সালে নিউইয়র্ক থাকাকালীন। তখনো চিকাগো সম্মেলন হতে এক সপ্তাহ বাকি। কবিতাটি মেরী লুই বার্ক আবিষ্কার করেছেন। আমরা তাঁর 'New Discovery' গ্রন্থ থেকে এ কবিতার সন্ধান পেয়েছি। অধ্যাপক রাইটকে লেখা পত্রাংশ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ এ। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'সন্ধান ও সিদ্ধি' এই শিরোনামে কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করেছেন। মূলে যেমন, অনুবাদেও তেমনি অপূর্ব হয়ে উঠেছে এই কবিতাটি। রাত্রি-দিন বিপদ সঙ্কুল পথ অতিক্রম করে সাধক অবশেষে পেয়ে যায় চরম আকাঙ্খিতকে। অনেক সাধনার পরে আসে সিদ্ধি। 'O' r Hill and dale and mountain' কবিতায় কবি সাধকের সেই উপলব্ধির বাণীই অনুরণিত। স্বামীজী তাঁর সাধনার পথে যে চরম বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন সেকথা যেমন আছে, অবশেষে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব টানাপোড়েন সংকুল পথ পেরিয়ে মহান সিদ্ধি যে পেয়েছিলেন সে সত্যবাণীও প্রতিধ্বনিত। সব সাধনার পথই কন্টকাকীর্ণ,—ঈশ্বরকে পাওয়ার সাধনার পথ আরও ভয়ংকর কঠিন। গুটিকয় আছেন যাঁরা সাধনার পথে বিপত্তির সম্মুখীন হন্ নি, বা খুবই অল্প আয়াসে ব্রহ্মাস্বাদ পেয়েছেন বা ঈশ্বরদর্শন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এমনই একজন, যিনি প্রথম থেকেই রসময় ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম। মানুষের কল্যাণের প্রয়োজনে হয়তো তিনি অনেক পথ ধরে সাধনা করেছেন ; কখনো খ্রিষ্টান, কখনো মুসলিম, কখনো বা শিব, শাক্ত বা বৈষ্ণব সাধনার পথ ধরে সচ্চিদানন্দ হয়েছেন ; কিন্তু স্থূল লোকচক্ষুর কাছে তিনি পাগল রূপে প্রতিপন্ন হয়েছেন। কারো কারো (সংখ্যায় খুব-ই অল্প) দৃষ্টিতে তিনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দ রূপে পূজিত হয়েছেন। তাঁদের একজন স্বামী বিবেকানন্দ। অবশ্য বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হওয়ার কালে তাঁর প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ থাকলেও, অবিশ্বাসের পাহাড় মনের জগতে ছিল ঢের। এমনকী সেই চোরা অবিশ্বাস ভারতবর্ষ পর্যটনকালেও দারুণভাবে চাড়া দিয়ে উঠেছিল। সে ঘটনাও হয়ত অনেকের জানা, তবুও প্রাসঙ্গিক ভাবে একটু তুলে ধরি।—পওহারী বাবার

১. বাণী ও রচনা (৩য়), পৃঃ ২১২—১৪

গুণকীর্তন স্বামীজী দক্ষিণেশ্বরেই শুনেছিলেন এবং তখন থেকেই তাঁকে দর্শন করার জন্য একটা আকর্ষণ প্রায়শই তিনি অনুভব করতেন। "এখন সুযোগ পাইয়া তিনি বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে গাজীপুরে যাত্রা করিলেন এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তথায় পৌঁছলেন ॥"[১] গাজীপুরে থাকাকালীন ঐ সময়ে স্বামীজীর মনের অবস্থা কেমন ছিল? গম্ভীরানন্দ এ প্রসঙ্গে 'যুবনায়ক' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'চরম অধ্যাত্মকালের ক্ষেত্রে যাহাই ঘটুক, নিম্নতর ভূমির বিভিন্ন স্তরে আত্মবিষয়ক সত্য লাভের জন্য তিনি তখন ছটপট করিতেছিলেন এবং যেখানে উহা পাইবার সম্ভাবনা, দেখিতে ছিলেন সেখানেই ছুটিয়া গিয়া অদম্য উৎসাহে উহা আহরণে রত হইতেছিলেন ঃ "আমার মানসিক অবস্থা, আপনাকে কি বলিব, মনের মধ্যে নরক দিবারাত্রি জ্বলিতেছে—কিছুই হইল না, এজন্ম বুঝি বিফলে গেলামাল করিয়া গেল, কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" (বাণী ও রচনা—৬/৩২৫—২৬)। তাঁর অবিরাম সন্ধান চলেছে এ থেকে তা প্রমাণিত হয়। পওহারী বাবার কাছ থেকে স্বামীজী দীক্ষা নেবার জন্য মনস্থির করেছিলেন—এ ঘটনা অনেকের জানা এবং সেই সূত্রে কী ঘটেছিল তা আমরা জানাবো। কিন্তু তার পূর্বে পওহারী বাবা সম্পর্কে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর কিঞ্চিত পরিচয় এখানে রাখছি। বাবাজীর কাছ থেকে তিনি যে অধ্যাত্মমার্গের পরিচয় পেতে চেয়েছিলেন তা তিনি অবশ্য শেষ অবধি পান নি এবং সে ব্যাপারে স্বামীজীর বিশ্বাসে যে ফাটল ধরেছিল তা ৩রা তারিখের একটি পত্রাংশে উদ্ঘাটিত ঃ

"পওহারীজীর সঙ্গে আর দেখা করিতে কয়েকদিন যাইতে পারি নাই, কিন্তু তাঁহার বড় দয়া ; প্রত্যহ লোক পাঠাইয়া খবর নেন। কিন্তু কখন দেখিতেছি 'উলটা সমঝ্লি রাম!' কোথায় আমি তাহার দ্বারে ভিখারী, তিনি আমার কাছে শিখিতে চাহেন। বোধহয় ইনি এখনও পূর্ণ হয়েন নাই, কর্ম এবং ব্রত এবং আচার অত্যন্ত, এবং বড় গুপ্ত ভাব।" (ঐ, ৬/৩১৯)।[২]

সন্ধানের দীর্ঘপথ অতিক্রমণের পর আসে বহু প্রত্যাশিত সিদ্ধি এবং সেই সিদ্ধির পথ দেখিয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ ; পওহারী বাবা বা অন্যকোন মহাপুরুষ নন। ১৮৯০-এর ৩ রা মার্চের চিঠিতেই স্বামীজী লিখেছেন—"আর কোন মিঞার কাছে যাইব না—আপনাতে আপনি থেকো মন......

তখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে Intense Sympathy বদ্ধ-জীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই।"

প্রশ্ন জাগতে পারে, স্বামী বিবেকানন্দ হঠাৎ এই মত পরিবর্তন করলেন কেন? এর পেছনে কি কোন বুদ্ধিগত যুক্তি ও বিচার ক্রিয়াশীল ছিল, না কোন আধ্যাত্মিক প্রেরণা! প্রমাণিত হয়েছে স্বামীজীর জীবনে দ্বিতীয়টিরই ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। এ প্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দের জীবনীতে পাচ্ছি...

"গাজীপুরে কিঞ্চিদধিক দুই মাস থাকা কালে আরও একটি অপূর্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাতে শ্রীশ্রী ঠাকুরের সহিত স্বামীজীর অলৌকিক সম্বন্ধ স্ফুটতর রূপে প্রকটিত হইয়াছিল এবং উহার ফলে গাজীপুরে থাকার মূল প্রয়োজন—অর্থাৎ বাবাজীর নিকট সাধনমার্গের উপদেশ লাভ অকিঞ্চিতকর প্রমাণিত হইয়াছিল। ঘটনাটি প্রাণস্পর্শী ও অতীব গুরুত্বহীন। বাবাজী যখন স্বামীজীকে রাজযোগ শিক্ষা দিতে এবং স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে সম্মতি হইতেছিলেন না, তখন একদা স্বামীজী ভাবিলেন, হয়তো বা বাবাজীর নিকট দীক্ষা লইলে পথ সুগম হইতে পারে। পূর্ণতার জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা তখন তাঁহার মনে এতই প্রবল যে, এজন্য তাঁহার নিকট কিছুই অসাধ্য ছিল না। সংকল্প যখন স্থির হইয়া গেল এবং পরদিনই দীক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন, তখন ঐ রাত্রে উদ্যান বাটীতে একাকী এক খাটিয়ায় শুইয়া এইসব কথাই ভাবিতেছিলেন। এমন সময় সহসা তাঁহার কক্ষ এক দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল, আর তিনি চাহিয়া দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে সশরীরে উপস্থিত তাঁহার সস্নেহ অথচ বেদ্‌না ভরা ছলছল চক্ষু দুইটি তাঁহারই নয়নপরি নিবদ্ধ। স্বামীজী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তাঁহার সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত ও ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, আর তাঁহার বাক্ স্ফূর্তি হইল না। মন তখন আত্মগ্লানিতে পূর্ণ ও নয়নযুগল অশ্রু ভারাক্রান্ত। অতএব দীক্ষার দিন আপাততঃ স্থগিত রহিল। তবু মনের দ্বন্দ্ব দূর হইল না। দুই একদিন পরেই আবার সেই সংকল্প উদিত হইল ; কিন্তু পুনর্বার শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু ঘটিল যাহা স্বামীজী কোনদিন প্রকাশ করেন নাই। এইরূপ পাঁচ-ছয় বার ঘটিবার পর স্বামীজীর মন হইতে ঐ ইচ্ছা সম্পূর্ণ মুছিয়া গেল। আর শ্রীশ্রীঠাকুর যেরূপ সর্বদাই তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত ছিলেন, পরবর্তীকালের জন্য তেমনি চিরবিরাজমান রহিয়া গেলেন, সেখানে আর কাহারও প্রবেশের অবকাশ ঘটিল না।"[১]

৩ রা মার্চ প্রমদাবাবুকে স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছেন—"বাবাজীর তিতিক্ষা অদ্ভুত, তাই কিছু ভিক্ষা করেতেছি, কিন্তু উপর হস্তের নামটি নাই, খালি গ্রহণ খালি গ্রহণ। অতএব আমিও প্রস্থান।" পুনশ্চ দিয়ে ঐ চিঠিতেই লিখেছেন—"আর কোন মিঞার কাছে যাইব না।........এখন সিদ্ধান্ত এই যে.....রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি আর সে অপূর্ব অহেতুক দয়া, সে প্রগাঢ় সহানুভূতি বদ্ধজীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই।"

১. যুগনায়ক (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৭৮—৭৯

সাধনার পর্যায়ের এই প্রাক্তন ঘটনাকে স্মরণ করে অনেক দিন পরে স্বামীজী 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' নামক কবিতাটি রচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের এই মানসিক বোঝাকে জগতের কাছে জানাতে চাইলেন। গুরু-রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রথম যুগের এই মানসিক টানা-পোড়েনের কথা তিনি বাণীময় করে তুলেছেন যা কাব্যিক সুষমায় অপূর্ব এবং অপরদিকে বিবেকানন্দ-সাধনার ইতিহাসে এই কবিতার গুরত্বও অপরিসীম। কবিতাটির যৎকিঞ্চিত উল্লেখ না করলে আলোচনাটি 'পূর্ণাঙ্গ' হয়ে উঠবে না। একটি জায়গায় লিখছেন—

'ছেলেখেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমাপরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে ;
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,
নির্বাক আনন, ছল ছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে।
অমনি যে ফিরি, তব পায়ে ধরি,
কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি।
তুমি নাহি কর রোষ।
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগলভ্‌তা?

ঐ কবিতাতেই আর একটি জায়গায় স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ পদ-প্রান্তে আত্মসপর্ণের বাণী—

দাস তোয়া দোঁহাকার,
সশক্তিক নমি তব পদে।
........................তব বাণী ঃ
—শুনি সসম্ভ্রমে, দাস তব প্রস্তুত সতত
সাধিতে তোমার কাজ।

"O'r Hill and dale" কবিতাটির জন্ম স্বামীজীর সংগ্রামী সাধনার জীবন থেকে। বস্তুত সাধনার অন্যতর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সংগ্রাম। সংগ্রামী হৃদয় ছিল বলেই তাঁর সিদ্ধি আয়ত্তাধীন হয়েছিল। সেই জীবনসাধনা তথা সিদ্ধির বাণীই এইটি কবিতাটির মূল উপজীব্য। পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য কী সংগ্রামই না তিনি করেছিলেন, তার পরিচয় দেখি এ কবিতায়—

O'r Hill and dale and mountain range
Intemple Church and mosque
In Veda's Bible Al Koran
I had searched for thee in Vain

Like a child in the wildest forest lost
I have cried and cried alone
where art thou gone my God my love
  the echo answered gone.
পাহাড়ে পর্বতে উপত্যকায়,
  গির্জায়, মন্দির, মসজিদে—
  বেদ বাইবেল আর কোরাণে
তোমাকে খুঁজেছি আমি ব্যর্থ ক্রন্দনে।
মহারণ্যে পথভ্রান্ত বালকের মতো
  কেঁদে কেঁদে ফিরেছি নিঃসঙ্গ—
তুমি কোথায়—কোথায়—আমার প্রাণ, ওগো ভগবান?
  নাই, প্রতিধ্বনি শুধু বলে, নাই।

গির্জায়, মন্দিরে, মসজিদে, গহন অরণ্যে—পর্বতে-উপত্যকায়, বেদ, বাইবেল-কোরাণে সর্বত্র সেই পরমসত্যকে, সেই পরম ভূমাকে অন্বেষণ করেছেন। আকুল-আর্তি নিয়ে চিৎকার করে কেঁদে ফিরেছেন। শবরীর প্রতীক্ষার মতো বৎসরের পর বৎসর প্রতীক্ষা করেছেন ; আর একনিষ্ঠ জিজ্ঞাসুর মতো প্রশ্ন করেছেন—

Where art thou gone, my God my love ?

স্বামীজী তাঁর সেই সত্যকে পাওয়ার জন্য সে সাধনার দিনগুলোর কথা বলেছেন। কৃচ্ছ্রসাধনের সেইসব দিন-মাস বছরগুলো যে কীভাবে কেটেছে তিনি তা অনুভবও করতে পারেন নি। কত বর্ষ কেটে গেছে করুণ আর্তনাদে। একদিন আলোর দেখা মেলে। অপসৃত হয় তমিস্রা ঘন প্রহর। কে এক দীপ্তিময়ী আলোক বর্তিকা নিয়ে মধুর আশ্বাসের সুরে ডাক দেয় 'পুত্র, আমার'। কবি বিবেকানন্দ এই অনুভবটিকেই কাব্যিকরূপ দিয়েছেন সুন্দরভাবে—

Till one day midst my cries and groans
Some one seemed calling me
A gentle soft and soothing Voice
That said, "my son," "my son."

সেইদিন থেকে বিশ্বচরাচরের সর্বত্র প্রিয়তমের আনন্দোদ্ভাসিত মধুময় আলোকজ্যোতি পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল—

From that day forth whereever I roam
I feel him standing by
O'r hill and dale high mount and Vale
  Far, Far away and high

Thou speakest in the mother's lay

That shuts the babies eye
'when innocent children laugh and play
I see thee standing by.

শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে এবং আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়েই স্বামীজীর মনে এই উপলব্ধি জাগ্রত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে গাজীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই দৈবসাক্ষাৎ স্বামীজীর মানসিক ঐ বিবর্তনের পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল। আর ঐ মানসিক স্থৈর্যের পরিণাম ও স্বীকৃতি আলোচ্য O'r Hill and dale and mountain range' কবিতা।

বিবেকানন্দের ইংরেজি কবিতার সমালোচনা

বিবেকানন্দের 'The song of the free' কবিতার রচনাকাল ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫ এবং এর কয়েকমাস পরেই লেখেন 'The song of the Sannyasn' কবিতাটি (জুলাই, ১৮৯৫)। দুটি কবিতায় ভারতীয় বেদান্তদর্শনের ভাবালোক বাণীরূপ লাভ করছে। এছাড়া, স্বামীজীর মনে আচার্য শঙ্করের প্রভাবের ফলস্বরূপ এ কবিতার জন্ম—এ কথা বললেও অত্যুক্তি হবে না। শঙ্করের প্রজ্ঞা বিবেকানন্দ প্রচারিত বেদান্তদশ৪নের ভিত্তি। তাঁরও ছিল অসাধারণ প্রজ্ঞা, আর সঙ্গে অন্বিষ্ট হয়েছে সাহিত্যপ্রতিভা। ভাষা হোক না কেন বিদেশি, ভাব-ভাবনাটি তো তাঁর আত্মিক, তাঁর স্বদেশের স্বধর্মের। সুতরাং ভাষার মারফৎ পাশ্চাত্য জগৎ পেল এক অনাস্বাদিত কবিতার রস যা ঊনিশ শতকের পূর্বে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে ছিল দুর্লভ।

'The song of the free' কবিতায় জীবন্মুক্ত সাধকের নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়ের স্বরূপ বাণীরূপ পেয়েছে। ভারতীয় সাধকের চরম পাওয়ার সঙ্গে মিলিত হয়েছে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় এবং তা কবির অনন্য বাণীভঙ্গির সঙ্গে মিলিত শক্তি ও সৌন্দর্যের তুলিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে ঋক্ মন্ত্রের মতোই। নিঃসন্দেহে এই পর্যায়ের কবিতা ইংরেজি সাহিত্যের সম্পদ।

আপাত বাহ্যিক জীবনের অন্তরালে যে আর একটি শুদ্ধ মহাপ্রাণ লুকিয়ে থাকে তার খবর সাধকই জানেন। সাধক কবি তাই বলেছেন—

The cloud puts forth its deluge strength
when lightning cleaves its breast,
when the soul in stirred to its inmost depth
Great ones unfold their best

জীবনে দুঃখ একটি স্বাভাবিকঘটনা। এই দুঃখের ভার মহাজীবনে আরও গভীর। দুঃখ পারাবারের তীরেই দেখা মেলে পরম ঈপ্সিতের। স্বামীজী জীবনে দুঃখের এই পরমমূল্যকে চিরদিন স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে অপরিসীম দুঃখ তিনি পেয়েছিলেন

সেকথা সকলেরই জানা এবং এই দুঃখশেষে তিনি তাঁর পরম ঈপ্সিত বা লভ্য-কেও পেয়েছিলেন। মহাজীবনে মহাদুঃখ ভোগ ঘটে, একথা তিনি নানা উপদেশে ও চিঠিতে বলেছেন—"বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। কাঠ নেড়ে দিলে বেশি জ্বলে, সাপের মাথায় আঘাত লাগলে তবে সে ফণা ধরে। যখন হৃদয়ের মধ্যে মহাযাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় ওঠে, বোধ হয় যেন এ যাত্রা আলো দেখতে পাব না, যখন আশা ভরসা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, তখনই এই মহাআধ্যাত্মিক দুর্যোগের মধ্য হইতে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জ্যোতি স্ফূর্তি পায়। ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে এক ফোঁটা চোখের জল কখনো না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্মা কবে বিকশিত হয়েছেন।"[১]

জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা আসুক,—তা সাদরে গ্রহণ করে, তাকে আত্মসাৎ করে মুক্তির স্বাদ-কে উপলব্ধি করতে হবে। সে কথাই এ কবিতায় ব্যঞ্জিত—

'Let eyes grow dim and heart grow faint
And friendship fail and love betray,
Let fate its hundred horrors send
And clotted darkness block the way.

[স্তিমিত হোক নেত্র, অন্তর মূর্ছিত,
বিফল বন্ধুত্ব.....প্রেম প্রতারণা হোক,
নিয়তি পাঠাক তার ভীতি অগণিত
পুঞ্জীকৃত অন্ধকারে পথ রুদ্ধ হোক।
...অনুবাদ কিরণচন্দ্র দত্ত]

রোষদীপ্ত মূর্তি ধরে জগৎ যতই বাধার সৃষ্টি করুক না কেন, আত্মার মুক্তি এক সময় ঘটবেই। আর যে আত্মা মুক্ত....সে আত্মা পরম ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম। তখন সে বলতে পারবে আমি সে, 'সোহহম্'..........

All natures wear one angry frown
To crush you out...still know, my soul,
you are devine,...March on and on,
Nor right nor left but to the goal !

The books do stop in wonder mute
To tell my nature ;—I am he !
[রোষ-দীপ্তি ধরি আসুক জগৎ
চূর্ণিতে তোমায়—তবু জানিও নিশ্চয়

১. পত্রাবলী ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০০

হে আত্মা, তুমি হে দেব, তুমি সে মহৎ,
মুক্তিই গন্তব্য তব—অন্য গতি নয়।

নিজ প্রতিবিম্ব মোরে নারে সন্ত্রাসিতে,
জেনো স্থির—আমি সেই, সোহহং, সোহহং'।

এই কবিতার আর একটি জায়গায়, বিবেকানন্দ একমোদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের অস্তিত্ব তথা স্বরূপ সম্পর্কে নির্দেশ করেছেন। তিনি অনাদি, কালাতীত। যখন বসুন্ধরা এই সূর্য তারা জন্মায় নি, তখন-ও তার অস্তিত্ব ছিল—

'Before the Sun, the moon, the earth,
Before the stars and comets free,
Before e'en time has had its birth
I was, I am and will be !

আত্মার অবস্থান কোথায়? তার অবস্থান ইন্দ্রিয়-মনের পারে। এ বিশ্বের একমাত্র মহান সাক্ষীও তিনি। তাঁর থেকেই সবকিছু সৃষ্টি আবার তাতেই সব বিলীন—

I am beyond all sense, all thought,
The witness of the Universe !

শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতানুভবের প্রকাশ এই অংশে—

'Not two or many, I't is but one,
And thus in me all ones I have,
I can not hate, I can not shun
My self from me—I can but love !

অনুভূতির যে স্তরে পৌঁছিয়ে কবি বলেছেন "আমি সেই, 'সোহহং' সে স্তরে কবি ও সাধক একাকার।

বিবেকানন্দের অনুভূতির জগতে আচার্য শঙ্করের প্রভাব অপরিসীম। ভারতীয় জীবনদর্শন ও জীবনচর্যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেলে শঙ্করের দর্শনে ও ধর্ম চিন্তার মধ্যে। স্বামীজীর মনন ও অনুভূতির জগতে শঙ্কর ব্যাখ্যাত এই জীবনদর্শন সুদৃঢ় স্থান করে নিয়েছিল। বিশেষ করে এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর জীবনাদর্শ সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটি ধারণা তিনি অতীত ভারতবর্ষের মনন ও সাহিত্য থেকে পেয়েছিলেন। ভারতীয় চিন্তাধারার সন্ন্যাস আদর্শের সেই অন্তরমহিম গাথা তাঁর 'The song of the Sannyasin' কবিতায় সুগম্ভীর ভাষা ও ছন্দে অপূর্ব বাণীরূপ লাভ করেছে। পাশ্চাত্য ভাষায় লেখা এ কবিতায় প্রাচ্য ভাবাদর্শ ঋক্ মন্ত্রের মতোই জলদগম্ভীর ধ্বনিরূপ পরিগ্রহ করেছে।

চিকাগো বক্তৃতার সাফল্যের পর স্বামীজী নানা প্রতিষ্ঠানে আহূত হয়ে দিনের পর দিন বক্তৃতা করে চলেছিলেন। শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে

পড়েছিলেন। প্রয়োজন ছিল তাঁর বিশ্রামের। সেকারণে কিছুদিনের জন্য তিনি বিশ্রাম নিতে এসেছিলেন সেণ্টলরেন্স নদীবক্ষে সহস্রদ্বীপোদ্যানে। অল্প কয়েকজন পাশ্চাত্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য-শিষ্যা তাঁর সঙ্গে ধর্মীয় জীবনযাপন করছিলেন। প্রত্যহ স্বামীজীর পদপ্রান্তে বসে তারা ধর্মপ্রসঙ্গ শুনতেন। স্বামীজী যেসব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তত্ত্বের কথা বলেছিলেন সেগুলি 'Inspired Talks ('দৈববাণী') এ বাণীরূপ পেয়েছে। সর্বমোট সাত সপ্তাহ তিনি সেখানে ছিলেন। এসময় একদিন বিকেলবেলায় ত্যাগের মহিমা ও গৈরিকের অন্তর্নিহিত স্বাধীনতা ও সত্যতার কথা বলতে বলতে স্বামীজী হঠাৎ আলোচনা সভা ত্যাগ করে নিজের ঘরে চলে গেলেন। ঘর থেকে ফিরলেন অনতিবিলম্বে। একটি কবিতা সৃষ্টি হয়ে গেল ঐ সময়ের মধ্যে। বলাবাহুল্য সেদিন স্বামীজী 'The song of the Sannyasin' কবিতাটি রচনা করেছিলেন। ১৮৯৫ এর জুলাই বসন্তকাল এর সৃষ্টি (১৮৯৬ এর ১৫ই জুন থেকে ৭ই আগষ্ট।)।

অনুভূতির সত্য জগৎ থেকে 'The song of the Sannyasin' কবিতাটির জন্ম। ফলে কবিতাটিতে বিষয়ের দিক থেকে মৌলিকত্ব পাওয়া যায়। শৈল্পিক মাধুর্যে-ও কবিতাটি আমাদের আপ্লুত করে। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর জীবন্মক্তির আদর্শের কাব্যরূপায়ণ হিসাবে এ কবিতাটি ভর্তৃহরির "বৈরাগ্যশতক" বা শঙ্করাচার্যের "বিবেকচূড়ামণি"-র পাশাপাশি স্থান পেতে পারে। সর্ববন্ধনমুক্ত এই বৈরাগ্যরই অন্য নাম মুক্তি বা স্বাধীনতা। সমগ্র কবিতাটির মূল সুরই হচ্ছে মানুষের স্বাধীন সত্তার জয়গান—

wake up the note ! The song that had its bearth far off, where worldly taint could never reach ; In mountains, caves and glades of forest deep.....

> উঠাও সন্ন্যাসী, উঠাও সে তান,
> হিমাদ্রি শিখরে উঠিল যে গান
> গভীর অরণ্যে পর্বত প্রদেশে
> সংসারের তাপ সেথা নাহি পশে.....

(স্বামী শুদ্ধানন্দ এ কবিতাটির বঙ্গানুবাদ করেছেন)।

Have thou no home. What home can hold the friend ?

> সুখ তরে গৃহ করো না নির্মাণ
> কোন্ গৃহ তোমা ধরে, হে মহান্
> গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ,
> শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস ;
>
> শুদ্ধ আত্মা যেই জানে আপনারে,
> কোন্ খাদ্য পেয় অপবিত্র ক'রে ?

হও তুমি চল স্রোতস্বতার মতো
স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য প্রবাহিত।
উঠাও আনন্দে উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও সদা এই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

Know thou art that, Sannyasin bold ! Say—
"Om Tat Sat, Om !

প্রতিটি স্তবকের শেষে 'Om tat sat, Om' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে একটি পরম সত্য ব্যঞ্জিত। আচার্য শঙ্করের নির্বাণষটকের ভাব-প্রভাব 'সন্ন্যাসীর গীত'র উপর পড়াটা অস্বাভাবিক নয়। বিদগ্ধ বিবেকানন্দ-গবেষক অধ্যাপক ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ মহাশয় 'সন্ন্যাসীর গীতি'র অভ্যন্তরে শঙ্করের 'নির্বাণষটকে'র ছায়া লক্ষ করে বলেছেন, 'আচার্য শঙ্করের 'নির্বাণষটকের প্রত্যেকটি শ্লোকের শেষে 'চিদানন্দরূপ ঃ শিবোহহম্'—এই মন্ত্রধ্বনি বারবার ফিরে এসে পাঠকচিত্তে যে ধ্যানোপলব্ধির সৃষ্টি করে, 'সন্ন্যাসীর গীতি প্রতিটি শ্লোকের শেষে 'ওং তৎ সৎ ওঁ' উচ্চারণে তেমনি পরম সত্যের ব্যঞ্জনা ধ্বনিত। যতিরাজ শঙ্করের কাব্যসিদ্ধিও আসাধারণ। অনুগামী বিবেকানন্দের আত্মোপলব্ধিমূলক রচনায় তাঁর গভীর প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চারিত।'

'সন্ন্যাসীর গীতি', 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ৩০শে জুলাই স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লিখেছিলেন, "নাম (ব্রহ্মাবাদিন) আর মঠে ('একংসদিপ্রা বহুধা বদন্তি') ঠিকই হয়েছে।.....'সন্ন্যাসীর গীতি' এইটিই তোমাদের কাগজে আমার প্রথম প্রবন্ধ।" ব্রহ্মাবাদিনের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর। ২৮শে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সংখ্যায় 'সন্ন্যাসীর গীতি' প্রকাশিত হয়।

কালানুক্রমিক হিসেবে 'My play done' কবিতাটি এরপর আলোচিত হতে পারে। কবিতাটি নিউইয়র্ক থাকাকালীন লিখে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মুক্তি চেয়েছিলেন, মোক্ষ চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন নির্বিকল্প সমাধি। শ্রীরামকৃষ্ণ খুব স্নেহভরে বুদ্ধিমান শিক্ষকের মতো তাঁকে উপদেশ দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, তোমার কাজ লোক + শিক্ষকের (নরেন শিক্ষা দেবে' শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাটি বারবার মনে আসে)। তোমাকে সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের জন্য কর্ম করতে হবে। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রথম দিন একটি গান শুনিয়েছিলেন 'মন চল নিজ নিকেতনে।' এই একান্ত নিজ নিকেতনের আহ্বান তিনি জীবনের সমগ্র কর্মকোলাহলের মধ্যেও শুনতে পেতেন ; মাঝে মাঝেই সেই আহ্বান বিবেকানন্দের নিভৃতবাসী ধ্যানী সত্তাকে স্পর্শ করে গেছে। গুরুর আদেশকে স্বামীজী কখনোই লঙ্ঘন করেন নি ; কিন্তু মাঝে মাঝেই কর্ম থেকে মুক্তি চেয়েছেন ; হয়তো সে মুক্তি চিরমুক্তি। এ কবিতার একটি জায়গায় তিনি লিখছেন—

Ah. open the gates : to me they open must.
Open the gates of right. O Mother, to me thy tired son.
I Long, oh, long to return, home! Mother, my play is done.

জগন্মাতার কাছে বারেবারেই তিনি আকুল আহ্বান জানিয়েছেন—এই আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-যন্ত্রণামুখর পৃথিবী থেকে মুক্তি পাবার জন্য ; জীবন থেকে মহাজীবনে তিনি চিরশান্তি চেয়েছিলেন—

Rescue me, merciful Mother, from floating with desire ! Turn not to me thy awful Face, tis more than I can bear. Be merceful and kind to me, to chide my foults for bear

take me, O Mother, to those Shores where Strites for ever cease.

বিবেকানন্দের সংগ্রামী চেতনার থেকে চির-আকাঙ্ক্ষিত শান্তির বাণীই এ কবিতার মূল উপজীব্য। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে যাবার দিন যত আসন্ন হয়েছে, শান্তির পিপাসাও তত তীব্রতর হয়ে উঠেছে। জীবনের সমস্ত বেদনা ও সংগ্রামের অন্তরালে স্থির জাগ্রত আত্মার অভয় আলোক তিনি আপন প্রাণে প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লেখা ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯০০ তে খ্রিষ্টাব্দের একটি চিঠিতে লিখেছেন—

I look behind and after
And find that all is right
In my deepest sorrows
There is a soul of light.[১]

কর্মযোগে স্বামীজী বলেছেন—"আদর্শ পুরুষ তিনিই, যিনি গভীরতম নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্রতম কর্মী এবং কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা অনুভবকারী। বাণিজ্যবহুল মহানগরীতে ভ্রমণ করলেও নিঃশব্দ গুহাবাসীর মতো তার মন শান্ত থাকে, অথচ সে মন প্রবল কর্মপরায়ণ।

"Let never more delusive dreams Veil off
thy face from me
My Play is done, O Mother, break my Chains
and make me free !"

"দেখো যেন মিছা স্বপ্নে মা গো তোমার মু'খানি হতে'
আমারে আড়াল নাহি করে,
খেলা মোর হল আজি শেষ শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া দাও।
মুক্ত আজি করো মা আমারে।'

(অনুবাদ ঃ প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধায়)।

১. কবিতাটি ম্যাকলাউড, না ক্রিস্‌চিনকে লিখেছিলেন, তা সঠিক বলা মুস্কিল।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে স্বামী বিবেকানন্দ আর একটি ইংরেজি কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতাটির নাম—'No one to blame.'। স্থান নিউইয়র্ক। কবিতাটিতে জীবন-সত্যের চরম উপলব্ধির কথাই ব্যঞ্জিত। মানুষের জীবনে বত্রিশ-ত্রেত্রিশ বছর বয়স যৌবনের সময়-সীমা। কবি কিন্তু উপলব্ধিগত দিক দিয়ে সেই বয়সে প্রৌঢ়ত্বের অধিকারী। বিবেকানন্দের জীবনের যে উদ্দেশ্য ছিল, আমেরিকার বিজয়-অভিযান তথা সমগ্র বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বজনীন ধর্মরূপে প্রতিপন্নিত করার পর তাঁহার কর্ম-সাধনা অনেকটাই শেষ হয়ে এসেছিলো—এ উপলব্ধি তিনি তখন করছিলেন। তাঁর কর্মের ভাল-মন্দ, সাফল্য-অসাফল্যের জন্য কেউ দায়ী নন, তিনিই সমস্ত কর্মের জন্য দোষী—এ কথা তিনি এ কবিতায় স্বীকার করেছেন। অপূর্ব একটি চিত্রকল্পে তিনি জীবনকর্মের সেই পরিণতির ব্যাপারটিকে এঁকেছেন—

The sun goes down, its crimson rays
Light up the dying day ;
A startled glance I throw behind
And count my triumph shame ;
No one but me to blame.

দিনমণি ডুবে অস্তাচলে,
রেখে যায় রক্ত রাঙা কর,
আলোকিত ক্ষীণ দিনমানে
এই যেন শেষ অবসর।
রাখি আঁখি দেখি সচকিতে
বিজয়ের রাশি পিছে রয়,
জয়ে গণি হীন লজ্জা বলে
আমি ছাড়া দোষী কেহ নয়।

(অনুবাদ ঃ স্বামী জীবানন্দ।)

গীতার কর্মবাদ বিবেকানন্দের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল—একথা তাঁর কর্মময় জীবনই প্রমাণ। জীবন-গঠনের পশ্চাতে সেই কর্মেরই গুরুত্ব বেশি সেকথা বারবার বলতেন নানা উপদেশে। এ জীবনের ভালোমন্দের পিছনে কর্মই দায়ী। ব্যক্তি মানুষই কর্মকর্মের যথোচিত ফল ভোগ করে—এ কথায় তিনি 'No one to blame' কবিতা দ্বিতীয় স্তবকে বলেছেন—Each deed begets its kind ?

Good, bad bad, the stope once set
No one can spot or stem ;
No one but me to blame.

'সো-অহং'—আমি সেই—একথা সাধক কবি বিবেকানন্দ ছাড়া আর কোন কবির

হৃদয়-সাম্রাজ্য থেকে উৎসারিত হতে পারে! 'I am my own embodied past'—অনেকটাই মিষ্টিক জগতের আস্বাদ থেকে উৎপত্তি এ বাণীর। উপনিষদের চিরন্তন বাণী অথবা বেদান্তের ঘনীভূত সত্য এইসব পঙ্‌ক্তিগুলো।

মানুষের জীবনে সমস্ত ভোগের জন্য দায়ী মানুষই। কবি নিজ কর্মের জন্য নিজেকে দায়ী করেছেন। প্রেম দিলে প্রেম ফিরে আসে। ঘৃণা দিলে ঘৃণা—

Love comes reflected back as love,
Hate breeds more fierce hate,
They mete their measures, Lay on me
Through life and death their claim ;
No one but me to blame.

'প্রেমরূপে ফিরে আসে প্রেম
ঘৃণা আনে ঘৃণা তীব্রতর,
পরিমাপ নিজে তারা করে
রেখে যায় ছাপ মোর' পর।
জীবনের শেষে মরণেও
তাহাদের দাবী জমা রয় ;
এই ভোগ.......দায় আমারি তো
আমি ছাড়া দোষী কেহ নয়।'

জীবনের সুখ-দুঃখের মতো অপরিহার্য দিকটিকে তিনি রোমাণ্টিক ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সুখ-দুঃখ একই বৃন্তে গাঁথা। এই বিষয়টিকে নিয়ে একজন ইংরেজ কবি একটি কবিতা লিখেছেন...... 'Joy and woe are woven in fine.' বিবেকানন্দ-ও এই চরম সত্যটিকে অপরূপ কাব্য সুষমায় ব্যঞ্জিত করেছেন—

Good, bad, love, hate, and pleasure, pain
For even linked go,
I drean ol pleasure without pain,
It never, never come ;
No one but me to blame.

ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে জীবন নয়, মহৎ সত্যের দর্শনের মধ্যেই জীবনের পরিপূর্ণতা। সমস্ত দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠে, স্থূল চাওয়া-পাওয়াকে সংকীর্ণ, অর্থহীন জেনে কবি সাধক বিবেকানন্দ চান নির্বাণ। কর্ম শেষে নির্বাণ ; কর্মকে অস্বীকার করে নয়। আবার কর্মকে অতিক্রান্ত করেই নির্বাণ লাভ—

I give up hate, I give up love,
My thirst for life is gone ;

Eternal dcath is what I want.
Nirbanam gocs life's flame ;
No one is left to blame.

'চিরমৃত্যু—ইহাই তো চাই
............নির্বাণ এ জীবন শিখরে,
জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া হচ্ছে নির্বাণলাভ—
'মৃত্যু মহা-অভিশাপ, জীবনেও তাই
শ্রেষ্ঠ বস্তু জানিও নির্বাণ।'

"Who knows How Mother plays' কবিতায় মহামায়া জগৎ-মাতৃকার চরণে আত্মনিবেদনের ভাবটিই প্রকটিত। বিবেকানন্দের চিত্তে একদিকে সংগ্রাম, অন্যদিকে পরমা-শক্তির পাদ-পদ্মে আত্মসমপর্ণের ভাবটি পাশাপাশি স্থান করে নিয়েছে। পৌরুষ ও সমর্পণ—এই দুই বিপরীত ভাবের একীভূত বিবেকানন্দ-হৃদয়। তবুও সবশেষ আশ্রয় মায়ের হৃদয়। তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে জগৎ আলোকিত। অঘটন-ঘটন পটীয়সী মহামায়ার ইচ্ছামাত্র অমোঘ বিধান, দৃষ্টিমাত্রে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়,—সেই অনন্ত শক্তির কণামাত্র বিকাশে মানবের দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত অপার জ্ঞান-সমুদ্র। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা ঘটছে তার পিছনে রয়েছে মায়ের অমোঘ অশনি—

Perchance the child had glimpse
of shades, behind the Scenes,
with eager eyes and strained,
Quivering forms.....ready
To Jump in front and be
Events, resistless, strong.
Who knows but Mother, How,
and where and when, the come ?

হয়তো পড়েছে ধরা উৎসুক করুণনেত্র শিশুর দৃষ্টিতে,
দৃশ্যের আড়ালে কোন ছায়ার সংকেত,
মুহূর্তে যা হ'তে পারে দুর্নিবার ঘটনাপ্রবাহ।
আসে তারা কখন কোথায়, মা ছাড়া কে জানে।

কখন কার হৃদয়ে মা আসন পাতেন তা কে জনে! তিনি কাউকে মুক্তি দেন ; কাউকে আবার সংসারের কঠিন নিগড়ে বেঁধে রাখেন। কবি-ঋষি এই ব্যাপারটিকে অপূর্ব সুষমায় কাব্যরূপ দিয়েছেন—

Who knows. what soul and when,
The mother makes her throne ?
What law would freedom bind ?
What merit guide Her will,
Whose break is greatest order,
Whose will resist less law ?

কে জানে কখন,
কার হৃদি সিংহাসনে
মা আমার পাতেন আসন!
মুক্তিরে বাঁধিবে কোন্ নিয়মশৃঙ্খলে,
ইচ্ছারে ফিরাবে তাঁর কোন্ পুণ্য বলে,
সংসারের শ্রেষ্ঠ বিধি—খেয়াল তাঁহার
ইচ্ছামতি অমোঘ বিধান।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-ভাবনার দুটি দিক বিশেষভাবে প্রতিভাত—একদিকে তিনি চেয়েছিলেন মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তি এবং সেজন্য সমগ্র বিশ্বে আধ্যাত্মিক মুক্তির বাণী প্রচার করেছেন। বিশেষকরে পাশ্চাত্যের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভারতবর্ষের শাশ্বত ধর্ম তথা ভারতচেতনাকে তিনি জড়বৃদ্ধি সম্পন্ন। পাশ্চাত্য-মানুষের মনে সিঞ্চন করার চেষ্টা করেছেন। শুধু ভারতবর্ষকে চেনা নয়, ভারতচেতনার মধ্যেই রয়েছে তাদের মুক্তির বাণী—একথা তিনি বিশ্ব-মননে পৌঁছে দিয়েছেন। অপরদিকে জাতীয় শক্তি বা স্বাধীনতার প্রেরণাও তিনি নানা ভাবে ব্যক্ত করেছেন। স্বদেশ ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তির জন্য তিনি যুবসমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন। যখন যেখানে জাতির মুক্তি ঘটেছে তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। জাতীয় মুক্তি ও আত্মমুক্তি তখন তাঁর চেতনায় আসল মূল্য পেয়েছে। ফরাসী-বিপ্লব, আমেরিকাতে স্বাধীনতা আন্দোলন, ভারতবর্ষের সিপাহী বিদ্রোহ..... জাতীয়-মুক্তির জন্য এইসব ঘটনাগুলো স্বামীজীর কাছে গর্ব ও গৌরবের বস্তু ছিল। বিশ্বের যে প্রান্তেরই মানুষ স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বীর-সন্ন্যাসীর সহৃদয়তা প্রসারিত হয়েছে। ঘোষণা করেছেন "The Histry of the world is the histry of new men who had faith in themselves. That faith calls out the Divinity within. As soon as a man or a nation lose faith in himself death comes. Believe first in yourself, then in God."[১]

আমেরিকার মানুষেরা স্বপ্ন দেখেছিল স্বাধীনতার। স্বাধীনতা তাঁরা পেয়েছিল। স্বামীজী আমেরিকার মানুষের সেই মনুষ্যত্বের সম্মান ও অধিকার বোধ এবং আমেরিকার স্বাধীনতা

১. বাণী ও রচনা ঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭২

আন্দোলনের ইতিহাস গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮৯৮ এর ৪ঠা জুলাই আমেরিকাবাসীদের স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে স্বামীজীর চেতনা থেকে 'To the Fourth of July কবিতাটি বাণীরূপ পেয়েছিলো। সম্ভবত কবিতাটি আগের দিন লেখা। প্রথমবার আমেরিকা থেকে ফিরে কাশ্মীর-ভ্রমণের সময় ভ্রমণসঙ্গী আমেরিকাবাসীদের উদ্দেশ্যে এই কবিতাটি প্রাতঃরাশের সময় উচ্চস্বরে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। কবিতাটিতে সূর্যোদয় ও সূর্যের আকাশ পরিক্রমার রূপকে যুগ-যুগান্তরের স্বাধীনতা পূজারীদের আশা ও আনন্দের অভিব্যক্তি ঘটেছে। পরাধীনতার তমিস্রা ভেদ করে ৪ঠা জুলাইয়ের স্বাধীনতা-সূর্য দেখা দিল ; আর এই স্বাধীনতা-সূর্য অবলোকন করার জন্য যারা দীর্ঘ অপেক্ষায় ছিল, বিশ্বপ্রকৃতি সমস্বরে তাদের অভিনন্দন জানালো—

All hail to thee, thou Lord of Light !
A Welcome new to thee, today,
O Sun ! To day thou. Sheddest Liberty !

এস, এস, এস তুমি, আলোকের ওগো অধীরাজ
তোমারি লাগিয়া আজ অন্তরের স্বাগত আহ্বান।
ওগো সূর্য, আজ তুমি ছড়াইছ মুক্তি দিকে দিকে।[১]

মনন ও আবেগ-এ দুই-ই 'To the fourth of July'.. কবিতায় ব্যক্ত। মুক্তির আগমনে অন্ধকার নির্বাপিত হয়। সমগ্র মানবজাতি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের কীট-পতঙ্গ থেকে সবকিছু মুক্তি চায়। তাই মুক্তির আনন্দের প্রকাশ সর্বত্র। বৈদান্তিক সাধক বিবেকানন্দও মানবজাতির মুক্তিতে বিগলিত। জীবন ও মুক্তি বা মুক্ত জীবন নিয়েই তাঁর কবিজগৎ। মুক্তি যে জীবনের কাছে কত সত্য ও আকাঙ্ক্ষানীয় তা তিনি কবিতার শুরুতে অপরূপ চিত্রকল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন—

Be hold, the dark clouds melt away,
That gathered thick at night and hung
So like a gloomy pall above the earth !
Before the magic touch, the wortd
Awakes.

ওই দেখ মিলাইয়া যায় কালো মেঘপুঞ্জ যত
রাত্রির আঁধারে আরো ঘন করে ধরণীর পরে
তাহারা থমকি ছিল, অবসন্ন বিষাদ কালিমা!
তোমার মোহন-স্পর্শে জগৎ জাগিয়া ওঠে ওই।

১. অনুবাদ : ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্য

মুক্তির জন্য যুগ যুগ ধরে সাধনা চলেছে মানবজাতির সমগ্রবিশ্বে। স্বাধীনতার এই পরম সম্পদ লাভের জন্য মানুষের কতনা আত্মদানের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ। সেইসব চিরস্মরণীয় মহামানব—যাঁদের সাধনা, সংগ্রাম ও দেশপ্রেমের তপস্যার পরিপূর্ণ ফলস্বরূপ স্বাধীনতার আলোকে আজ মানবজাতি অভিষিক্ত। চিরস্বাধীন মানবাত্মার জয়গান কবি-সাধক বিবেকানন্দ করেছেন এ কবিতায়। সমস্ত সার্থকতার মাঝখানেই চিরমুক্তির উপলব্ধি হতে পারে—এ কথাও তিনি বলেছেন। লক্ষ্যণীয়, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, এ স্বাধীনতা কোন বিশেষ জাতি বা দেশের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। তাঁর প্রার্থনা, ৪ঠা জুলাইয়ের এই স্বাধীনতা-সূর্য পৃথিবীর প্রত্যেকটি নরনারীদের পরাধীনতা-শৃঙ্খল মোচন করে উন্নতশির নবজীবনের অধিকার এনে দেবে—

"Move on, O Lord, in thy resist less path !
Till thy high moon O'verspreads the world.
Till every land reflects thy light,
Till men and women, with up lifted head,
Behold their shackles broken, and
Know, in springing Joy, their life renewed !

চল প্রভু, চল তব বাধাহীন পথে ততদিন
যতদিন ওই তব মাধ্যন্দিন প্রখর প্রভায়
প্লাবিত না হয় বিশ্ব, পৃথিবীর প্রতি দেশে দেশে
সেই আলো না হয় ফলিত, যতদিন নরনারী
তুলি উচ্চ শির—নাহি দেখে টুটেছে শৃঙ্খল ভার,
না জানে শিহরানন্দে তাহাদের জীবন নূতন।

পাশ্চাত্য সাহিত্য ও পাশ্চাত্য জগতে এই কবিতাটির মূল্য অপরিসীম। স্বাধীনতার ভাবসত্যটি অরুণোদয় থেকে সূর্য পরিক্রমার গতিময় চিত্রকল্পে সার্থক কাব্যরূপ লাভ করেছে স্বামীজীর এই কবিতায়।

'To An Early Violet' কবিতাটি নিউইয়র্ক থেকে জনৈক শিষ্যকে লিখিত ১৮৯৬-এর ১৫ই জানুয়ারী। বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের, ভক্তদের জীবন ও সাধন সম্পর্কিত নানা উপদেশ চিঠিপত্রের মাধ্যমে যেমন দিয়েছেন, তেমনি কিছু কিছু কবিতার মধ্য দিয়েও সেই হিতোপদেশের কাজটি করেছেন। এই কবিতাটিতে ঐ ধরণের একটি মৌল উপদেশ ক্রিয়াশীল।

জীবনপথে চলার সময় বাধা আসতে পারে, ব্যর্থতা মানুষকে বারে বারে আক্রান্ত করতে পারে, তবু মানুষকে চলতে হবে পূর্ণতার দিকে। সংগ্রামের পথে বাধা আনেক। কঠিন সে পথ, অভিনন্দনের থেকে তিরস্কারই সেপথে বেশি। তবু সে পথ সত্য। আর

সত্যই তো জীবনের মহৎ উপলব্ধি যা মানুষের চির-আকাঙ্ক্ষিত।

জীবন যে সব সময় আরাম-শয্যায় অতিবাহিত হয় তা নয় ; অনেক কুটিল, কঠিন দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়। অন্ধকার রাত্রি পেরিয়েই পূর্ণতার নবীন-সূর্য দেখা যায়। কবি সে কথায় কবিতাটির শুরুতে বলেছেন—

What tough thy bed be frozen earth,
Thy clock the Chilling blast·
What tough no mate to Cheer thy path,
Thy sky with gloom O'ercast ;

তুষার-কঠিন মাটিই না হয় হোক না তোমার শয্যা,
আবরণ তব শীতার্ত ঝঞ্ঝার,
জীবনের পথে নাই বা জুটিল বন্ধুজনার হর্ষ,
ব্যর্থ তোমার সৌরভ বিস্তার।

স্থিতধী, প্রশান্ত চিত্তই মানুষকে পরিপূর্ণ মানবাত্মায় উন্নত করে। সুখে দুঃখে অবিচলিত থাকায় মানুষের কর্তব্য। উপনিষদের সেই 'অভী' মন্ত্র এ কবিতায় শেষ স্তবকে মন্দ্রিত—

Change not thy nature, gentle bloom,
Thou Violet, Sweet and Pure,
But ever pour thy sweet perfume
Unasked, Unstained, Sure !

এমন মহিমময় বাণী পাশ্চাত্য সাহিত্যে দুর্লভ।

'The Living God' কবিতাটি বিবেকানন্দের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি জাত। এটি ১৮৯৭ ; ৯ই জুলাই আলমোড়া থেকে মেরী হেলকে লিখেছেন। বলাবাহুল্য এ কবিতাটি একটি পত্রের অংশ। স্বামীজী অনেক সময় কোন ভক্ত শিষ্যকে চিঠি লিখতে গিয়ে কবিতা লিখে পাঠাতেন যার মধ্য দিয়ে গভীরতর ভাব ব্যঞ্জিত হতো। তেমনই একটি কবিতা 'The Living God'।

গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বভূতেব্রহ্ম-উপলব্ধি এই স্তবকে ব্যঞ্জিত। ব্রহ্মোপলব্ধি ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য, দৃশ্য-অদৃশ্য-সর্বত্র লক্ষ করা গেলে তবেই সে পরিপূর্ণ মানব । এ সব কবিতায় ভারতীয় আধ্যাত্মিক বাণীটিই ব্যক্ত।—

He who is in you and outside you,
Who works through all hands,
who walks on all feet,
Whose body are all ye,
Him worship and break all other idols !

আর একটি তত্ত্ব এ কবিতায় পরিব্যাপ্ত। নরের মধ্যেই নারায়ণ। উপলব্ধি—যে সত্যকে

বিবেকানন্দ গুরু রামকৃষ্ণের জীবনচর্যার মধ্যে পেয়েছিলেন, যা তিনি নিজ জীবনেও অনুসরণ করেছিলেন সেই সব নতুন বাণী কাব্যরূপ পেয়েছে এ কবিতায়।

শেষের স্তবকে লিখেছেন—

Ye fools ! Who neglect the living God,
And his infinite reflections with which the
world is full.
While ye run after imaginary Shadows,
That lead alone to fights and quarrels,
Him worship, the only visible !
Break all other idols !

ওরে মূর্খদল !
জীবন্ত দেবতা ঠেলি,
অবহেলা করি
অনন্ত প্রকাশ তাঁর এ ভুবনময়
চলেছিল ছুটে মিথ্যা মায়ার পিছনে
বৃথা দ্বন্দ্ব কলহের পানে—
কর তাঁর উপাসনা, একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা,
ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল প্রতিমা।[১]

ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের মধ্যেই করতে হবে ; মানুষকে ত্যাগ করে নয়। মানুষই প্রত্যক্ষ দেবতা। জরা-জীর্ণ সংস্কার, প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান এগুলো বাহ্যিক ব্যাপার। বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আত্মসত্যের যোগে যে একাত্ম-অনুভূতি, সেক্ষেত্রে তিনি ভারতের সনাতন ভাবধারার উত্তর-সাধক। ব্যষ্টিগত মুক্তি সাধনাকে সমষ্টির মুক্তি সাধনায় পরিণত করার সঙ্কল্পে তিনি বুদ্ধের মহাকরুণার অধিকারী।—কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বেশি প্রেম ও অনুরাগ দরিদ্র, মূর্খ, পাপী, লাঞ্ছিতের প্রতি। সেজন্য বারে বারে তিনি এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। তাই তিনি বলেছেন—

"May I be born agian and again and suffer thousands of miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in—the sumtotal of all souls ; and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races, of all species is the special object of my worship."

একটি ক্ষুদ্র কবিতা 'Light'. আয়তনে ছোট হলেও, একটি গভীর ভাব এ কবিতায়

১. অনুবাদ ঃ ৬ প্রণব রঞ্জন ঘোষ।

ব্যঞ্জিত। অন্ধকারের মধ্যেই রয়েছে চিন্ময় আলোক, বেদনার গভীরেই রয়েছে আনন্দের অসীম বারতা। যে জীবন বেদনা গভীর, সে জীবন চিন্ময় আলোকের সন্ধান পায়। বেদনার গভীরেই স্রোতসিনীর মতো প্রবাহিত শান্তির আলোক-বর্তিকা।—

I Look behind and after
And find that all is right
In my deepest sorrows
Thare is a soul of light.

উপনিষদ-চেতনাপুষ্ট ভাব কাব্যরূপ পেয়েছে এ কবিতায়। পরিপূর্ণতার পথে সবসময় রয়েছে গভীর বেদনা। সব বাধা, সব ব্যথা পেড়িয়ে তবেই আত্মা আলোকিত হয়। স্বামীজীর জীবনে শেষ রাগিনীর বীণ যখন থেকে বাজতে শুরু করেছে, শান্তির পিপাসাও তত তীব্রতর হয়ে উঠেছে। জীবনের সমস্ত বেদনা ও সংগ্রামের অন্তরালে স্থির জাগ্রত আত্মার অভয় আলোক তিনি আপন প্রাণে প্রত্যক্ষ করেছেন। 'Light' কবিতাটিও একটি পত্রের অংশবিশেষ। ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এটি মিস কৃস্টিনকে লেখেন।[১]

মনের উর্ধ্বে আত্মা, চেতনার গভীরে সূক্ষ্ম আত্মা। শুভ আত্মা মানুষকে পথ দেখায়, নিয়ন্ত্রিত করে। কবির আত্মাও কবিকে চিরকাল জীবনসংগ্রামে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছে। ফলতঃ আত্মার ক্রিয়াশীলতায় কবি গভীর বিশ্বাসী। সেই উদ্দেশ্যেই বিবেকানন্দের কিছু প্রার্থনা 'To my own soul করিতায় ব্যক্ত।

কবি-আত্মা কবিকে জীবন-পথে অনেক দূর নিয়ে এসেছে ; আরও কিছু কাজ বাকি। সুতরাং কবি সেই আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান না। কবিতার শুরু হয়েছে ঐ কথা দিয়েই—

Hold yet a while, strong heart,
Not Part a lifelong yoke
Though blighted look the present, Future gloom.

ধরে থাকো আরো কিছুকাল, অটল হৃদয়,
ছিন্ন ক'রো নাকো এই আজন্ম বন্ধন
যদিও অস্পষ্ট ক্ষীণ এই বর্তমান—ভবিষ্যৎ ঘনতমোময়।

১. বাণী ও রচনায় মিস ম্যাকলাউকে স্বামীজী লিখেছিলেন—এরকম লেখা আছে। কিন্তু The complete works of Swami Vivekananda (Subsidized Edition)—Volume VIII—তে মিস কৃস্টিনকে স্বামীজী ঐ চিঠিটি দিয়েছিলেন একথা লেখা আছে। আমরা Subsiduzed Edtion.—এরটি গ্রহণ করলাম।

আত্মা ও কর্মের অভিন্নতায় জীবন সংগ্রামের অনেককাল কেটেছে। বিজ্ঞ পরিচালকের মতো সূক্ষ্ম আত্মা বিবেকানন্দের জীবনসাধনার প্রতিটি মুহূর্তে পথ-নির্দেশ করেছে। সে আত্মা পরমাত্মা অথবা ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়—

Reflector true—thy pulse so timed to mine,
thou perfect note of thoughts, however fine—
Shall we now part, Recorder, say ?
in thee is friendship, faith,
For thou didst warn when evil thoughts were brewing—
And though, alas, thy warning thrown away,
went on the same as ever—good and true.

বিবেকানন্দের কর্মযজ্ঞের সঙ্গী, আমেরিকা ভ্রমণের পার্শ্বচর, সর্বোপরি স্বামীজীর দিব্য-বাণী ও বক্তৃতার রূপকার গুডউইনের অকালমৃত্যু স্বামীজীর জীবনে একটি বিশেষ দুর্ঘটনা। তবুও ঐ দুর্ঘটনাকে তিনি কী গভীর প্রশান্তির মধ্য দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন 'Requiescat in peace' কবিতীয় তা ব্যক্ত। কবিতাটি শোকার্ত গুডউইন-জননীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিল। ইংরেজি এলিজি ধরণের রচনা এ কবিতাটি প্রিয় শিষ্যের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কবির আশীর্বাণী। কবিতাটির রচনাকাল আগষ্ট, ১৮৯৮।

কবি ভারতীয় চেতনালোক থেকে মৃত্যুকে উপলব্ধি করে বলেছেন, আত্মার মৃত্যু নেই। দেহাবসানের পর শুভ-আত্মা পরমাত্মায় গিয়ে মিলিত হয়। গুডউইনও সমস্ত রকম পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করে অপার্থিব আনন্দ নিকেতনে যাত্রা করেছেন যেখানে সদা-সর্বদা শান্তি বিরাজিত। কবিতার শুরু সেই আনন্দ নিকেতনের পরিচয় দিয়ে—

Speed forth, O soul ! upon thy Star—Strewn Path ;
Speed, blissful one ! Where thought is ever free
Where time and space no longer mist the view,
Eternal Peace and blessings be with thee !

বিবেকানন্দও তাঁর বিজয় অভিযানের শেষে কি এই শান্তি পেয়েছিলেন না? সেই উর্ধ্বলোকে কী আনন্দ! কী আনন্দ!

গুডউইনের মতো স্বার্থত্যাগী মানুষ পৃথিবীতে দুর্লভ। সেবা ও ত্যাগ ছিল তাঁর জীবনের পরম ধর্ম। সেকথাও স্বামীজী এ কবিতায় স্বীকার করেছেন। এমন বিশাল হৃদয় কোটিকে গুটিক। সেই অমর-আত্মাকে দেশ-কাল-আচরণ কোন কিছুই ঘিরে রাখতে পারে না। তাঁর যাত্রা অসীমলোকে ; সেখান থেকেই সিঞ্চিত করো অশেষ বাণী, আশার আলোক। সংসার সংগ্রামে আনো প্রীতির সহায়—

The bonds are broke, thy quest in bliss is found
And one with that which comes as Death and Life ;
Thou helpful one ! Unselfish e'er on earth,
Ahead ! Still help with love this world of strife !

টুটছে বন্ধন তব, পেয়েছে সে আনন্দ সন্ধান,
জন্মমৃত্যুরূপে যিনি, তার সাথে হলে এক প্রাণ,
তুমি যে সহায় ছিলে, স্বার্থত্যাগী চির এ ধারায়,
আগে চল, সংসার-সংগ্রামে আনো প্রীতির সহায়!

'Anglcs Unawarcs' কবিতাটি স্বামীজীর রচনা করেন নভেম্বর ১৮৯৮-এ। রচনার নির্দিষ্ট তারিখ পাওয়া যায় নি। 'অজানা দেবতা' নাম দিয়ে কবিতাটি অনুবাদ করেন অধ্যাপক ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ।[১] কামনা-বাসনা জর্জরিত স্থূল জীবন থেকে সূক্ষ্ম মোহমুক্ত জীবনে উত্তরণের ইতিহাস এ কবিতায়। কবিতাটিতে স্বামীজী তিনটি চরিত্রের রূপরেখায় মানবজীবনে দুঃখ ও কলঙ্কের গভীরতর সার্থকতা ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষের স্খলন পতন ত্রুটি আত্ম স্বরূপের আবরণমাত্র। অনেক ক্ষেত্রেই অধঃপতনের মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি বিকাশের সহায়তাই হয় ; পঙ্কের মাঝ থেকে পঙ্কজকে পাওয়ার গভীর সার্থকতা রয়েছে। পাপী মানুষকে বিবেকানন্দ কখনই ঘৃণার চোখে দেখেনি। এ ব্যাপারে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মা-সারদার সার্থকতম উত্তরসূরী। শ্রীমার কাছে। শরৎ-ও যা, আমজাদই তাই। বৈশ্য রমণীকে তিনি সযত্নে খাইয়াছেন, এমনকি তার কাপড়ও পরিস্কার করে দিয়েছেন। এঁরা সকলেই সর্বজীবের অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম স্বরূপে বিশ্বাসী ছিলেন, 'পাপী' বলে কাউকে চিহ্নিত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিবেকানন্দ এ প্রসঙ্গে বলেছেন— "Ye divinities on earth—Sinncr ? It is sin to call a man so ; it is a standing libel on human nature [চিকাগো ধর্মমহাসভায় ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ তারিখে প্রদত্ত 'হিন্দুধর্ম' নামে লিখিত ভাষণ।]

দুঃখ, দারিদ্র, বেদনা, স্থূল ভোগবাসনা প্রভৃতিকে অতিক্রম করেই পূর্ণতার সঙ্গে একীভূত হয়। স্থূল জীবনের উপর মানুষের আকর্ষণ গভীর। কিন্তু এই জীবনে ক্লান্তি ছাড়া আর বিশেষ আছে কি! —বিবেকানন্দের মনে এই উপলব্ধি 'Angles unawares' কবিতার প্রথম স্তবকেই বলেছেন—

One bending low with load of life—
That meant no joy, but Suffering harsh and hard—
And wending on his way through dark and dismol paths
Without a flash of light from brain or heart.

অবশেষে ভালোমন্দ সুখদুঃখ জন্মমরণের প্রান্তিকসীমায় অকস্মাৎ কোন পুণ্য রজনীতে অপরূপ জ্যোতিরেখা উদ্ভাসিত হয় শুষ্ক হৃদয়ে—

Saw, one blessed night, a faint but beautiful ray.
Decend to him.

এই অপার্থিব জ্যোতি ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নন। এই জ্যোতির আর এক রূপ শান্তি।

১. বাণী ও রচনার ৭ম খণ্ডে

দ্বিতীয় পর্যায়ে আর এক শ্রেণী মানুষের কথা বলেছেন যারা স্বাস্থ্য, শক্তি সম্পদে সুরামত্ত। এরা উন্মাদের মতো পৃথিবীকে ভোগ করে চলেছে। স্বার্থ তাদের চোখে। জগৎকল্যাণ লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য আত্মসুখ। তাদের কাছে পৃথিবী অবশেষে বিলাস-কানন মনে হয়। সংসারের ভোগের মধ্যে লক্ষ করে স্থূলতা ও অসারতা। তখন সে তা থেকে শক্তি চায়। তখন সে তা থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু যত সে ছাড়াতে চায়, তত তার বক্ষ জুড়ে আসে। কবি বিবেকানন্দ বলতে চেয়েছেন, সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণা, অশ্রু-বেদনা মানুষের সম্বিৎ-কে ফিরিয়ে আনে। সে পায় বিশ্ব-নিখিলের নৈকট্য—

Then Sorrow came—and wealth and power went—
And made him kinship find with all the human race
In groans and tears and through his friends would lough
His lips would speak in grateful accents—
"O. Blessed Misery !"

শেষ চিত্রে তিনি মানসিক-দুর্বল ব্যক্তিত্বের কথা বলেছেন। দুর্বল চিত্তের মানুষের জীবনে সফলতা দেরিতে আসে। অপরদিকে প্রবৃত্তের স্রোত সেইসব মানুষদের ঘিরে ফেলে। অবশেষে তাদের মনেও পরিবর্তন আসে। মনে হয়, সংসার-তরঙ্গ মাঝে বৃথায় যুদ্ধ খেলা চলছে। সংসার মনে হয় গ্লানিময়, ক্লেদাক্ত। সংসার-সমুদ্রপারে যে অনন্ত শান্তি, তার হাতছানি পায়। সংসারকে পশ্চাতে ফেলে আলোক-রশ্মির আবর্তে জড়িয়ে জীবন ধন্য হয়। কবি এই কবিতার শেষ পর্যায়ে বলতে চেয়েছেন মানুষই পারে তাঁর প্রকৃতিকে জয় করতে ; জড় পদার্থ নয়।—

That stones and trees ne'er break the law,
But Stones and trees remain ; that man alone
Is blest with power to fight and conquer Fate,
Transcending bounds and laws.
From him his passive nature fell and life appeared
As broad and new and broader, never grew,
Till light ahead began to break, and glimpse of that
Where peace Eternal dwells—Yet one can only reach
By Wading through the Sea of struggles—Courage-giving Came.

স্বামীজীর জীবনচেতনায় সংগ্রাম ও বেদনা দুটি বিশেষ দিক। এ দুয়ের মধ্য দিয়েই মানুষ মহত্তর উপলব্ধির জগতে পৌঁছায়। ব্যক্তিগত জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে আবার কোনো কোনো মানুষ জীবনের বেদনার দিকটিকে বেশি করে উপলব্ধি করেন। নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ একদা এই বেদনাবোধকে মহত্ত্বের একটি আবশ্যিক লক্ষণরূপে নির্দেশ করেছিলেন। ইন্দ্রিয়গত সব সুখেরই সহজ অবসানের বাস্তবসত্য তাঁদের মনে করিয়ে

দেয়—"The whole life is only a swan song."[১] এই বেদনার মূল্যে জীবনের সত্যকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে দুঃখবাদী মনোভাবের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, দুঃখের জীবনের নেতিবাচক দিকটির পরাজয় স্বীকারেরেই অভিব্যক্তি। বিবেকানন্দের কাছে এই 'দুঃখ-চেতনা' সাময়িক বা সংসারিক ক্ষয়ক্ষতির নিরিখে বিচার্য নয়, জীবনের সুখ দুঃখ-কলরোলের অন্তরালে যে চিরন্তন অতৃপ্তি বিশ্বমানবের হৃদয়ধর্ম, বিবেকানন্দের বেদনাবোধ সেই অনন্ত দীর্ঘশ্বাসের সৃষ্টি।[২]

জীবন-আকাশে কিছুকাল মেঘ জমে, দুঃখ-যন্ত্রণার বারিপাত ঘটে ঠিকই ; কিন্তু একদিন নোতুন সূর্য আবির্ভূত হয়। দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই কর্তব্য-কর্ম করে যেতে হবে। হতাশ হয়ে পড়লে চলবে না ; ব্যর্থ হবে জীবন-সংগ্রাম। সুতরাং কর্মীকে, বীরকে পূর্ণতার অপেক্ষায় থাকতে হবেই। 'Hold on yet a while, Brave Heart' কবিতায় বিবেকানন্দ সেকথায় বলতে চেয়েছেন। চিঠিটি খেতড়ি-মহারাজকে-কে লিখিত।

কবিতাটির শুরুতে কর্মীর উদ্দেশ্যে আশ্বাসবাণী—

> If the sun by the cloud is hidden a bit,
> If the welkin shows but gloom,
> Still hold on yet a while, brave heart,
> the victory is sure to come.

কর্তব্য-কর্মকে স্বামীজী জীবনের মহান আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদেরও এ ব্যাপারে চিঠি-পত্রে, উপদেশ—আলোচনায় অনুপ্রাণিত করেছেন। বিবেকানন্দের কাছে জীবনের মহত্তম কর্ম মানবকল্যাণ। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়/অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ—রবীন্দ্রনাথের ঐ জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিবেকানন্দের বাণীর কোন পার্থক্য নেই। সংগ্রামী বীরের মতোই সমস্ত বাধাকেঅতিক্রম করে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। সংগ্রাম ও পূজা বিবেকানন্দ চেতনায় অদ্বৈত, একাকার। পূজা তার অপার সংগ্রাম'—তার এই বাণী মন্ত্র-সমান। এই সংগ্রাম মানুষের মুক্তির জন্য ; সে মুক্তি জীবন্মুক্তি ; বদ্ধ-আত্মার পরিপূর্ণ মুক্তি ; মানবত্মার মুক্তি। শুভকর্মের জয় একদিন-না-একদিন সুনিশ্চিত, তাতে যত বাধাই আসুক না কেন।

> Not a work will be lost, no struggle vain,
> Though hopes be blighted, powers gone ;
> Of thy loins shall come the heirs to all,
> Then hold on yet a while, brave soul,
> No good is e'er undone.

১. The Master As I saw him : Camp. works of S. Nivedita Vol. I .P. 124 'সমস্ত জীবন শুধু মরণেরই অন্তিম সংগীত'।

২. বিশিষ্ট বিবেকানন্দ সমালোচক ড. প্রণবরঞ্জন ঘোষ তাঁর 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য' গ্রন্থে (১৮৩—৮৪ পৃঃ) উক্ত মন্তব্য করেছেন।

কবিতার এই আশ্বাস-বাণী চিঠিটিতে ব্যক্ত। গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের চিঠি-পত্রে ব্যক্ত অভয়বাণী কী অসীম প্রভাব ফেলেছিল সে সম্পর্কে অখণ্ডানন্দ লিখেছেন ঃ "বোধ হয় উহা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের কথা। সেই সময়ে আমাদের পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজ আমেরিকা মহাদেশে বেদান্তের বিজয়-নির্ঘোষে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ভারতের অতুল বৈভবে জগৎকে বিমুগ্ধ করিতেছিলেন! সভ্য জগতের সকলেই তাঁহার মুখে ভারতের অতুল মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অন্য চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।.......স্বদেশের ও স্বজাতির পূর্ব গৌরবকাহিনী বিবৃত করিয়া তিনি যেন পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে মুগ্ধ করিয়া স্বয়ং বিমুগ্ধ হইতেন, তাহার বর্তমান দুর্দশা প্রত্যক্ষ করিয়াও আবার তেমনি ব্যাকুল হইতেন এবং না জানি বিরলে বসিয়া কত অশ্রুই বিসর্জন করিতেন।....যে মহান দুঃখ প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি সুদূর পাশ্চাত্য দেশে গিয়া তাহার কল্যাণ সাধনে রত হইয়াছিলেন, আমিও যথাশক্তি পর্যালোচনা করিয়া চতুর্দিকে সেই একই দুঃখেরই জীবন্ত বিরাট মূর্তি দেখিতে পাইলাম। সেইদিন হইতেই আমার কর্তব্যজ্ঞান ও জীবনের লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্নতা ধারণ করিল এবং আমার হৃদয়ে যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল পূজ্যপাদ স্বামীজীকে আমি তাহা অতি বিশদভাবে পত্রদ্বারা জ্ঞাত করিলাম। এরূপ অবস্থায় তাঁহার আজ্ঞা ব্যতিরেকে আমি যে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিব না, তাহা নিশ্চয় জানিয়া তাঁহাকে অতি সরলভাবে আমার অভিপ্রায় লিখিয়া জানাইলাম। আমার এই অকিঞ্চিত-কর জীবনের দ্বারা এই বিপন্ন জনসমাজের কিছুমাত্র সেবা হইতে পারে কিনা এবং সন্ন্যাসী হইয়া আমার পক্ষে এরূপ কার্য সঙ্গত হইবে কিনা, জানিবার জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার পত্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এক একবার হইাও মনে হইত, বুঝিবা তিনি আমাকে এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়া কেবল অধ্যাত্ম চিন্তায়ই রত থাকিতে উপদেশ করিবেন। কিন্তু কী আশ্চর্য যে, তিনি আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া যে অমিয় আশ্বাস ও অভয় বাণীতে আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন এবং যে সকল অমোঘ বাক্যে তিনি আমাকে দুঃস্থ ও জনসমাজের সেবায় জীবন গঠন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার মনে হইল যেন আমার প্রত্যেক কথাটি পৃথিবীর অপরদিক হইতে বজ্রনিনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া আমার হৃদয়ে মহাশক্তির সঞ্চার করিয়া দিল। দুর্বল সুপ্ত হৃদয় যেন বহুকালের পর মহাবল ধারণ করিয়া জাগরিত হইল। তাঁহার পত্রের যে কয়েকটি কথার মহাশক্তিতে আমার জীবনের স্রোত সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে ধাবিত হইল, তাহারই কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহার অভয়বাণী শ্রুত না হইলে আমার সংকল্পমাত্রই সার হইত এবং তাহা কখন কার্যে পরিণত হইত কিনা সন্দেহ। স্বদেশের দুঃখে পূজ্যপাদ স্বামীজীর হৃদয় যে কতদূর কাতর ছিল এবং তাহার দুঃখ মোচনের জন্য তিনি কিরূপ ব্যাকুল হইতেন, তাঁহার মহান জীবনের প্রত্যেক কার্যেই আমরা তার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি।......তাঁহার পত্রের যে কয়েক পঙ্‌ক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতেই

যে মহাশক্তি নিহিত আছে তাহা আর কাহারও বাক্যে সম্ভব না। "বহুজনহিতায়" ও "বহুজনসুখায়" জীবন পণ করিয়া কার্য করিতে তিনি যে কেবল আমাকেই উপদেশ দিয়েছিলেন, তাহা নহে, প্রত্যুত তিনি সকলকেই সেই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কার্য করিতে এবং আত্মত্যাগই যে মনুয্যত্বের পূর্ণতা ও চরম লক্ষ্য তাহাই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।"[১]

বিবেকানন্দের 'Hold on ye a while, Brave Heart' কবিতায় অখণ্ডানন্দ-কে যে উপদেশ পত্রাকারে দিয়েছেন তা কাব্যিক রূপ পেয়েছে অনুভূতির গাম্ভীর্যে ও রসময়তায়।

বিবেকানন্দের 'kali the Mother' কবিতাটি ইংরেজি সাহিত্যের সম্পদ। কবি-চেতনার গভীর জগৎ থেকে এ কবিতার সৃষ্টি। প্রত্যয়াণ্বিত ভাব ও স্বচ্ছ-সাবলীল প্রকাশের দিক থেকে কবিতাটি বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান পেতে পারে। কাশ্মীরে ক্ষীরভবানী দর্শনের পর ১৮৯৮, সেপ্টেম্বরে শ্রীনগরে রচিত হয়েছিল। এক অলৌকিক প্রেরণা এ কবিতার উৎসভূমি।

প্রথমবার আমেরিকা থেকে ফিরে অমরনাথ তীর্থযাত্রার পরেই জগৎকারণের মাতৃমূর্তিধ্যান স্বামীজীর হৃদয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল। The Master as I Saw him গ্রন্থের ক্ষীরভবানী অধ্যায়ে ভগিনী নিবেদিতা পরম বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন, আজীবন সুখ-দুঃখের অতীত-লোকের উত্তরণের আদর্শ প্রচার করলেও ঐ সময় দুঃখ-মৃত্যুভয়ঙ্করের মিলিত চেতনাই স্বামীজীর হৃদয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল।

"Worship the terrible ! Worship Death ! All else is Vain. All Struggle is vain. Yet this is not coward's love of death, of the strong man, who has sounded everything to his depths and knows that there is no alternative......."[২]

'ভয়ঙ্করের আরাধনা কর! মৃত্যুর বন্দনা কর! আর সবই বৃথা, সব প্রচেষ্টাই বৃথা। কিন্তু এ ভীরুর মৃত্যুকামনা নয় ; দুর্বলের মৃত্যু-প্রেম নয়, আত্মহত্যা-ও নয়। যে বীর জীবনের প্রতিটি জিনিষকে তলিয়ে দেখেছে এবং বুঝেছে যে, এ ছাড়া আর কোন পথ নেই, এ সেই বীরের আহ্বান.....'

"How few have dared to worship Death, or kali ! Let us worship Death ! Let us embrace the terrible, because it is terrible, not asking that it be toned down. Let us take misery's own sake."[৩]

১. স্বামী বিবেকানন্দের পত্র (ভূমিকা) ঃ স্বামী অখণ্ডানন্দ, উদ্বোধন ১৩১৩ সাল, ৮ম বর্ষ, ১৫ই আষাঢ়, ১১শ সংখ্যা এবং সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের দ্বারা প্রকাশিত 'অঞ্জলি' (১৭৭৬) পৃঃ ১০—১১

২. The Master as I saw thin : Comp. works of sister Nivedita : Vo. I : P. 128

২. Ibid : P 123

'কালী বা মৃত্যুকে ক'জন পূজা করতে সাহস করেছে। এসো আমরা ভয়ঙ্কর বলেই ভয়ঙ্করকে আলিঙ্গন করি, যেন সে ভয়ঙ্করকে নম্র হতে না বলি, এসো দুঃখের জন্যই আমরা গ্রহণ করি।'

দুঃখ-যন্ত্রণা-মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়, বরং একান্ত আত্মসমর্পণ—এমনি মনের অবস্থা যখন, 'Kali the Mother' কবিতার সৃষ্টি ঠিক সেই দিব্য প্রেরণা মুহূর্তে। কবিতাটি রচনাকালীন স্বামীজীর মনের অবস্থা কেমন ছিল তার সাক্ষ্য নিবেদিতার জবানীতে ফুটে উঠেছে—

His brain was teeming with thoughts, He said one day and his finger would not rest till they were written down. It was that same evening that we came back to our house boat from some expedition and found waiting for us, where he had called and left them, his manuscript lines on "kali the Mother". Writing in a fever of inspiration, he had fallen on the floor, when he had finished—as we learnt afterwards—exhausted with own intensity."[১]

বিবেকানন্দের ধ্যানক্ষেত্রে মৃত্যুরূপা মাতার পূর্ণ প্রকাশ 'Kali the Mother' কবিতাটিতে। কবি সাধকের জীবনাদর্শনের কাব্যমূর্তিরূপে এ কবিতাটির প্রতিটি চরণ গূঢ় অর্থবাহক ও ভাবব্যঞ্জক। রৌদ্র ও ভয়ানক রসের সম্মেলনে এমন পরিপূর্ণ বীররসের কবিতা সাহিত্য-জগতে অতি বিরল। কবিতার সূচনায় বিবেকানন্দের চিরপ্রিয় অন্ধকার-বর্ণনা—

In the roaring, whirling wind
Are the souls of a million Lunatics
Just loose from the prison-house,
Wrenching trees by the roots,
Sweeping all from the path.
The Sea has joined the fray,
And Swirls up mountains—waves,
To reach the Pitchy Sky.
The flash of lurid light
Reveals on every side
A thousand, thousand Shades
Of Death begrimed end black—
Scattering plagues and sorrows,
Dancing mad with joy.
Come, Mother, come !

১. The master As I saw Him : Complete works of Sister Nivedita : Vol. I. P. 94

কী অপূর্ব কাব্যকৌশলে মহামায়ার আবির্ভাবকে প্রলয় ঝড়ের পটভূমিকায় বিবেকানন্দ তুলে ধরেছেন। বিবেকানন্দের কবিসত্তার পূর্ণবিকাশ এ কবিতা। পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্য-ও ধন্য। কে আশা করতে পেরেছিল, ভারতীয় চেতনার এমন গভীর উপলব্ধির কথা ইংরেজি-সাহিত্যের পাঠকেরা-ও পেয়ে যাবেন। অথচ এ কবিতা রচনার ইতিহাসে সচেতন শিল্প প্রয়াস কিছুই ছিল না। অনুভূতির এমন অখণ্ড রূপায়ণের দৃষ্টান্তে হিসাবেও কবিতার জগতে এ এক বিস্ময়! প্রলয় ঝড়ের উন্মত্ত তান্ডবের মাঝখানে কবিচৈতন্য মহাশক্তির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে আহ্বান করেছেন "Come, Mother Come." মহাপ্রলয়ের প্রেক্ষাপটে ভূলোক-দ্যুলোক ব্যাপী যে চরম সংগ্রাম চলছে তারই মধ্যে তো রণরঙ্গিনী মায়ের প্রত্যক্ষ প্রকাশ—যে মা দুঃখ-দৈন্য-বেদনা সংগ্রামের সম্মিলিত রূপমূর্তি। একদিকে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রকৃতি, অন্যদিকে নিবিড় অন্ধকার—বিবেকানন্দের ভাবলোকে দুঃখ, ধ্বংস ও সংগ্রামের মিলিত স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে। এই বিপুল ভাবপ্রেরণার আপন স্বধর্ম থেকেই মৃত্যুরূপা মহাকালীর এই অতুলনীয় চিত্রকল্পটি জেগে উঠেছে। তন্ত্রোক্ত কালিকার ধ্যান-গম্ভীর চিত্র স্বামীজীর 'Kali the Mother' কবিতায় উদ্ভাসিত। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট বিবেকানন্দ-গবেষক ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ যথার্থই বলেছেন,—

"তন্ত্রোক্ত কালিকা-ধ্যানে এই মহাকালী-কল্পনা বীজরূপে নিহিত। কিন্তু স্বামীজীর দিব্যকল্পনা এই ছোট্ট কবিতাটির স্বল্পসীমায় জলে স্থলে আকাশে বাতাসে পরিব্যপ্ত মহাপ্রলয় ও রোগ শোক ধ্বংস মহামারীর বিপুল তাণ্ডবের সমন্বয়ে যে জীবনসত্যের উপলব্ধি রূপায়িত করেছে তার ব্যাপকতা ও গভীরতা অচিন্ত্যপূর্ব। সবচেয়ে লক্ষণীয়, কবিতাটির শেষ দুই চরণে এসে এই ধ্বংসরূপিণীর মহাপূজার যে তিনটি উপকরণের কথা স্বামীজী বলেছেন—দুঃখ দৈন্যকে ভালবাসার সাহস, মৃত্যুকে আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষা, ধ্বংস-নৃত্যে যোগাদানের উন্মাদনা—এ যার আছে তারই হৃদয়ে মায়ের আবির্ভাব—'To him the Mother Comes.' বিবেকানন্দের এই মা অভয়াবরদারূপিনী নন, তিনি স্বয়ং মৃত্যুরূপা। তাঁর হাতে 'বিষকম্ভ'-ভরা রোগ-মহামারী সাধারণ মানবদৃষ্টিতে তিনি চরম অমঙ্গলরূপিণী। এই অমঙ্গলের আরাধনাই বীরের সাধনা। দুঃখের জন্যই দুঃখবরণের সাহস—স্বামীজীর বীরত্বের আদর্শ।"[১]

সেই বীরভক্ত মায়ের উচ্চারণ করলেন 'Kali the Molther' কবিতার শেষ পর্য্যায়ে। সেখানে মৃত্যুর আহ্বান মন্ত্রে করালরূপিনীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন উদাত্ত অথচ ধ্যানগম্ভীর প্রেক্ষাপটে—

For Terror is Thy name,
Death is in Thy breath,
And every Shaking Step
Destroys a world for e'er.
Thou "Time", the All—Destroyer !
Come, O Mother, come !

১. বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য : ড. প্রণবরঞ্জন ঘোষ : পৃঃ ১৯৭, তৃতীয় সংস্করণ

Who dares misery Love,
And hug The form of Death,
Dance in Destruction's dance'
To him The Mother comes.

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ ঃ

করালি ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

ভারতীয় মন ও চেতনা জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা-সুখস্বপ্নের সামাধিভূমিতে শিব ও শক্তির বিহারস্থান নির্দেশ করেছে। মৃত্যুর মধ্যে, যন্ত্রণার মধ্যে মহৎ সত্যের উপলব্ধি—এই-ই ভারতচেতনার মর্মবাণী। মৃত্যুর মধ্যে এই অমৃত-উপলব্ধির সাধনায় রুদ্র ও রুদ্রাণীর যে ধ্যান যুগে যুগে সাধকচিত্তে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, বিবেকানন্দের জীবনসাধনায় তাও প্রলম্বিত। 'Kali the Mother' কবিতায় সেই বিশেষ অনুধ্যানের কথায় ব্যক্ত। বিবেকানন্দের -জীবন ও সংগ্রাম—এ যেন চরম সত্য। সংগ্রামের একদিকে যেমন পরাজয় ও হতাশা, অপরদিকে চরম প্রাপ্তি। সেকারণে বিবেকানন্দ সংগ্রাম, পরাজয়, দুঃখ-হতাশা—এগুলিকে মহৎ-জীবনের সম্পদ বলেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে জীবনের পরাজয় ও ব্যর্থতার অসীম মূল্য—

"Never mind failure ; they are quite natural, they are the beauty of life—these failures. What would be life without them ? It would not be worth having if it was not for Struggles. Where would be the poetry of life ?" ব্যর্থতার জন্য দমে যেয়ো না ; এই ব্যর্থতা একান্ত স্বাভাবিক—এরাই তো জীবনের সৌন্দর্য। এদের ছাড়া জীবন কি হয়ে দাঁড়াবে? সংগ্রাম না থাকলে জীবনধারণের কোনো সার্থকতাই থাকত না। কোথায় থাকত জীবনের কাব্য?

স্বামী বিবেকানন্দের সেই সংগ্রামী চেতনার পরিচয় ফুটে উঠেছে প্রিয়শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা একটি চিঠিতে—"আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরতে পারি। কিন্তু মাদ্রাজবাসী যুবকগণ আমি তোমাদের হাতে এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ সমর্পণ করছি।.....প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য হয়ে মরতে পারি. আর একজন এই ভার গ্রহণ করবে। আমরা ধনী বা বড়লোক গ্রাহ্য করি না। আমরা হৃদয়হীন মস্তিষ্কসার ব্যক্তিদের এবং তাদের সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলিকেও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত।

জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পিছনে চেয়ো না। কে পড়ে গেল দেখতে যেয়ো না। এগিয়ে চলো, সামনে এগিয়ে চলো! এমনি করেই আমরা অগ্রসর হব, —একজন পড়বে, আর একজন তার স্থান অধিকার করবে।" (২০শে আগষ্ট, ১৮৯৩)

'Kali the Mother' কবিতায় এ সংগ্রামের পরিচয় নেই ; আছে জগন্মাতার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ। যিনি সকল কর্মের নিয়ামক, তার কাছে নিবেদন ছাড়া তো গত্যন্তর নেই—এই উপলব্ধিই বাণীরূপ পেয়েছে। বিবেকানন্দের হৃদয়ে মহাকালীর ধ্যান জুগিয়েছিল স্বয়ং গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। কিন্তু এই বীরভক্তের দিব্যকল্পনায় ভবতারিণীর অভয়াবরদা মূর্তির চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল সৃষ্টিস্থিতিবিনাসিনী প্রলয়ঙ্করী রূপ। 'Kali the Mother' কবিতায় বিবেকানন্দ-হৃদয়ের এই দিকটিই ব্যাঞ্জিত।

জীবনে দুঃখের তাৎপর্যকে যাঁরা স্বীকার করেন তাঁরা সত্যের উপলব্ধি থেকে দূরে থাকেন না। দুঃখের মধ্যেই মহৎ উপলব্ধি একথা বিবেকানন্দ নানা প্রসঙ্গে বলেছেন। তাঁর কবিতাগুচ্ছতেও তা অব্যক্ত থাকে নি। সত্যই, জীবনে দুঃখকে ক'জন স্বীকার করে নিতে পারে। নিঃসন্দেহে সংখ্যায় তারা অল্প। বিবেকানন্দ ছিলেন সেই অল্প-সংখ্যকের একজন, যিনি জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই দুঃখের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাঁর জীবনদেবতা তাঁর জন্য সহজ সাধনার পথটি উন্মুক্ত রাখেন নি ; জীবনের ক্ষত বিক্ষত পথেই তাঁকে পূর্ণতা পেতে হয়েছিল। বীরভক্তের জন্যই এই দুর্গম পথের সাধনা। এ জীবনে দুঃখ-মৃত্যুরও যে একটি নিজস্ব মূল্য আছে, বেদনা-বিষের পেয়ালাও যে তাঁরই হাতের দান—এ বোধ বিবেকানন্দের চেতনার সঙ্গে অনিষ্ট। এই উপলব্ধির প্রকাশ 'The Cup' কবিতায়।

বাস্তবিকই, দুঃখ-যন্ত্রণা ছাড়া কে পৃথিবীতে মহান হতে পেরেছে। স্বামীজীর ভাষায়—'যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়।' বিবেকানন্দের জীবনসাধনার আদর্শ-উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক বাণী হিসেবে তুলে ধরতে পারি Imitation of Christ-এর সেই বাণী—

"We have taken up the cross, thou hast laid upon us and grant us strength that we bear it upon earth, A men." ক্রুশবিদ্ধ যীশু যুগ-যুগান্তরের মহামানবদের বেদনাবহনের প্রতীক। 'The Cup' কবিতা সেই বেদনারই বার্তাবহ।

'The Cup'-এর চিত্রকল্পটি যীশুখৃষ্টের জীবন-কাহিনী থেকে গৃহীত। খ্রিষ্ট জীবনের শেষ রজনীতে শেষ ভোজনের সমাপ্তির চিত্রটির সঙ্গে The Cup কবিতার পরিকল্পনার সাজুয্য লক্ষ করা যায়। সেই চিত্রটি দেখুন— 'He took up the cup and gave thanks and gave it to them, saying, Drink ye all of it ; for this is my blood for the new testament, which is shed for the remission of sins.'[1]

যীশুর পানপাত্রটি ছিল মানবাত্মার সমস্ত কলুষগ্লানিমোচনের বেদনারক্তে পরিপূর্ণ। চিরকালের সাধকদের উদ্দেশ্যে তিনি এ বেদনারক্ত উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ

১. সেন্ট-ম্যাথু-লিখিত যুগমাচার।

এই বেদনারক্ত পান করেছিলেন। তাঁর জীবনদেবতা যে তাঁকে সেই পানপাত্র তুলে দিয়েছেন, সেকথায় তিনি এই কবিতার শুরুতেই বলেছেন—

This is your cup—The cup assigned
to you from the beginning.
Nay, My child, I know how much
of that dark drink is your own brew

এই তব পানপাত্র, তোমারি উদ্দেশ্যে
সৃষ্টির উন্মেষ হতে এ পাত্র রচনা।
জানি জানি এ পানীয় কালকূট ঘোর,
তোমারি মন্ত্রিত সুরা,[১]

কবির জীবনদেবতা কবিকে চলার জন্য মসৃন রাজপথের সন্ধান দেন নি, দিয়েছেন উপল-বন্ধুর পথ। সানন্দযাত্রার পথ ছিল না বিবেকানন্দের। দুর্গম দুঃসহ পথ ধরেই তাঁকে জীবনে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। জীবনদেবতার নির্দেশেই এ পথে তাঁকে চলতে হয়েছিল। হয়ত কুসমায়িত পথে অনেকেই সেই পরমের সন্ধান পায়, কিন্তু সে পথ কবির নয়। সংগ্রাম ও দুঃখের মধ্য দিয়েই পরমকে পাওয়ার সাধনা শুধু তাঁর—

This is your road—a painful road and drear.
I made the stones that never give you rest.
I set your friend in pleasant ways and clear,
And he shall come like you, unto My breast.
But you, My child, must travel here.
This is your task. It has no joy nor grace,
But it is not meant for any other hand,
And in My universe hath measured place,
Take it.

দর্গম দুঃসহ পন্থা—এই তব পথ,
প্রতিপদে অবিশ্রান্ত উপল-সঙ্ঘাত,
সে আমারি দান। দিয়েছি বন্ধুরে তব
স্নিগ্ধ স্বচ্ছ পথখানি সানন্দ যাত্রার।
তোমারি আশ্রয়। তোমারে চলিতে হবে
এই পথ ধরে ;—এ নির্মম নিরানন্দ
নিঃসঙ্গ সাধন—এতো আর কারো নয়,
এ শুধু তোমার। মোর বিশ্বরচনায়
আছে এরো স্থান। লও এই পানপাত্র।

১. অনুবাদ ঃ ডঃ প্রণব রঞ্জন ঘোষ। বাণী ও রচনা ঃ পৃঃ ৪৭৪, ৭ম খণ্ড।

এ দান গ্রহণের সকলের যোগ্যতা নেই—But it is not meant for any other hand. আবার দুঃখ কী, দুঃখ কেন—এর উত্তর-ও তিনি দেন না। দুঃখের গভীরেই তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব—

I do not bid you understand.
I bid you close your eyes to see My face.

দুঃখ থেকেই পূর্ণতাবোধ, চরম-উপলব্ধি—এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর এক পত্রে লিখেছেন ঃ "বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। কাঠ নেড়ে দিলে বেশি জ্বলে, সাপের মাথায় আঘাত লাগলে তবেই সে ফণা ধরে। যখন হৃদয়ের মধ্যে মহাযাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় উঠে, বোধ হয় যেন এ যাত্রা আলো দেখতে পাব না। যখন আশা ভরসা ছাড়ে, তখনই এই মহাআধ্যাত্মিক দুর্যোগের মধ্য হইতে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্তি পায়। ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপরে শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন?" [পত্রবালী ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০০]

'The Cup' কবিতাটি সেই দুঃখবোধের জ্বলন্ত বাণীরূপ। 'Kali The Mother'-এর পাশপাশি এ কবিতাটিও সমান মূল্য দাবি রাখে। এগুলোকে সামান্যর্থে কবিতা বলা ভুল হবে ; বিশেষ অর্থে এগুলি মন্ত্রসমান। অনুভবের গভীর তলদেশ থেকে এ কবিতার আবির্ভাব। ইংরেজি সাহিত্যে এমন কবিতা সম্পদ বিশেষ।

আমেরিকার স্বাধীনতা-উৎসব উপলক্ষে স্বামীজী লিখেছিলেন 'To the Fourth July,' আর জাতীয় জাগরণের মহামুহূর্তে ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শের জয়গান গাইলেন 'To the Awakened India' কবিতায়। কবিতাটির রচনাকাল ১৮৯৮-এর আগষ্ট মাস। 'Probuddha Bharat' পত্রিকা মাদ্রাজ থেকে আলমোড়ায় স্থানান্তরিত হওয়া উপলক্ষে রচিত।

আত্মস্বরূপের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে জাতীয় জাগরণ—এই বিশেষ দর্শনটি স্বামীজীর মনে সব-সময় জাগরূক ছিল এবং তাঁর কর্মজীবনে কী গভীরভাবেই এই দর্শনটি কাজ করেছিল তা তাঁর জীবনইতিহাস পর্যালোচনা করলেই উপলব্ধি করা যায়। তাছাড়া সুগভীর ইতিহাস ও দর্শন পাঠের ফলে জাতীয়জীবন ও ইতিহাসের মূল সত্যটি তিনি গভীরভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। আত্মিকজাগরণ না ঘটলে জাতীয় জাগরণ কোন ক্রমেই সম্ভব নয়—বিবেকানন্দ তা জানতেন। নেতাজী-শ্রীঅরবিন্দ কি সেই একই পথে অগ্রসর হন নি? এক কথায় এর উত্তর—হয়েছিলেন। শুধু নেতাজী—অরবিন্দ নন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের হোমহুতাসনে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছিলেন—বিশ শতকের প্রথম যুগের সেই বিপ্লবীর দল বিবেকানন্দকে তাঁদের চিন্তানায়ক গুরুর আসন দিয়েছিলেন। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে স্বামীজীর ভূমিকার কথা আজ অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

অতীত ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে ভারতবর্ষের মানুষ একদিন বিস্মৃত হয়েছিল। মধ্যযুগীয় কুসংস্কারচ্ছন্ন জীবনবোধ অক্টোপাসের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল ভারতবর্ষের মানুষকে এই সেদিন উনবিংশ শতাব্দী অব্দি। সেই সঙ্গে ছিল অশিক্ষা ও নিরন্নতা। শাসন-যন্ত্রের ছিল বিকল অবস্থা—ভোগসর্বস্বতা ও চরম স্বার্থপরতা। সেই সুযোগে বণিক ইংরেজ হরণ করেছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। অনেককাল ধরে রক্ত-চক্ষু দেখিয়েছিল। আর ভারতবর্ষের মানুষ হারিয়েছিল তার আত্মিক-শক্তি ; সংগ্রামী শক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামীজী মানুষের আত্মিক-শক্তি জাগানোর গুরু দায়িত্ব নিয়েছিলেন আপন স্কন্ধে। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন সম্পর্কে বলেছিলেন 'নরেন শিক্ষে দেবে'। আসলে সেই শিক্ষা মানুষের আত্মিক-জাগরণের শিক্ষা। স্বামীজী ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে বুঝেছিলেন, 'জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধ্বক্ ধ্বক্ করছে, ওপরে ছাইচাপা পড়েছে মাত্র। সেই সঙ্গে এ ভবিষদ্বাণীও করেছিলেন যে, আলোকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের কালে যেমন গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতা সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়ে মিলিত হয়েছিল, তেমনি "আধুনিক সময়ে পুর্ণবার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল উপস্থিত। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" প্রতীচ্য সভ্যতার রজোগুণাত্মক প্রাণশক্তি ও ভারতীয় জীবনধারার সাত্ত্বিক আদর্শের সমন্বয়ে নতুন ভারতবর্ষ গড়ার স্বপ্ন স্বামীজী দেখেছিলেন। মৃতের মতো নিথর-নিষ্পন্দ জীবন স্বাধীনতা আনতে পারে না। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'। তুমি মৃত নও ; তুমি ঘুমিয়ে আছো ; জাগো—এই ছিল নোতুন ভারতবর্ষ-রূপকারের জাতীয়-উদ্দেশ্যে 'অভী' মন্ত্র—

Once More awake !
For sleep it was, not death, to bring the life
Anew, and rest to lotus-eyes for Visions
Daring yet. The world in need awaits, O Truth !
No death for thee !

জাগো আরো একবার !
মৃত্যু নহে, এ যে নিদ্রা তব,
জাগরণে পুনঃ সঞ্চারিতে
নবীন জীবন, আরো উচ্চ
লক্ষ্য ধ্যান তরে, প্রদানিতে
বিরাম-পঙ্কজ-আঁখি যুগে।
হে সত্য! তোমার তরে হের
প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন,
—তব মৃত্যু নাহি কদাচন।[১]

১. অনুবাদ ঃ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ঃ বাণী ও রচনা ঃ পৃঃ ৪৫৬ ৭ম খণ্ড।

সত্য মৃত্যুহীন প্রাণ। সত্য-মন্ত্র ঘুম ভাঙানিয়া গান। সত্যকে আহ্বান জানিয়ে কবি বলেছেন—'সত্য তুমি জেগে ওঠো ; পুনঃ অগ্রসর হও,—

Resume thy march,
With gentle feet that would not break the
Peaceful rest even of the roadside dust
That lies so low.............

Awakener, ever,
Forward ! Speak Thy stirring words.

হে সুপ্তিনাশন, চিরপ্রাণি—!
ব্যক্ত কর তব বজ্রবাণী।

তৃতীয় স্তবকে কবি মানবজীবনের ক্রমবিকাশের মূল সত্যটিকে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির নিয়মে মানুষ তার জীবনীশক্তিকে ফিরে পেতে পারে। মানুষ তার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সাধনার মধ্য দিয়ে সেই প্রাণশক্তি লাভ করবে—

This is the law—all things come back to the source
They sprung, their strength to renew.

তোমাকে শক্তি দেবে জগত-মাতা উমা। তিনি সর্বকর্মের সারভূতা এবং নিয়ন্ত্রী। তিনি অসীম। অনন্ত। তিনি প্রেমস্বরূপা। তিনি সত্যস্বরূপ। তাঁর আশীর্বাদ থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না। সকলের মধ্যেই তিনি বর্তমান—

The one in All, give Thee untiring
Strength, which is infinite Love.

সত্যের প্রকাশে সমস্ত কালিমা দূরীভূত হয়।—তাঁর প্রেমের জোয়ারে ছায়াস্বপ্ন, অন্ধকার সবকিছু শূন্যতে বিলীন হয়ে যায়। সত্য সর্বত্র 'সে মহিম্নি' বিরাজ করে। সেই প্রেমস্বরূপা কে কবি-প্রাণ আকুল আহ্বান জানিয়ে বলেছেন—

Then Speak, O Love !
Before Thy Gentle voice Serene, behold how
Visions melt and fold on fold of dreams
Departs to void, till Truth and Truth alone
in all its glory shines—

বিবেকানন্দ সমগ্র ভারতবর্ষ প্রবজ্যাকালে ভারতবাসীর যে প্রাণস্পন্দন অনুভব করেছিলেন, পাশ্চাত্য-পরিক্রমার পর সেই অনুভব আরও প্রগাঢ় হয়। বিবেকানন্দের চিত্তে যে ধ্যানের ভারত গড়ে উঠেছিল তার পরিচয় কাব্যমণ্ডিতরূপে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর "India's Message to the world' ('জগতের কাছে ভারতের বাণী') নামক অসমাপ্ত গ্রন্থের ভূমিকায়। ভারত-চেতনার অন্তর্নিহিত সত্তাটি সেখানে উদ্ভাসিত। লিখেছেন,—"দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতা—যা কিছু মানুষের অন্তর্নিহিত পশুসত্তাকে রক্ষা করিবার নিরন্তর

প্রয়াসে বাধা সৃষ্টি করে, যে-সকল শিক্ষা মানুষকে পশুত্বের আবরণ অপসৃত করিয়া জন্মমৃত্যুহীন চির পবিত্র অমর আত্মারূপে প্রকাশিত হইতে সহয়তা করে—এই দেশ সেই সব কিছুরই পূণ্যভমি। এই দেশ—যেখানে আনন্দের পাত্রটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, বেদনায় পাত্রটি পূর্ণতর হইলে অবশেষে এইখানেই মানুষ উপলব্ধি করিল—এ সবই অসার ; এখানেই যৌবনের প্রথম সূচনায়, বিলাসের ক্রোড়ে, গৌরবের সমুচ্চ শিখরে, ক্ষমতার অজস্র প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ মায়ার শৃঙ্খল চুর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছে। এইখানে এই মানবতাসমুদ্রে সুখ দুঃখ, সবলতা ও দুবর্লতা, ধন-দারিদ্র্য, আনন্দ-বেদনা, হাসি অশ্রু, জন্ম-মৃত্যুর তীব্র স্রোত-সংঘাতে, অনন্ত শান্তি ও স্তব্ধতার বিগলিত ছন্দের আবর্তনে উত্থিত হয় বৈরাগ্যের সিংহাসনে। এই দেশেই জন্ম-মৃত্যুর মহাসমস্যাসকল—জীবন-তৃষ্ণা, এ-জীবনের জন্য ব্যর্থ উন্মাদ প্রচেষ্টার ফলে সঞ্চিত দুঃখরাশি—সর্বপ্রথম আয়ত্তে আনিয়া সমাধান করা হয় ;—এমন সমাধান অতীতে কখনও হয় নাই বা ভবিষ্যতে কখনও হইবে না ; এইখানেই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় যে এই জীবনটাই অনিত্য—যাহা পরমসত্য, তাহারই ছায়ামাত্র।

"এই একটি দেশ, ধর্ম যেখানে বাস্তব সত্য ;—এইখানেই নরনারী সাহসের সঙ্গে অধ্যাত্ম-লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য ঝাঁপ দেয়, ঠিক যেমন অন্যান্য দেশে দরিদ্র ভ্রাতাদের বঞ্চিত করিয়া নর-নারী জীবনের সুখসামগ্রীর জন্য উন্মাদের মতো ঝাঁপ দেয়। এইখানেই মানবহৃদয় পশুপক্ষী, তরুলতা, মহত্তম দেবগণ হইতে তুচ্ছ ধূলিকণা অবধি, উচ্চতম সত্তা হইতে নিম্নতম সত্তা পর্যন্ত সবকিছুকে ধারণ করিয়া আরও বিশাল—অনন্ত প্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে। এইখানেই মানবাত্মা সমগ্র বিশ্বকে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে অনুধাবন করিয়াছে, তাহার স্পন্দন আপন নাড়ীর স্পন্দন বলিয়া মনে করিয়াছে।"[১]

বিবেকানন্দের ধ্যানের ভারতবর্ষ শত-সহস্র পতন-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে—অনাগত ভবিষ্যতও কি এই পথে চলবে না। ঋষিকবি বিবেকানন্দ আশাবাদী। ত্যাগের পথে, সত্যের পথে ভারতের মানুষ পূর্ণতার সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছে ;—আগামী ভারতবর্ষ-ও সে-পথ ধরে এগিয়ে চলবে। প্রবুদ্ধ ভারতের এই আদর্শপথ বিশ্ববাসীর সামনে সগর্বে ঘোষণা করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। To the Awakened India—'তে সেই ঘোষণারই কাব্যরূপ—

And tell the world :
Awake, Arise and dream no more !

Be bold And face
The Truth ! Be one with it ! Let Visions cease.
Or, if you can not, Dream then truer dreams.
Which are Eternal Love and service Free.

১. বাণী ও রচনা ঃ পঞ্চম খণ্ড ঃ পৃঃ ৩৭৩—৭৪

বিবেকানন্দ-চেতনায় দুটি ধারা স্পষ্ট প্রতীয়মান ঃ একটি ধারা প্রবাহিত অনন্ত প্রেম ও নিঃস্বার্থ সেবার সাধনায় ব্রহ্মোপলব্ধির দিকে, অপর ধারায় দেখি সর্বজীবে ব্রহ্মোপলব্ধি থেকে বিশ্বকল্যাণ। স্বামীজীর কাছে মানবপ্রেম এবং সেবাধর্ম এক হিসেবে মহত্তর স্বপ্ন (Truer dreams)। বিবেকানন্দের মননের এই দিকটি সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচক ড. প্রণব রঞ্জন ঘোষ যথার্থই বলেছেন—"একদিকে অনন্ত প্রেম ও নিঃস্বার্থ সেবার সাধনায় ব্রহ্মোপলব্ধি, অন্যদিকে সর্বজীবে ব্রহ্মোপলব্ধি থেকে সেবা ও প্রেমের করুণাধারায় বিশ্বকল্যাণে আত্মোৎসর্গ—বিবেকানন্দ-জীবন এই দুই ধারার সঙ্গমতীর্থ। ব্রহ্ম ও জগৎ—মানবমনের বিকাশের স্তর ভেদে দু-ই সত্য। একেবারে একধাপে 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—জাতীয় উপলব্ধির জগতে পৌঁছানো দুর্লভ অধিকারীদের পক্ষেই সম্ভব। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই জগৎসত্য থেকেই ক্রমে নিখিলবিশ্বের প্রতি ভালবাসায় নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে সত্যের পরম ঐক্যে পৌঁছানোর সাধনাই শ্রেয়। তাই মানবপ্রেম এবং সেবাধর্ম-ও এক হিসাবে স্বপ্ন—স্বামীজীর ভাষায় 'Truer dreams' (মহত্তর স্বপ্ন) যে মানুষ 'সোহহম্' উপলব্ধি করেনি, তারপক্ষে এই মহত্তর স্বপ্নই শ্রেয়-সাধনা।[১]

ভারতচেতনার ঘনীভূত রূপের প্রকাশ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে লক্ষ করা যায়। সেদিক থেকে উপনিষদ ও বেদান্তের গুরুত্ব অপরিসীম। এই দুটি গ্রন্থ যুগ যুগ ধরে ভারতীয়-মন ও জীবনকে সত্যের আলোক-বর্তিকা নিয়ে পথ দেখিয়ে চলেছে। বিবেকানন্দের মনের গড়নেও এই দুটি গ্রন্থের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। 'Peace' কবিতায় উপনিষদের সুর ধ্বনিত। তাছাড়া স্বামীজী-ব্যাখ্যাত উপনিষদের কাব্যাদর্শের একটি সুন্দর নিদর্শন এই Peace কবিতাটি। নিবেদিতার আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচারিণী বেশ ধারনের সঙ্কল্প উপলক্ষে এই কবিতাটি বিবেকানন্দ রচনা করেন। ১৮৯৯ সালে স্বামীজীর দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণের সময় নিউইয়র্কে থাকাকালীন কবিতাটি রচিত।

কবিতার প্রারম্ভে মহাশক্তির ধ্যান করেছেন কবি। মহাশক্তির স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন, তিনি আনন্দ-স্বরূপা। তিনি আলোক স্বরূপা। তিনি বীর্য্য ও প্রেরণাদাত্রী—

> Behold, it comes in might,
> The Power that is not power,
> The light that is in darkness,
> The shade in dazzling light.

সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকার, রাত্রি-দিন—এসবের সন্ধিক্ষণে তিনি প্রকাশ হন। দুঃখ-ও নয়, সুখ-ও নয়, এমন বোধ যখন তখন তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়—

> It is not joy nor sorrow,
> But that which is between,
> It is not night nor morrow,
> But that which joins them in.

---

১. বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য, ড. প্রণবরঞ্জন ঘোষ। পৃঃ ২১২, তৃতীয় সংস্করণ।

ভ্রাম্যমান জীবনের মাঝে পথিক-মানুষ আপাত বিশ্রাম খোঁজে। বিবেকানন্দ-ও তাঁর আজীবন সংগ্রামের পথে বিশ্রাম চেয়েছিল। চেয়েছিল শান্তি। কবি হৃদয়ের অন্তরতম ইতিহাসের সন্ধান নিলে দেখা যাবে, একদিকে সদাসমুদ্যত নির্ভীক জীবন সংগ্রামের প্রেরণা, অপরদিকে সর্বসমপর্ণকারী আত্মনিবেদনের ব্যাকলুতা—এ দুই নিয়ে বিবেকানন্দের মহাজীবন। কিন্তু সবশেষ কথা—শান্তি। সংগ্রামের অন্তর্লীন মহাশান্তির স্তব্ধতার কথায় স্বামীজী বাণীরূপ দিয়েছেন 'Peace'কবিতায়—যা সকল জীবনের পরম লক্ষ্য—

To it the tear—drop goes
To spread the smiling form
It is the Goal of Life,
And Peace—Its only home !

এরি লাগি ঝরে আঁখিজল
সারা বিশ্বে হাসি ছড়াবারে,
এ যে শান্তি—লক্ষ্য জীবনের
—একমাত্র আশ্রয় নিশ্চয়।[১]

'কর্মযোগে' বিবেকানন্দ বলেছেন, "আদর্শ পুরুষ তিনিই, যিনি গভীরতম নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্রতম কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা অনুভবকারী।.....বাণিজ্যবহুল মহানগরীতে ভ্রমণ করলেও নিঃশব্দ গুহাবাসীর মতো তাঁর মন শান্ত থাকে, অথচ সে মন প্রবল কর্মপরায়ণ।" স্বামীজীর সব কর্মমুখরতার অন্তরালে সেই ধ্যানের আহ্বান জানিয়েছেন 'Peace' কবিতায়।

স্বামীজীর অধিকাংশ কবিতা প্রিয় শিষ্য ও শিষ্যাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। ইতিপূর্বে দেখেছি, খেতুরীর মহারাজ, ভগিনী ক্রিষ্টিন, মেরী হেন মিস ম্যাকলার্ডড—এইসব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নিঃস্বার্থ-প্রাণ কর্মীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা জোগানোর জন্য জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তথা জীবন-দর্শন সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন এইসব কবিতার মধ্য দিয়ে। ভারতচেতনায় উদ্বুদ্ধ বিবেকানন্দের মানস-কন্যা নিবেদিতা-ও তাঁর গুরুর কাছ থেকে পেয়েছেন অজস্র আশীর্বাদ ও উপদেশ। কাব্যাকারে তেমনি একটি উপদেশ 'A Benediction' কবিতায়। কবিতাটির রচনাকাল ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ব-বিজয়ের অন্যতম আবিষ্কার ভগিনী নিবেদিতাকে ভারতবর্ষে যে কর্মরূপায়ণ করতে স্বামীজী চেয়েছিলেন, বলাবাহুল্য সেই কর্মরূপায়ণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই বিদেশী নারী। মনে-প্রাণে তখন তিনি ভারতীয় হয়ে উঠেছিলেন। ভারতবর্ষের মানুষের কল্যাণ, তাদের মুক্তি, শিক্ষা—এই ছিল নিবেদিতার স্বপ্ন। সম্ভবতঃ একারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সম্বোধন করেছিলেন 'লোকমাতা' বলে। সার্থক সে সম্বোধন। প্রসঙ্গতঃ, স্মরণযোগ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের পথ ও আদর্শ ধরেই স্বামীজী বিশ্ব-মন বিজয়

১. অনুবাদ ঃ ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্য

করেছিলেন। পেয়েছিলেন নিবেদিতাকে। তাঁর উপর অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল স্বামীজীর। তাঁর কর্মের সার্থক প্রতিভূ হিসেবে পেয়েছিলেন তিনি নিবেদিতাকে। তিনি তাঁর মানস-কন্যাকে তৈরি করেছিলেন আর্য-নারীর মতো করেই। ভারতচেতনায় তাঁর মন পরিপুষ্ট হয়েছিল স্বামীজীর জীবনধারার আলোকে। তিনি মার্গারেট থেকে পরিবর্তিত হয়ে 'লোকমাতা', ভারতমাতা হয়ে উঠেছিলেন। এই হয়ে ওঠার পিছনে স্বামীজীর আশীর্বাদ কি কম!—

The mother's heart, The hero's will,
The Sweetness of the Southern breeze.
The sacred charm and strength that dwell
On Aryan alters, flaming, free ;
All there be yours, and many dream before—
No ancient soul could dream befor—

বীরের সঙ্কল্প আর মায়ের হৃদয়,
দক্ষিণের সমীরণ—মৃদুমধুময়,
আর্যবেদী পরে দীপ্ত মুক্ত হোমানলে
যে পুণ্য সৌন্দর্য আর যে শৌর্য বিরাজে—
সকলই তোমার হোক, আরো, আরো কিছু
স্বপ্নেও ভাবিনি যাহা অতীতের কেহ।

স্বামীজীর স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল। ভবিষ্যতে ভারতের বন্ধু-দাসী-গুরু হিসেবে তিনি আপন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 'A Benediction' কবিতার শেষে স্বামীজী যা লিখেছিলেন তা নিবেদিতা পালন করেছিলেন—

Be thou to India's future son
The mistress, servent, friend in one.

ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে
তুমি হও বন্ধু, দাসী, গুরু—একাধারে।[১]

আকারে ক্ষুদ্র হলেও, নিবেদিতার জীবনে এ কবিতার প্রভাব ছিল অপরিসীম।

কবি মাত্রই স্বপন-চারী। বিশেষ করে রোমাণ্টিক কবিদের অনুভূতি-জগৎ স্বপ্ন দিয়ে ভরা। শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ—দেশ-বিদেশের রোমান্টিক কবিরা স্বপ্ন-বিলাসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গানে স্বপন-চারীর কথা আছে—'যে ছিল আমার স্বপন-চারিণী, তারে ভুলিতে পারি নি।' বিবেকানন্দের কবি মন বাইরে থেকে জীবন-নিষ্ঠ ও সত্যের সন্ধানী মনে হলে-ও, স্বপ্ন বিলাস যে তাঁর মনের অভ্যন্তরে কখন-ও কখন-ও

১. অনুবাদ ঃ ডঃ প্রণব রঞ্জন ঘোষ। বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৭

জায়গা পেতো তার প্রমাণ 'Thou Blessed Dreams' কবিতাটি। প্রকৃতপক্ষে এ কবিতায় ঠিক বিলাস নয়, জীবনে স্বপ্নের তাৎপর্যকেই কবি বিবেকানন্দ প্রকাশ করেছেন।

স্বামীজী প্যারিস থেকে ব্রহ্মচারিণী ক্রিস্টিনকে একটি চিঠি লিখেছিলেন ১৮ই আগষ্ট, ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে। এ চিঠিরই একটি অংশ এই কবিতাটি। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ জীবনে স্বপ্নের সার্থকতা স্বীকার করে সৌন্দর্যের স্তবগানে মুখর হয়েছেন। এই স্বপ্ন-চারণা যে কবির জীবনে আকস্মিক নয় তার প্রমাণ মেলে 'পরিব্রাজক' ভ্রমণ কাহিনীতে গঙ্গাতীরের সবুজ বর্ণনায়। হৃষীকেশের বর্ণনায় অথবা জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রশোভা দেখে, 'সামনে কবিতার সার সৌন্দর্য থাকতে কবিতা আবৃত্তির প্রয়োজন কি?' এসব কথা বলার মধ্যে। রোমান্টিক মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে আর একটি জায়গায়—'বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে।" (পরিব্রাজক)। কিন্তু স্মরণযোগ্য, স্বপ্ন-বিলাসই তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় লিখেছেন, 'আমায় দেখো না অমন করে, আমায় দেখো না বাহিরে।' বিবেকানন্দের জীবনের ক্ষেত্রেও এ বাণীটি সত্য। কবির অন্তরজীবনকে বাইরের ঘটনা দিয়ে বিচার করা সমীচীন নয়। তাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভুল বোঝার সম্ভাবনা। কবির আত্ম-বিশ্লেষণই কবি-মন বিচারের প্রধান উৎস হওয়া উচিত। কবি বিবেকানন্দকে জানতে গেলে তাঁর আত্ম-বিশ্লেষণ-কে পড়ে দেখা উচিত। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ 'জগতে দু'জাতের লোক আছে। এক ধরণের হলো—বলিষ্ঠ, শান্তিপ্রিয়, প্রকৃতির কাছে নতি স্বীকারে রাজী, বেশী কল্পনার ধার ধারে না, কিন্তু সৎ সহৃদয় মধুর স্বভাব ইত্যাদি। তাদের জন্যই এই দুনিয়া, তারাই সুখী হতে জন্মেছে। আবার অন্য ধরণের লোকও আছে, যাদের স্নায়ু উত্তেজনাপ্রবণ, যারা ভয়ানকরকম কল্পনাপ্রিয়, তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন এবং এই মুহূর্তে উচ্চগ্রামে উঠছে, পরমুহূর্তে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। তাদের বরাতে সুখ নেই। প্রথম দলের লোকেরা মাঝামাঝি এক সুখের জগতে বাস করে। শেষোক্ত দলের মানুষ অপার আনন্দের ও গভীর বেদনার স্তরে পর্যায়ক্রমে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এদের দ্বারাই জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানদের দল তৈরী হয়। 'প্রতিভা এক রকমের পাগলামি'—এই আধুনিক মতবাদের মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত।

"এখন এই শ্রেণীর লোকেরা যদি বড় হতে চায়, তবে তাদের তা চরিতার্থ করবার জন্য সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে ফেলে লড়াই করতে হবে। তাদের কোনো দায় থাকবে না—বিবাহ নয়, সন্তান নয়, সেই এক চিন্তা ছাড়া আর কোনো অনাবশ্যক আসক্তি নয়। সেই এক আদর্শের জন্য জীবনধারণ এবং মৃত্যুবরণ। আমি এই শ্রেণীর মানুষ। আমার একমাত্র আদর্শ 'বেদান্ত' আর আমি 'লড়াইয়ের জন্য তৈয়ার।'"[১]

---

১. বাণী ও রচনা ঃ ৭ম খণ্ড ঃ পৃঃ ২৮২ (১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ তারিখে শ্রীমতী হেল-কে লেখা চিঠি)।

তবু-ও বিবেকানন্দ মানুষ। আর, একজন মানুষ হিসেবে জীবনে তিনি স্বপ্ন দেখতে পারেন, যেহেতু জীবন স্বপ্নকে বাদ দিয়ে নয়। 'Thou Blessed Dream' কবিতাটিতে জীবনে রোমান্টিক স্বপ্নচারণের তাৎপর্যটি প্রাণময় প্রকাশভঙিতে বাণীময় হয়ে উঠেছে। সেই স্বপ্ন-কে আহ্বান জানিয়ে কবি বলছেন—

Thou dream, O blessed dream !
Spread far and near thy Veil of haze,
Tone down the lines so sharp,
Make smooth what roughness seems.

স্বপন, তুমি কাছে দূরে প্রসারিত কর তোমার মায়াজাল, পেলব কর তীব্র রেখা যত, আর সব রুক্ষতাকে নম্র করে তোলো। স্বপনে-কে কবি ইন্দ্রজাল বলে অভিহিত করেছেন, যার পরশে প্রাণপুষ্প হিল্লোলিত হয়, জাগে মরুভূমি, এমনকি মৃত্যুর মাঝে বহন করে আনে মধুময় মুক্তির স্বাদ—

No magic but in thee !
Thy touch makes desert bloom to life.
harsh thunder, sweetest song.
Fell death, the sweet release.

প্রকৃতপক্ষে এ কবিতাটি একটি স্বপ্ন-বন্দনা ; রোমান্টিক কবিদের স্বপ্ন চারণার সঙ্গে Blessed Dream-এর কোনো সম্বন্ধ নেই। জীবন ও জগতের সামগ্রিক রসরূপান্তরে এই স্বপ্নের সার্থকতা। বিবেকানন্দের কল্পনাজগতে ভীষণের এই মধুময় পরিণতির সাক্ষ্য আর কোনো কবিতায় নেই।[1]

বিবেকানন্দের কবিতা সংখ্যায় অল্প হলেও, অনুভূতির গভীরতায় সেগুলি প্রোজ্জ্বল। তাঁর কবিতা বিচার শুধুমাত্র সাহিত্যের মাপকাটিতে করলে অযৌক্তিক হবে ; বরং ভাব-তন্ময় ধ্যানীর দৃষ্টি দিয়ে সেগুলি বিচার-সাপেক্ষ। কিন্তু সেই ধ্যান-তন্ময়তা বর্তমান লেখকের মনে দুষ্প্রাপ্য ব্যাপার। তবু স্বল্প-সামর্থ্য নিয়ে স্বামীজীর কবিমন ও কাব্যন্তর বিচার করতে বসে জীবন ও জগতের অনেক সত্য-স্বরূপকে লক্ষ করেছি। এ কবির চেতনা ভারতীয় মন থেকে প্রলম্বিত হয়ে বিশ্বমনে সংক্রামিত হয়েছে। সেদিক থেকে তাঁর ইংরেজি কবিতা বিশ্ব-মনের সামগ্রী।

১. 'Thou Blessed Draem' কবিতাটি সম্পর্কে ড. প্রণবরঞ্জন ঘোষ একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন তাঁর 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য' গ্রন্থে।

পঞ্চম অধ্যায়

পাশ্চাত্য মননে স্বামী বিবেকানন্দ ঃ প্রাক্-মহাসভা পর্ব

(এক)

প্রাচীন প্রাচ্য ভূখণ্ডের এক যুবক সন্ন্যাসী চলেছেন আধুনিক পাশ্চাত্য বিশ্বে। মনের নিভৃত কোণে গভীর আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পৌঁছলেন ভাঙ্কুয়ার। তারিখ ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই সন্ধ্যা সাতটা। জাহাজ ক্রমশ যখন বিট্রিশ কলোম্বিয়ার ডেকে এসে পৌঁছেছিলো, তখন স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চয় ভেবেছিলেন, তাঁর স্বপ্নের দেশ হাতের নাগালে। আবার এ ট্রেন ও ট্রেন করে অনেক ক্লান্তিময় পথ পেড়িয়ে সোমবার, ৩০শে জুলাই, সন্ধ্যা সাতটায় পৌঁছিলেন পাশ্চাত্যবিশ্বের বিত্ত ও স্বপ্ন দিয়ে সাজানো চিকাগো নগরীতে। তখনও বিশ্বধর্মসম্মেলন শুরু হতে এগারো দিন বাকী। সেপ্টেম্বর ১১ তারিখে ধর্মসম্মেলনের দিন নির্ধারিত ছিল। সুতরাং অপেক্ষা করতে হবে। শিকাগো পৌঁছে স্বামীজী কী কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়েছিলেন তা আমরা স্বামীজীর ইংরেজি জীবনী (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিষ্য লিখিত) থেকে জানতে পেরেছি। পকেটে স্বল্প পুঁজি এবং কোনরকম পূর্ব-প্রস্তুতি না-থাকার ফলে শিকাগোর মতো ব্যস্ত নগরীতে স্বামীজী এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে সময় কাটাচ্ছিলেন। তবে একেবারেই যে তিনি কোন সূত্র না ধরেই আমেরিকা চলে এসেছিলেন, তা নয়। অন্ততঃ একটি ঠিকানা তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন, এ সংবাদ আমরা বিশিষ্ট বিবেকানন্দ গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর গবেষণা থেকে জানতে পারি। মেরী লুই বার্ক-ও স্বামীজীর প্রাক-ধর্মমহাসম্মেলন পূর্বের আরও অতিরিক্ত কিছু খবর তাঁর 'নিউ ডিসকভারিজ'-এ উপস্থাপিত করেছেন। সেসবের পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপন এ প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় নয়। তবে সেগুলির কিছু কিছু উল্লেখের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু এই প্রবন্ধে স্বামীজীর জীবনের ঐ বিশেষ পর্বটি পাশ্চাত্যের মানুষদের কীভাবে—কোনরূপে প্রভাবিত করেছিল তা লক্ষ করা। প্রভাবের প্রসঙ্গে পরে আসছি ; এখানে দু'একটি খবর উল্লেখ করছি যা আলাসিঙ্গাকে লেখা (২০ শে আগষ্ট, ১৮৯৩) বিবেকানন্দের চিঠি থেকে পাচ্ছি। বিবেকানন্দ শিকাগোয় বন্ধুহীন অবস্থায় ছিলেন—এ কথা সঠিক নয়। তাঁর সঙ্গে জাহাজে সহযাত্রী ছিলেন শ্রীযুক্ত সি. লালুভাই। এছাড়া তাঁর কাছে ছিল মাদ্রাজী এক বন্ধু বরোদা রাও-এর একটি পত্র, যাতে স্বামীজীর পরিচয় উল্লেখ ছিল। ঐ পত্রটিই স্বামীজীকে বিশ্বধর্মসম্মেলনের অনুষ্ঠানের পরিচালক ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছিল। তিনি অবশ্য ঐ ভদ্রলোকের নাম যে কোন কারণেই হোক উল্লেখ করেন নি। শুধু এটুকু বলেছেন, তিনি ছিলেন তৎকালীন শিকাগো সমাজের 'গণ্যমান্য ব্যক্তি'।[১]

১. Complet works, 5 : 12

স্বামীজীকে সেই ব্যক্তি ও পরিবারের অন্যান্য ধর্মমহাসভায় ভারতবর্ষের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে বলেন। স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে সেমসয় তাঁরা হয়ত চমকিত হয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীজীকে অতিথি হিসেবে তাঁদের বাড়িতে থাকার কথা তাঁরা বলেন নি। অর্থাভাবের কারণে হয়ত নয়। আমাদের মনে হয়, স্বামীজী, প্রথমত ছিলেন একজন আগন্তুক যুবক সন্ন্যাসী। অদ্ভুত তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ। তাছাড়া, সন্ন্যাসী সম্পর্কে তাঁদের পরিস্কার ধারণা থাকারও কথা নয়। মোটকথা, তখনও তিনি তাঁদের চোখে অসাধারণ হয়ে ওঠেন নি। এছাড়া, আর একটি কারণ, শ্রীমতী বার্ক দেখিয়েছেন, স্বামীজীর একটি চিঠির উল্লেখ করে, তা হলো, সে বছরটি ছিল ওদেশে মন্দার বছর। অর্থনৈতিক টানা-পোড়নের মধ্যে সেদেশের মানুষেরা সময় অতিবাহিত করছিল। ব্যবসায়িক ব্যর্থতা তাঁদের মনকে সঙ্কুচিত করে তুলেছিল। শুধু উপদেশ ও তাৎক্ষণিক মজা-উপহাস ছাড়া বিদেশি অভ্যাগতকে আর কিছু দেওয়ার তাদের ছিল না।[১] সুতরাং তাঁকে শিকাগো ছেড়ে বসটন যেতে হয়েছিল। বসটন যাওয়ার পথেই স্বামীজী প্রথম এক বৃদ্ধাকে তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে প্রভাবিত করলেন। তার পূর্বে শিকাগোর ঐ সময়টি স্বামীজীর কাছে ছিল হতাশায় পূর্ণ, অনেকটা লাঞ্ছিত জীবন। সেসব কথা এখানে নয়। বসটনে থাকাকালীন তিনি গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছেন। এখন প্রশ্ন, পাশ্চাত্য-মননে স্বামীজীর প্রভাবের ব্যাপারটি কীভাবে পড়েছে? এ প্রসঙ্গে দুটি মন্তব্য আমরা এখানে উল্লেখ করবো। একটি স্বয়ং স্বামীজীর ; অপরটি মেরী লুই বার্কের। প্রথম ঘটনাটি খুব সরস ভঙ্গীতে স্বামীজী বলেছেন। পাশ্চাত্যের মানুষেরা বিত্ত-সম্পদের থেকে গুণী বা বিদ্বান-বুদ্ধিমানকেই বেশি সমদার করেন, সেকথা বলেছেন। ঘটনাটি যে সময়ের স্বামীজী তখন শিকাগোতে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছেন। "চিকাগোয় সম্প্রতি একটি মজা হইয়া গিয়াছে। কাপূরতলার রাজা এখানে আসিয়াছিলেন, আর চিকাগোর সমাজের কতকাংশ তাঁহাকে কেষ্ট-বিষ্টু করিয়া তুলিয়াছিল। মেলার জায়গায় এই রাজার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বড়লোক, আমার মতো ফকিরের সঙ্গে কথা কহিবেন কেন? এখানে একটা পাগলাটে, ধুতিপরা, মারাঠি ব্রাহ্মণ মেলায় কাগজের উপর নখের সাহায্যে প্রস্তুত ছবি বিক্রয় করিতেছিল। এ লোকটা খবরের কাগজের রিপোর্টারদের নিকট রাজার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়াছেন। সে বলিয়াছিল, এ ব্যক্তি খুব নীচ জাতি, এই রাজারা ক্রীতদাসস্বরূপ, ইহারা দুর্নীতি-পরায়ণ ইত্যাদি। আর এই সত্যবাদী (?) সম্পাদকেরা—যাহার জন্য আমেরিকা বিখ্যাত—এই লোকটার কথায় কিছু গুরুত্ব আরোপের ইচ্ছায় তার পরদিন সংবাদপত্রে বড় বড় স্তম্ভ বাহির করিল—তাহারা ভারতাগত একজন জ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা করিল—অবশ্য আমাকেই লক্ষ্য করিয়াছিল। আমাকে স্বর্গে তুলিয়া দিয়া আমার মুখ দিয়া তাহারা এমন কথা বাহির

১. মেরী লুই বার্কের New Discovesies : His prophitic Mission : Page. 19. স্বামীজীর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্টের একটি চিঠি উদ্ধৃত করে বার্ক দেখিয়েছেন।

করিল যাহা আমি স্বপ্নে কখনও ভাবি নাই। তারপর এই রাজার সম্বন্ধে মারাঠা ব্রাহ্মণটি যাহা যাহা বলিয়াছিল, সব আমার মুখে বসাইল। আর তাহাতেই চিকাগো-সমাজ একটা ধাক্কা খাইয়া তাড়াতাড়ি রাজাকে পরিত্যাগ করিল। এই মিথ্যাবাদী সম্পাদকেরা আমাকে দিয়া আমার লোককে বেশ ধাক্কা দিলেন। যাহা হউক—ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এই দেশে টাকা অথবা উপাধির জাঁক-জমক অপেক্ষা বুদ্ধির আদর বেশী।"[১]

আমরা পরবর্তীতে লক্ষ করবো, স্বামীজীর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও প্রতিভা কী গভীর ভাবে সেদেশের পণ্ডিত মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের হৃদয়কে জয় করে নিয়েছিলো। স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীকারেরা অপ্রত্যাশিতভাবে বসটন যাওয়ার পথে এক বর্ষিয়সী নারীর সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় এবং তার বাড়িতে থাকার জন্য আমন্ত্রণের ব্যাপারটিকে দৈবানুগ্রহ বলেছেন। বলেছেন, "Mysterious are the ways of the Lord !" আমরা পূর্বে দেখেছি, বিবেকানন্দ ঈশ্বর-আদেশ ব্যতীত পাশ্চাত্য-পাড়ি দিতে চান নি। আদেশের জন্য অপেক্ষা করেছেন সুদীর্ঘকাল, যতই তাঁর অনুরাগী মাদ্রাজী শিষ্যেরা ধর্মসম্মেলনে যাবার জন্য প্ররোচিত করুন না কেন! আবার দেখেছি, যখন তিনি প্রথম আমেরিকায় পদার্পণ করেছিলেন তখন সেই অজানা-অচেনা দেশে স্বল্প সম্বল নিয়ে কীভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে চলেছিলেন। সুতরাং তাঁর সমগ্র কর্ম যে ঈশ্বর-নির্দিষ্ট ও ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত সেকথা ভুললে চলবে না। শ্রীমতী লুই বার্ক এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "বিবেকানন্দ বিধাতার অলক্ষ্য নির্দেশে আমেরিকায় এসেছিলেন—ঈশ্বর দূত হিসাবে। আমেরিকার নতুন জগতে 'ঈশ্বরের প্রথম বিরাট বার্তাবহ তিনি।" সুতরাং তিনি বক্তৃতা করুন বা না-করুন, কথা বলুন বা না-বলুন, তিনি যে উপস্থিত আছেন, স্পর্শ করছেন—সেই তাঁর দান "নিত্য বর্ষিত তাঁর আশীর্বাদ যেমন নিত্য বিকিরিত সূর্যের আলোক।" ভারতের রীতি-নীতির বিষয়ে তিনি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করছেন, তিরষ্কার করছেন মোহান্ধকে বা ভণ্ডকে, সমাজিক সম্মেলনে তিনি উপস্থিত আছেন, ট্রেনে, হোটেলে বা অন্যত্র ঘটনাচক্রে তাঁর সঙ্গে কারো পরিচয় ঘটে যাচ্ছে—সর্বাবস্থায় তিনি ঐশ্বরিক আলোক ছড়াচ্ছেন। একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য—অগণিত মানুষের হৃদয়-গভীরে তিনি অধ্যাত্ম-বীজ বপন করেছিলেন এবং চিরদিনের জন্য পরিবর্তিত করে দিয়েছিলেন তাদের জীবনধারাকে। এত স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকভাবে স্বামীজী একাজ করেছিলেন যে, মনে হয়, তিনি যেন এ-বিষয়ে সচেতনই ছিলেন না। কিন্তু এই 'অসচেতনতা' প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ বা পরিত্রাতাদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য—সূর্যের বৈশিষ্ট্যের মতোই তা—আলো দেব কি দেব না—সূর্য কি ভাবিত হয় তা নিয়ে?"

ধর্ম সম্মেলনে দেশ-বিদেশের যত পণ্ডিত, ধর্ম-প্রবক্তা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, অথবা উক্ত সম্মেলনে যাঁরা নিজের ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছিলেন,

১. বাণী ও রচনা, ৬।৩৬৩

বিবেকানন্দ যে তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন সেকালীন পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট ও বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতিচারণা থেকে তা জানতে পারি। স্বামীজী যে প্রফেটের মতোই কাজ করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীমতী বার্কের চোখেও স্বামীজী একজন প্রফেট। ঈশ্বরের দূত হিসেবে তিনি মাটির পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। জগৎ-কল্যাণেই তাঁর আবির্ভাব। মানুষের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের মুক্তিই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। সেজন্য হয়ত তাঁকে বহু ক্লেশ-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। মহাজীবনেই দুঃখ-কষ্ট বেশি আসে। প্রভু যীশু কী কম দুঃখভোগ করেছেন! স্বামীজীও সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য কত যে দুঃখ স্বীকার করেছেন তা পরিমাপযোগ্য নয়। তিনি যে প্রফেট রূপেই পাশ্চাত্য-পৃথিবীর অগণিত মানুষের জীবনের মুক্তি ঘটিয়েছিলেন তা লুই বার্ক গভীরভাবে স্বীকার করেছেন। আমরা শ্রীমতী বার্কের সেই উক্তিটি স্মরণ করে প্রভাব প্রসঙ্গে যাবো। "মুনি, ঋষিদের জীবনী পাঠ করে একটি জিনিষ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে—আলোকপ্রাপ্ত পুরুষগণের কার্যাবলীকে অবশ্যই দুই স্তরে দর্শন করে উপলব্ধি করতে হবে। প্রথমতঃ রয়েছে তাঁদের বাইরের কার্যকলাপ—তাঁদের জীবনের দৃষ্টিগ্রাহ্য উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে তা ঘটে থাকে এবং সকলের পক্ষে কম বা বেশি পরিমাণে তাকে ধারণা করা সম্ভব। তাঁদের সেই বাইরের কার্যাবলী ক্লেশ-সাধ্য এবং প্রেরণাপূর্ণ নিঃসন্দেহে, কিন্তু তা তাঁদের মনের একাংশকে মাত্র অধিকার করে থাকে। তার থেকে অনেক ব্যাপক ও সৃষ্টিশীল অংশটি সক্রিয় থাকে আমাদের দৃষ্টির অগোচর। বস্তুতঃপক্ষে তাঁরা যে সত্যই ঐ ধরণের মানুষ, তার প্রমাণ—তাঁরা তাঁদের মনের গভীর গহনে ঈশ্বরে স্নাত এবং নিত্য জাগরিত।.....তাই স্বামীজী যখন তাঁর সর্বাধিক 'ঝঞ্ঝাময়' বহির্গত জীবনের মধ্যে আছেন, তখনো তাঁর মনোলোকের বিশাল মৌন অংশ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম ; যেখান থেকে বার্তা আসছে তাঁর বাইরের মনের কাছে, যা ভিতরের আনেকে ঐ বাণীকে ভাস্বর করেছে—শুধু তাই নয়, এমন নিজস্ব ভাবে সেই গহন মন কাজ করে যাচ্ছে যে, প্রফেটের মূল জীবনোদ্দেশ্য একই সঙ্গে সার্থিত হয়ে যাচ্ছে।"[১]

(দুই)

স্বামীজী পাশ্চাত্য পাড়ি দেবার প্রাক্‌কালে সাধারণ মধ্যবিত্তদের অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভর করেছিলেন। আমরা পূর্বে দেখেছি, এখানেও দেখবো স্বামীজী সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই প্রথম আশ্রয় পেয়েছিলেন বিদেশ-বিভূঁয়ে। তখন তাঁর প্রয়োজন ছিল মাথা গুঁজবার একটা ঠাঁই। তা নাহলে ধর্মসম্মেলন অব্দি হোটেলে থাকার মতো যথেষ্ট অর্থ তার কাছে ছিল না। একান্ত ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেই তিনি বস্টনের পথে চলেছিলেন।

১. মেরি লুই বার্ক—'ডিসকভারিজ'।

সেসময় স্বামীজী মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছিলেন। ভাবছিলেন হয়তঃ স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়! কিন্তু হেরে যান নি। ২০শে আগষ্ট-এ একটি চিঠিতে মনের সেই অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন, " All thosc rosy ideas we had before star'ing have melted, and I have now to fight against impossibilities. A hundred times I had a mind to go out of thc country and go back to India. But I am determined, and I have a call from above ; I see no way, but His eyes see. And I must stick to my guns, life or death."[১]

জীবনের একদিকে সংগ্রাম, অন্যদিকে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ—এই দ্বৈত সত্তার মধ্য দিয়ে তিনি চলেছিলেন। মনের ঝড় কিছুটা প্রশমিত হলো যখন দৈবানুগ্রহে ট্রেনের মধ্যে পরিচয় ঘটলো একজন মধ্যবিত্ত বয়স্কা মহিলার সঙ্গে। তিনি চলেছিলেন বস্টনে। পরিচয়সূত্রে তিনি জানলেন, ভদ্রলোক একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী। 'জগতের মহত্তম সত্য বেদান্তের বাণী প্রচার করতে এসেছেন আমেরিকায়'। মহিলাটি স্বামীজীর মহান ব্যক্তিত্বে বিমোহিত হলেন। ভারতীয় ধর্ম ও সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে জানবার আগ্রহ তাঁর বেড়ে গেল। স্বামীজীকে তাঁর বাড়িতে থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। স্বামীজী অন্ধকারের মধ্যে আলো খুঁজে পেলেন। তিনি সম্মত হলেন। সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য-মননে স্বামীজীর এটি প্রথম প্রভাব। মহিলাটির নাম শ্রীমতী কাথেরিন এ্যাবট্ স্যানবর্ণ। তিনি ম্যাসাচুসেট্স্ প্রদেশের ব্রিজি মেডোজ ফার্মের স্বত্বাধিকারিণী। মিস স্যানবর্ণ সম্পর্কে স্বামীজী লিখেছিলেন, "আমি এক্ষণে বস্টনে এক গ্রামে এক বৃদ্ধা মহিলার অতিথিরূপে বাস করিতেছি। ইহার সহিত ট্রেনে আমার হঠাৎ আলাপ হয়। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার নিকট রাখিয়াছেন। এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে।"[২] স্বামীজীর এই উক্তি থেকে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে তিনি ঐকালে যে ভয়ানক আর্থিক কষ্টের মধ্যে ছিলেন তার অন্ততঃ কিছুটা লাঘব হয়েছে মিস স্যানবর্ণের গোলাবাড়িতে থাকার ফলে। স্বামীজীর সেই দুর্দ্দিনে অনেকটা আশা জেগে উঠেছিল তাঁর বাড়িতে আতিথেয়তা পেয়ে। আবার ঐ চিঠির পরের অংশ থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, স্বামীজীকে ঐ মহিলা সঠিকভাবে বোঝেন নি। কারণ স্বামীজী লিখছেন, "আর তাঁহার (মহিলার) লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন। এসব যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে।"[৩] মিস্ স্যানবর্ণ ছিলেন তখন পৌঢ়া, বয়স চুয়ান্ন। স্বামীজী অবশ্য তাঁকে বৃদ্ধা অভিহিত করেছেন। ঐ বয়সে আমাদের দেশের মেয়েরা তো প্রায় বৃদ্ধা। তখনও তাঁর যথেষ্ট কর্মোদ্যম ছিল।

---

১. Complete works, 5 : 12

২. বাণী ও রচনা, ৬।৩৬২

৩. ২০শে আগষ্ট, ১৮৯৩-এ মেটকাফ, মাসাচুসেটস থেকে আলাসিঙ্গাকে লেখা চিঠি। বাণী ও রচনা ৬।৩৫১

স্বামীজীকে নিয়ে যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াতেন। সমাজে বাগ্মী ও লেখিকা হিসাবে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল। ফলতঃ ঐ মহিলার সাহায্যে স্বামীজী শীঘ্রই ঐ অঞ্চলের শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। বস্টনের একটি মহিলা ক্লাবে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্বামীজী বক্তৃতা দেন। ঐ ক্লাবের সভ্যরা মহারাষ্ট্র দেশীয় ব্রাহ্মণ বিধবা, কিন্তু পরে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিতা রমাবাঈ-এর ভারতবর্ষে কাজের জন্য অর্থ সাহায্য করতেন। বস্টনেই স্বামীজীর সঙ্গে নারী কারাগারের অধ্যক্ষ মিসেস জন্‌সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে মিস্ স্যানবর্ণের মধ্যস্থতায়। মিসেস জনসনের অনুরোধে তিনি শেরবোর্নে অবস্থিত মহিলা সংশোধনাগারে (কারাগার ওখানে বলে না) ভারতীয় রীতিনীতি ও জীবনধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বস্টনের জনগণ স্বামীজীকে সে সময় চিনেছিলেন ; এমন কী সেখানকার নিয়মিত পত্রিকার শিরোনামেও তিনি উঠেছিলেন। ২৫শে আগষ্ট 'বস্টন ইভিনিং ট্রান্‌সক্রিপ্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এইভাবে—"ইণ্ডিয়া হইতে আগত ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী স্বামী বেরে কানন্দ আগামী মাসে চিকাগোতে ধর্মমহাসভায় উপস্থিত থকিবার জন্য এই দেশে আসিয়াছেন ; তিনি গতকল্য কঙ্কর্ড-এর শ্রীযুক্ত এফ. বি. স্যানবর্ণের সহিত বস্টনে আসিয়াছিলেন।"

এফ. বি. স্যানবর্ণ, পুরো নাম ফ্রাঙ্কলিন বেঞ্জামিন স্যানবর্ণ। তিনি ছিলেন শ্রীমতী কেইট স্যানবর্ণের জ্ঞাতিভাই। শ্রীযুক্ত স্যানবর্ণ সমাজে সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন লেখক-সাংবাদিক এবং সমাজ-সেবীও। স্বামীজী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি স্যানবর্ণের বাড়িতে উপস্থিত থাকার ফলে সম্ভবতঃ সংবাদের শিরোনামে উঠতে পেরেছিলেন। ফলে সেখানকার সমাজে পরিচিত হওয়ার ব্যাপারটা ত্বরান্বিত হয়েছিলো। স্বামীজীর অভীষ্ট কর্ম-ও ক্রমশ এগোচ্ছিলো এবং তিনি তাঁর উদারনৈতিক মতবাদে তাঁদের মন আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন। গোঁড়া খ্রিষ্টান দেশে ভারতীয় হিন্দুধর্মের প্রচার কোন্ পর্যায়ে গিয়েছিল আলাসিঙ্গাকে লেখা ২০ শে আগষ্টের চিঠিতে তা পরিস্কার হয়ে ওঠে। লিখেছেন—

"জানিয়া রাখো, এই দেশ খ্রিষ্টানের দেশ। এখানে আর কোন ধর্ম ও মতের প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র নাই বলিলেই হয়। আমি জগতে কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার ভয় করি না। আমি এখানে মেরী তনয়ের সন্তানগণের মধ্যে বাস করিতেছি ; প্রভু ঈশ্বরই আমাকে সাহায্য করিবেন। একটি জিনিষ দেখিতে পাইতেছি, তাঁহারা আমার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় উদার মত ও নাজারাথের অবতারের প্রতি ভালাবাসা দেখিয়া খুব আকৃষ্ট হইতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়া থাকি যে, আমি সেই গ্যালিলীয় মহাপুরুষের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র বলি না, কেবল তাঁহারা যেমন যীশুকে মানেন, সেই সঙ্গে ভারতীয় মহাপুরুষগণকেও মানা উচিত। একথা ইঁহারা আদরপূর্বক গ্রহণ করিতেছেন। এখন আমার কার্য এইটুকু হইয়াছে যে, লোকে আমার সম্বন্ধে কতকটা জানিতে পারিয়াছে ও বলাবলি করিতেছে।" আমেরিকান সমাজে

স্বামীজীর ইংরেজি সম্পর্কে ইংরেজি জীবনী লিখছে ঃ 'His Lecture at the Club was a success and many person became interested in him and his work.'[১]

শ্রীযুক্ত স্যানবর্ণ প্রথম দিকে এই হিন্দু যুবক সন্ন্যাসীকে অবিশ্বাসের চোখেই দেখেছিলেন। কিন্তু ব্রিজি মেডোজে বার্তালাপের পর তাঁর মত পরিবর্তিত হয়। স্বামীজীর পূর্বোক্ত ২০শে আগষ্টের চিঠিতে দেখি, স্যানবর্ণ থিয়োসফিষ্টদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, অবশ্য পরে ভুল বুঝতে পেরে তা থেকে সড়ে আসেন। স্বামীজীর প্রভাব তাঁর উপর গভীরভাবে পড়েছিল। ফলতঃ তিনি স্বামীজীকে নিয়ে ২৪শে আগষ্ট বস্টনে যান এবং তাঁকে নিয়ে ফ্যারাটোগায় গিয়েছিলেন। স্বামীজী এবং স্যানবর্ণের মধ্যে খুব সৌর্হাদ্য গড়ে উঠেছিল। স্যানবর্ণ ছিলেন একজন আদিবাসী। সেসময়কার ইংল্যাণ্ডের গুটিকয়েক অলৌকিক রক্ষাবাদীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। পরবর্তীকালে তিনি এমারসন, ব্রনসন এ্যালকট প্রভৃতি ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন এবং তাঁদের জীবনীও লিখেছিলেন।

শ্রীযুক্ত স্যানবর্ণ ছিলেন আমেরিকান স্যোসাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসনের সেক্রেটারি। তাঁর আহ্বানে স্বামীজী ৫ই ও ৬ই সেপ্টেম্বর উক্ত প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল ভারতে মুসলমান রাজত্ব ও ভারতে রৌপ্যের ব্যবহার। ৬ই সেপ্টেম্বর কি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা অজ্ঞাত। আমেরিকায় ঐ ধরনের অ্যাসোসিয়েসন ইতিপূর্বে ছিল না।[২] আমেরিকার বহু শিক্ষিত ও গুণী ব্যক্তিরা সেই প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন। সেই কৃতবিদ্যসমাজে স্বামীজীকেবক্তৃতা করার আহ্বান জানানোর ব্যাপারটি থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি স্বামীজীর অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এখানে একটি তথ্যের গরমিল লক্ষ করেছি, তাহলো, স্বামী গম্ভীরানন্দজীর 'যুগনায়ক' গ্রন্থে উল্লেখ আছে—তিনি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন স্যানবর্ণের আমন্ত্রণে সানেস হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রে তথায় যাত্রা করিছেলেন।...ও ৫ই সেপ্টেম্বর বক্তৃতা দেন।"[৩] কিন্তু স্বামীজী রাইটকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর শনিবার চিঠি লিখেছেন, "মিঃ স্যানবর্ণ আমাকে সোমবার সারাটোগায় আসতে বলেছেন"।[৪] সোমবার ৬ তারিখ সারাটোগায় পৌছিলে ৫ তারিখে নিশ্চয় সেখানে বক্তৃতা দেন নি। এ লম্পর্কে ল্যুই বার্ক কিছু বলেন নি।

১. The life of Swami Vivekananda. P. 297, 5th edition—1955

২. Discoveries—O. 26, (1st)

৩. যুগনায়ক (২য়)—স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ১৫

৪. বাণী ও রচনা—৬।৩৭১

অধ্যাপক জন রাইট এবং তাঁর পরিবার
(তিন)

ধর্মমহাসভার পূর্বে স্বামীজীর সঙ্গে যাঁর পরিচিতি স্বামীজীর কর্মজীবনকে সর্বাধিক ক্রিয়াশীল করেছিল তিনি যে অধ্যাপক হেনরি জন রাইট—এ ব্যাপারে কারো দ্বিরুক্তি থাকতে পারে না। স্বামীজীর জীবনী পাঠকেরা জানেন যে, অধ্যাপক জন রাইটের প্ররোচনা ও ব্যবস্থাপনায় স্বামীজী শিকোগো ধর্মমহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। স্বামীজী অধ্যাপক রাইটের উদারতা ও সহৃদতার কথা কখনও ভুলতে পারেন নি। সাক্ষাতে—অসাক্ষাতে (চিঠি-পত্রের মাধ্যমে) তাঁর কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়েছে অধ্যাপক রাইট ও তাঁর পরিবারের প্রতি। কৃতজ্ঞ ঐ বৃদ্ধা মহিলাটির প্রতিও যাঁর মাধ্যমে অধ্যাপকের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় ঘটেছিল। প্রথম দর্শনের পূর্বেই অধ্যাপক রাইট স্বামীজীর গুণাবলীর কথা শুনেছিলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার এই অধ্যাপক হাওয়া বদলের নিমিত্তে তাঁর অ্যানিস্কোয়ামের ব্যবস্থান থেকে বস্টনে এসেছিলেন এমন কথা সত্য হলেও সেখানে গিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয় করা যে তাঁর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং বস্টনে তাঁকে দেখার জন্য যে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তা জানা যায় অধ্যাপক পত্নীর ২৯শে অগষ্ট তারিখের একটি পত্র থেকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতই হোক, অথবা দৈবকারণেই হোক স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সেসময় যোগাযোগ হয়ে ওঠে নি। সেকারণে তিনি স্বামীজীকে তাঁর অ্যানিস্কোয়ামের বাড়িতে বাস করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আসেন এবং স্বামীজী-ও তাঁর আমন্ত্রণ রক্ষা করেন—"হিন্দু—সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য জন্ বস্টনে গিয়াছিলেন, কিন্তু দেখা না হওয়ায় তাঁহাকে এখানে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি শুক্রবারে আসিয়াছিলেন।" ইংরেজি-জীবনী থেকে জানা যায়, প্রথম সাক্ষাতেই অধ্যাপক রাইট স্বামীজীর অসাধারণ প্রতিভায় মুগ্ধ হন এবং তাঁকে ধর্মমহাসভায় যোগাদন করার জন্য প্ররোচিত করেন। শুধু তাই নয়, তিনি স্বামীজীর শিকাগো যাওয়া এবং সেখানে বাসস্থানের সমস্ত রকম ব্যবস্থা করেন। ধর্মমহাসভায় প্রধান কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য একটি পত্রে তিনি লেখেন, "ইনি এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে, আমাদের সকল অধ্যাপককে একত্র করিলেও ইঁহার সমকক্ষ হইবেন না।" সুতরাং প্রথম সাক্ষাতে স্বামীজীর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য অধ্যাপককে মুগ্ধ করেছিল। তিনি তাঁকে বলেন, আমেরিকার জনসাধারণের সামনে আত্মপরিচয় দেবার পক্ষে মহাসভায় উপযুক্ত ক্ষেত্র—বিরাট জাতির নিকট পরিচিত হইতে হইলে এই আপনার সুযোগ।" স্বামীজী তাঁর অর্থকষ্ট, পরিচয় পত্রের অভাব ইত্যাদির কথা বললে গুণমুগ্ধ অধ্যাপক বলেন, আপনার কাছে পরিচয় পত্র চাওয়া আর সূর্যকে তার কিরণ-বিকিরণের কী অধিকার আছে জিজ্ঞাসা করা একই কথা।" স্বামীজীর অর্থাভাব জেনে তাঁকে শিকাগো যাওয়ার একটি রেলটিকিট কিনে দেন এবং মহাসভার যে কমিটি প্রাচ্য প্রতিনিধিদের বাসস্থানাদির ব্যবস্থায় নিযুক্ত ছিলেন

তাঁর নামেও একটি চিঠি লিখে দেন। সুতরাং, ধর্মমহাসভায় যোগদানের ব্যাপারে যেসব বাধা ছিল সবকিছু দূরীভূত হয়ে গেল অধ্যাপক রাইটের সাহচর্যে এসে। বস্তুতঃ অধ্যাপক রাইটই তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে চিকাগো মহাসভায় যেতে সম্মত করিয়েছিলেন। আর শিকাগোয় না গেলে স্বামীজীর বিশ্বমনন বিজয়ের দ্বার কখনো উদ্ভাসিত হত কি না তা হলফ করে বলা মুস্কিল।

স্বামীজীর সাহচর্য পেয়ে সমগ্র রাইট পরিবারই বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। চারিদিকে একটা উৎসব-আনন্দ যেন বিরাজ করছিল। ছোট-বড় সকলে আনন্দে আত্মহারা। শুধু রাইট-পরিবার নয়, আশে-পাশের সকলেই ঐ আনন্দ-উৎসবের সুধা পান করেছিলেন। রাইট-পত্নীর দৃষ্টিতে স্বামীজী ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। ২৯শে আগষ্টের চিঠিতে শ্রীমতী রাইট লিখেছেন, "আমি এরপর যত বিশেষ উল্লেখযোগ্য লোক দেখিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে ইনি অন্যতম। আমরা সারাদিন, সারারাত আলাপ করিয়াছি, পরদিন সকালে আবার সাগ্রহে আলাপ শুরু করিয়াছি। তাঁহাকে দেখিবার জন্য সারা শহরে যেন আগ্রহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কুমারী লেনের বাড়ির অতিথিরা উল্লাসে আত্মহারা হইয়াছিলেন—তাঁহারা সবসময়ই ঐ বাড়ির ভিতর-বাহির করিতেছিলেন ; ক্ষুদ্রকায়া শ্রীযুক্তা মেরিনের নয়নদ্বয় উল্লাসে জ্বলিয়া উঠিয়ছিল, আর তাঁহার কপোলদ্বয় হইয়াছিল রক্তিম।"

স্বামীজীও গভীরভাবে পরিবারটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। অধ্যাপক রাইট ও তাঁর পত্নীকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বিশেষকরে তাঁদের শিশু সন্তানগুলির উপর ছিল স্বামীজীর অপরিসীম স্নেহ-ভালবাসা। সেলেমে থাকাকালীন স্বামীজী অধ্যাপক রাইটকে লিখছেন—

"আপনি, আপনার মহীয়সী পত্নী এবং শিশু-সন্তানগুলি আমার মনে এমন ছাপ রেখেছেন, যা কিছুতেই মুছে যাবার নয়। আমি যখন আপনাদের সঙ্গে থাকি, তখন সত্যি মনে হয়—স্বর্গের কাছাকাছি আছি। যিনি সবকিছুর দাতা, তিনি আপনার উপর তাঁর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বর্ষণ করুন।"[১]

স্বামীজী রাইট পরিবারের প্রতি এত বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে বাইরে নানা ব্যস্ততার মাঝেও তাঁদের কাউকে ভুলতে পারেন নি। বিশেষ করে তাঁদের প্রথম সন্তান অস্টিন স্বামীজীর খুব প্রিয় পাত্র ছিল। ৩০শে আগষ্ট-এর চিঠিতেও তিনি তাঁর সমস্ত শ্রদ্ধা-ভালাবাসা উজার করে অধ্যাপক-কে লিখছেন ঃ "আপনার গৃহিণীকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন। অস্টিন ও অন্য শিশুদের ভালবাসা দেবেন। আপনি সত্যই মহাত্মা এবং শ্রীমতী অতুলনীয়া।"[২]

১. বাণী ও রচনা, ৬।৩৭১, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩-এর চিঠি

২. বাণী ও রচনা ৩৭১।৩৭০

স্বামীজী মহাসভার পরে ২রা অক্টোবর আর একটি চিঠি অধ্যাপক রাইটকে দেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বরের প্রায় একমাস পরে এই চিঠি। ঐ একমাস স্বামীজী চিকাগোর ধর্মমহাসভায় অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে মহাসভায় বক্তৃতা করতে হয়েছে। সুতরাং সময়েরও খুব অভাব ছিল। সেকারণে নিকটতম বন্ধুকে যথাসময়ে চিঠি দিতে না পেরে স্বামীজীও নিজেকে কিছুটা অপরাধী বলে মনে করেছিলেন। ঐ চিঠিতে তিনি যা লেখেন তাতে অধ্যাপকজীর উপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ; শুধু শ্রদ্ধা নয় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে—"হে হৃদয়বান বন্ধু, আপনার কাছে আমি এমনই ঋণী যে, তাড়াহুড়ো করে—চিঠির উত্তর দেবার জন্যই—কিছু একটা লিখে পাঠালে তা আপনার অহেতুক সৌহার্দের অমর্যাদা হত।"

স্বামীজীর প্রতিভায় অধ্যাপক রাইট যারপরনাই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অপরদিকে স্বামীজীও অধ্যাপকজীর মতো একজন গুণী ও বহুমুখী পণ্ডিতের সংস্পর্শ পেয়ে নিজেকে তাঁদের মধ্যে উজার করে দিয়েছিলেন। এই দুই ভিন্ন মহাদেশের মানুষ একে অপরের সত্তার সঙ্গে অনিষ্ট হয়ে যেতে পেরেছিলেন। পাণ্ডিত্য—বাগ্মীতা নয়, হৃদয় দিয়েই একটি হৃদয় আরেকটি হৃদয়কে আপন করে নিতে পেরেছিলেন। যে সময়ে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়, সেসময় স্বামীজী কপর্দকহীন একজন অদ্ভূত পোশাক পরিহিত সন্ন্যাসী, আর অধ্যাপক রাইট হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালেয়র স্বনামধন্য গ্রীক ভাষার অধ্যাপক। গ্রীক ভাষার ও সাহিত্যের বাইরে ইতিহাস, প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা ও দর্শনে অধ্যাপক রাইটের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। শুধু এই সমস্ত বিষয়ই নয়, এর বাইরেও বহু বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে তাঁর বুৎপত্তি ছিল। তাঁর এই অসাধারণ প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের দিকে লক্ষ রেখে ডিকশেনারী অফ্ আমেরিকান বায়োগ্রাফিতে তাঁকে 'encyclopedec; (সর্ববিদ্যাপারঙ্গমশালী) বলা হয়েছে। স্বামীজীর প্রতিভা দীপ্ত পাণ্ডিত্য অনুধাবন করার মতো যোগ্য পাণ্ডিত্য অধ্যাপক রাইটের ছিল। অ্যানিস্কোয়ামে দীর্ঘ আলোচনায় দুজনে দুজনকে গভীরভাবে চিনেছিলেন। বিশেষকরে স্বামীজীর পাণ্ডিত্যে ও প্রতিভায় অধ্যাপক রাইট বিস্মিত হয়েছিলেন। শুধু রাইট নন, সমগ্র অ্যানিস্কোয়াম শহরের লোক তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে দেখার জন্য ছুটে এসেছিলেন সেদিন। মহাসভার সাফল্যের পূর্বে স্বামীজীর এই সাফল্য কর্ম নয়। বহু পাশ্চাত্য-মনকে তিনি ভারতচেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। অধ্যাপক রাইট ও তাঁর পরিবার ও অন্যান্যরা একটি অখ্রিষ্টান প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য চাঁদা তুলেছিলেন, যে প্রতিষ্ঠান একেবারে অখ্রিষ্টান ধারায় পরিচালিত হবে ঠিক হয়েছিল। এসব দেখে আপ্লুত হয়ে শ্রীমতী রাইটের চোখে জল এসে গিয়েছিল—২৯শে আগস্টের চিঠিতে এসব তথ্য রয়েছে। ঐ ২৯শে আগস্টের চিঠি অবলম্বন করেই আমরা স্বামীজীর একটি চিত্র তুলে ধরবো—সেই স্বামীজী অধ্যাপক পত্নীর দৃষ্টিতে কেমন?—"তিনি একজন সুশিক্ষিত ভদ্রলোক ; যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তির থেকে তাঁর জানার জগৎ বেশি। আঠারো বছর বয়স

থেকেই তিনি সন্ন্যাস-ব্রতে গ্রহণ করেছেন।.........অভাব তাঁদের নিত্যসঙ্গী। তাঁদের কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠান নেই, নেই সম্পদ, এমনকি তাঁরা ভিক্ষা করেও না ; কিন্তু তাঁরা বসে অপেক্ষা করে কারও ভিক্ষা-দানের জন্য। তাঁরা জীবন ও জগতের সত্যাসত্য সম্পর্কে মানুষের শিক্ষা দেয়। সবার উপরে তাঁর মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। তিনি এত সুচতুর যে যুক্তি পরম্পরার মধ্যে বক্তব্য বিষয়কে প্রাঞ্জল করে তুলে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারেন।"[১]

মেরী লুই বার্ক তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামীজী ও রাইট পরিবারের বহু অপ্রকাশিত খবর তাঁর গবেষণা গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। প্রয়োজনে সেসব খবর আমরা কিছু কিছু এখানে তুলে ধরবো।

শ্রীমতী রাইট স্বামীজীর খুব অনুরক্তা ছিলেন। তিনি স্বামীজীকে তাঁদের পরিবারের একজন বলে ভাবতেন। স্বামীজী তাঁদের অতিথি, এমন তাঁদের মনেই হতো না। এমনকি, স্বামীজী যখন তাঁদের মধ্যে ছিলেন না, বহুদিন অতিক্রান্ত হওয়ায় পরে-ও তাঁর স্মৃতি রাইট-পবিরারের স্মৃতির আকাশ থেকে মুছে যায় নি। অধ্যাপক রাইট ও শ্রীমতী রাইটের পুত্র, (ইনি আমেকিান জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ডিরেক্টার ছিলেন) শ্রীযুক্ত জন. কে. রাইট স্বামীজীকে তাঁর দু'বছর বয়সে দেখেছিলেন। কিন্তু "আমাদের স্বামী" এখনও এই কথা বলে চলেছেন। কে. রাইটের কাছ থেকে স্বামীজী-সংক্রান্ত কাগজপত্র ও তাঁর মায়ের একটি ডায়েরি শ্রীমতী বার্ক সংগ্রহ করে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। শ্রীমতী রাইট নিয়মিত স্বামীজীর আলোচনা নোট করতেন। একথা কে. রাইট বলেছেন।[২] শ্রীমতী রাইটের নোট থেকে জানা যায়, স্বামীজী যখন অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে বোর্ডিং হাউস ও অধ্যাপক কুটীরের মাঝখানের লন দিয়ে হেঁটে যেতেন, তখন অ্যানিস্কোয়ামের গ্রামবাসীরা এবং মিস লেনের বাসিন্দারা স্বামীজীর দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে দেখতেন। তাঁর সেই রাজকীয় ব্যক্তিত্ব ও অদ্ভুত পোষাক তাদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করতো। নানান প্রশ্ন তাদের মনে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো—তিনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? জাতি কি?—এইসব বিস্ময়মাখানো প্রশ্ন। যে ক'দিন অ্যানিস্কোয়ামে ছিলেন স্বামীজী, সেইসব দিনগুলো ব্যস্ততার মধ্যে কাটাতো হতো। বহু মানুষের বহু প্রশ্নের উত্তর তাঁকে দিতে হতো। সেসব প্রসঙ্গে স্বামীজী ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাস থেকে অনেক কথা তাদের শোনাতেন। বলাবাহুল্য, সেসব আলোচনার মধ্য দিয়ে তারাও ভারতবর্ষের ধর্ম-সংস্কৃতিকে জানার আগ্রহ দেখিয়েছিল। বিশেষকরে স্বামীজীর গল্প বলার টেকনিক্ শ্রীমতী রাইটের মন-কে আনন্দ দিত। ছবির মতো গল্পগুলিকে তিনি তাঁর ডায়েরিতে তুলে ধরেছেন। একটা গল্প এখানে তুলে ধরছি যার মধ্যে একটি সুন্দর নীতি-উপদেশ রয়েছে। এক ব্যক্তির স্ত্রী, তাঁর স্বামীর সাংসারিক কষ্টের জন্য নিন্দা করতো। অপরের উন্নতি দেখে তাঁর স্বামীকে ভৎসনা করতো এবং তার

ব্যর্থতার কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলতো। স্ত্রীটি বলতো, "এই কি তোমার ঈশ্বরের দান! তোমার ঈশ্বর তোমার জন্য কি করছে? তুমি তো তাঁকে বহু বছর ধরে সেবা করছো?" মানুষটি তখন খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছিল, "আমি ধর্ম-ব্যবসায়ী? ঐ পাহাড়ের দিকে তাকাও। ঐ পাহাড় আমার জন্য কি করছে? আর আমিই বা পাহাড়ের জন্য কি করি? কিন্তু তবুও ঐ পাহাড়কে আমি ভালবাসি, যেহেতু সুন্দরকে ভালবাসা মানুষের ধর্ম। তেমনি ঈশ্বরকেও ভালবাসি।"

স্বামীজী যখন উপনিষদের মন্ত্র গুরু গম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন তখন তাঁদের মনে ধ্বনিময় হয়ে উঠতো। সেসব মন্ত্র প্রথমে সংস্কৃতে আবৃত্তি, পরে সুর করে গাইতেন এবং সবশেষে ইংরেজিতে অনুবাদ করে শ্রোতাদের শোনাতেন। স্বামীজী আনিস্কোয়ামের শ্রোতাদের কাছেই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন, রাশিয়া অথবা চীন পৃথিবীর শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠবে এবং সেখান থেকেই প্রথম জাগরণ ঘটবে। সিস্টার ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথতেও এ বিষয়টির উল্লেখ আছে।[১] সারা সকাল-বিকেল-রাত্রি প্রায় সবসময়ই তিনি আগ্রহী শ্রোতাদের সঙ্গে বিচিত্র প্রসঙ্গে আলোচনা করতেন। অধ্যাপক রাইটের পরিবারের সকলে এবং আর যারা আসতেন সকলেই বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে তাঁর কথা শুনতেন। শ্রীমতী রাইটের কথায় "It was a kind of revival." বেশির ভাগ সময়ই তিনি ধর্ম প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন। যখন তিনি ঐসব গূঢ় অনুভূতি ও সত্যের কথা বলতেন তখন তিনি গুরু-গম্ভীর তন্ময় একজন ঋষি ; আবার কখনও কখনও তিনি অধ্যাপক রাইটের শিশু-সন্তানদের সঙ্গে খেলাধুলা করতেন। আনন্দে মেতে উঠতেন। অধ্যাপকের তিন সন্তানের মধ্যে অস্টিনই স্বামীজীর খুব প্রিয় ছিল। দশ বছরের একটি ছেলে কী গভীরভাবেই না স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। শুধু খেলা ধূলাতে নয়, স্বামীজীর গভীর অনুভূতির কথাগুলি অস্টিন মনোযোগের সঙ্গে শুনতো। জন. কে. রাইট তখন মাত্র দু'বছরের শিশু সন্তান। সম্ভবতঃ স্বামীজীর তখনকার কথা জন রাইটের স্মতিচিত্রে প্রতিভাত হয় নি। পরবর্তীকালে স্বামীজী সম্পর্কে তাঁদের পরিবারের স্মৃতি তাঁকে স্বামীজী সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অস্টিন ছিল মধ্যম পুত্র ; আর এলিজাবেথ জ্যেষ্ঠ—বয়স ছিল তখন তেরো বছর। একবার কেম্বিজে রাইট-পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন স্বামীজী, যাবার সময় অস্টিনের জন্য এক বাক্স ক্যাণ্ডি (একধরনের শর্করাজাতীয় খাবার) নিয়ে গিয়েছিলেন ; আর একবার অস্টিনকে এডুইন আর্নল্ড-এর 'লাইট অফ এশিয়া' বইটি উপহার দিয়েছিলেন। বইটিতে স্বামীজী স্বহস্তে লিখেছিলেন 'অস্টিনকে ভালবাসা ও আশীর্বাদসহ বিবেকানন্দ।' অস্টিনও স্বামীজীকে বিস্ময়ের চোখে দেখতেন। স্বামীজী ছিলেন অস্টিনের কাছে স্বপ্নের মানুষ। শ্রীমতী লুই বার্কের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, অস্টিন খুব অল্প বয়সে লোকান্তরিত হন। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুতে যে শ্রদ্ধার্ঘ তাঁর আত্মার প্রতি নিবেদিত হয়েছিল তাতে লেখা হয়েছিল ঃ There seem to have been no rough angels is his character, no

---

১. Remiscenes P. 203

bitterness in him."[১] তাঁর সম্পর্কেআরও বলা হয়েছে ঃ Charming, Simple and direct, he was recognized during his lifetime as "an extra-ordinary person of deep sympathy, wide intellectual interests and keen critical mind. "He was a kind of Renaissance man," আরও বলা হয়েছে "akin to Leonardo in the diversity of his interests,.......a man with a profound feeling for life in all the factual, poctic, realistic and imaginative wonder of it."

অস্টিনের মনের গড়নে স্বামীজীর প্রভাব পড়েছে সর্বাধিক। পেশাগত দিকে থেকে উকিল হলেও, মনটা ছিল কল্পনা-প্রবণ। ইতিহাসকার হিসাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 'আইল্যাণ্ডিয়া' লিখে। অস্টিনের 'আইল্যাণ্ডিয়া' একটি স্বপ্নের দেশ, যে দেশ তাঁর স্বদেশ আমেরিকার থেকেও তাঁর কাছে প্রিয়। সেই দেশকে তিনি শ্রদ্ধা ও ভালবাসতেন বেশি। তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পরে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে 'আইল্যাণ্ডিয়া' প্রকাশিত হলে পাঠকদের কাছে বইটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বইটি অস্টিনের কল্পনার যে নির্মল ও আদর্শময় জগৎ-এর মধ্যে থেকে লেখা হয়েছিল, সেই কল্পনার জগতে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের ও অনুভবের প্রভাব যে ক্রিয়াশীল ছিল, তাতে কোন মতদ্বৈততা থাকতে পারে না। বিশেষকরে স্বামীজীর কাছ থেকে যে অতীত ভারতবর্ষের মানুষ ও সমাজের কথা অস্টিন শুনেছিলেন, তার যথেষ্ট ছায়াপাত ঘটেছে। স্বামীজীর কণ্ঠে যে 'ওম্' মন্ত্র গুরু গম্ভীরভাবে গোটা পরিবেশেকে নিস্তব্ধ ও আধ্যাত্মিক-মন্ডিত করে রাখতো অস্টিনের শিশু মনে তা নিরন্তর অনুরণিত হতো। শ্রীমতী বার্ক অস্টিনের বোন সিলভিয়ার (শ্রীমতী পল. জে. মিতার্কি) কাছে শুনেছেন, অস্টিনের স্বপ্নের দেশ 'আইল্যাণ্ডিয়া'য় যে ধর্ম বিরাজ করতো তা কোন বিশেষ সম্প্রদায়গত ধর্মগত নয়। আইল্যাণ্ডিয়ার চার্চ হবে শান্তির নীড়, যেখানে মানুষ গিয়ে বসবে, বিশ্রাম নেবে, ধ্যানমগ্ন হবে। আবার কেউবা একে অপরের সঙ্গে কথা বলবে, কথা শুনবে। আইল্যাণ্ডিয়ার দেবীর নাম 'ওম্।' যদিও তিনি খ্রিষ্টান বিশ্বাসে পূজিত কোন দেবী নন। এই 'ওম্' শব্দটির মধ্য দিয়ে ভারতীয় হিন্দু ব্রহ্মাকেই নির্দেশ করে। স্বামীজীর মুখে প্রায়শই এ শব্দটি উচ্চারিত হতে শুনেছেন যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন। উপনিষদ থেকে মন্ত্রগুলো যখন স্বামীজী সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন অস্টিনের কল্পনাপ্রবণ মনে তা নিশ্চয়ই গভীর দাগ কাটতো। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ অনুভূতি তাঁর মনে অবশ্যই ছিল, অন্ততঃ 'আইল্যাণ্ডিয়া' গ্রন্থে 'ওম্' কবিতাটি পড়লে তা মনে হয়।[২]

---

১. মেরী লুই বার্ক ঃ 'ডিসকভারিজ—হিজ প্রফোটিক মিশন (১ম পর্ব) পৃঃ ৩৬ (Lawrence Clark Powell, "The Islandrin World of Austin wright" (a talk given to the Zamorun club in April, 1957) by the Libranian of California at Los Angeles).

২. মেরী লুই বার্ক ঃ ডিসকভারিজ (১ম) পৃঃ ৩৮—৩৯

স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় কর্মযজ্ঞে অধ্যাপক রাইট ও তাঁর স্ত্রীর সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা সব সময় বর্ষিত হতো। এমন কি ঘোর দুর্দিনে স্বামীজী নিজেকে অধ্যাপক রাইটের কাছে তুলে ধরেছেন। কোনরকম সঙ্কোচ নিয়ে তিনি রাইটের কাছে নিজেক গোপন করে রাখেন নি। তাঁর বিরুদ্ধে যখন গোঁড়া খ্রিষ্টানরা নিন্দা রটাচ্ছে, এমনকি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বামী বিবেকানন্দের সম্পর্কে কিছু অ-সত্য কথা বলেছিলেন, তখনও তাঁর আমেরিকার ব্যাপক সাফল্য সেমসয়ে গোড়া পন্থীরা শ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি। তারা নানাভাবে স্বামীজীর নামে অপপ্রচার চালিয়েছেন। স্বামীজীর মনে এসব ঘটনা গভীর আঘাত হেনেছিল। সেই দুর্দিনে তিনি অধ্যাপক রাইটের কাছে সব কথা খুলে বলেছেন—"হে সহৃদয় বন্ধু ও সর্বপ্রকারে আপনার সন্তোষ বিধান করতে ন্যায়তঃ আমি বাধ্য। আর বাকী পৃথিবীকে—তাদের বাতচিতকে আমি গ্রাহ্য করি না। আত্ম-সমর্থন সন্ন্যাসীর কাজ নয়। আপনার কাছে তাই আমার প্রার্থনা, আপনি ঐ পুস্তিকা ও চিঠি পত্রাদি কাউকে দেখাবেন না বা ছাপবেন না। বুড়ো মিশনারীগুলোর আক্রমণকে আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। কিন্তু আমি দারুণ আঘাত পেয়েছি মজুমদারের ঈর্ষার জ্বালা দেখে। প্রার্থনা করি তাঁর যেন চৈতন্য হয়।"[১]

২৪সে মে ৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো থেকে অধ্যাপক রাইটকে লিখেছেন ঃ "প্রিয় বন্ধু, আমি যে যথার্থই সন্ন্যাসী, এ বিষয়ে সর্বপ্রকারে আপনাকে আশ্বস্ত করতে আমি দায়বদ্ধ। কিন্তু সে কেবল 'আপনাকেই'। বাকি নিকৃষ্ট লোকেরা কি বলে না বলে, আমি তা পরোয়া করি না।" (৬।৪২৭) কারণ সন্ন্যাসীর কাছে সংগ্রামই লক্ষ্য। বহু কষ্টে, বহু সংগ্রাম ও দুঃখের পর আসে সাফল্য সিদ্ধি। অধ্যাপক রাইটকে লেখা 'Or Hill and dale and mountain range' কবিতায় স্বামীজীর সেই সংগ্রাম ও সিদ্ধির বাণীই ঘোষিত।[২]

(চার)

১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্টে, অর্থাৎ মহাসভার পূর্বেই অপর একজন মহৎপ্রাণা আমেরিকান বিদুষীর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় ঘটেছিল। তিনি হলেন মিসেস কেইট উড্‌স্। স্যানবর্ণের বাড়িতে এসে স্বামীজীকে তিনি তাঁর সালেমের ১৬৬ নং নর্থ স্ট্রীটের বাড়িতে অতিথি হিসাবে থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। স্বামীজীর অপূর্ব আধ্যাত্মিক চেহারা ও কথাবার্তা শুনে তিনিও খুব মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীজী তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মিসেস উড্‌স্-এর গৃহে এক সপ্তাহ বাস করেন। সালেম পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ছোট শহর। শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা সেখানে কম নয়। স্বামীজী 'থট অ্যাণ্ড ওয়ার্ক' ক্লাবে বক্তৃতা দেবার জন্য সালেমে এসেছিলেন। ২৮শে আগষ্ট তিনি ওয়েস্‌লি

---

১. বাণী ও রচনা (পত্রাবলী) ৬।৪২৫, ১৮৯৪ এর মে মাসে বোস্টন থেকে লেখা।

২. কবিতাটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছি পাশ্চাত্য ভাষায় স্বামীজীর রচনা (কবিতা) প্রবন্ধে।

চ্যাপেলে 'হিন্দুধর্ম ও হিন্দুপ্রথা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শুনে খ্রিষ্টান যাজকেরা তাঁর বক্তৃতার সমালোচনা করেছিলেন। বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, ভারতে মিশনারী না পাঠিয়ে বরং সেখানে কারিগরি বিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা করা উচিত। এছাড়া পাশ্চাত্যদেশের মানুষেরা ভারতবর্ষের রীতি-নীতি সম্পর্কে যে ভ্রান্তধারণা পোষণ করতেন, যেমন সতীদাহ, মূর্তিপূজা, জগন্নাথের রথের নিচে পড়ে আত্মহত্যা ইত্যাদি বিষয়গুলির সত্যাসত্য রূপকে তুলে ধরেছিলেন। ভারতবর্ষে যে জাতিভেদ প্রথা তা যে ধর্মের কোন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়, বৈদিক ধর্ম ব্যাখ্যা করে তিনি তা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। ২৯শে আগষ্ট শ্রীমতী উড্‌স্-এর উদ্যানে এক বালক-বালিকা সম্মেলনের সম্পর্কে ভারতবর্ষের বালক-বালিকাদের জীবনরীতি, ক্রীড়া-কৌতুক, বিদ্যাশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এসব বক্তৃতা শুনে শ্রীমতী উড্‌স্ স্বামীজীর প্রতি খুব প্রীত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র প্রিন্স ছিলেন তখন যুবক, চিকিৎসা বিদ্যার অধ্যায়ন করতেন। স্বামীজীর সঙ্গে উড্‌স্-এর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁর বয়স ছিল আঠান্ন। তিনি খুব গুণী মহিলা ছিলেন। লেখিকা হিসাবে তিনি বেশ খ্যাতি পেয়েছিলেন। সুদীর্ঘকাল তিনি সাহিত্য-সেবা করেছেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে কিছু শিশুপাঠ্য পুস্তকও ছিল। লেখিকা হিসেবে তাঁর যেমন খ্যাতি ছিল, বক্তা হিসাবেও তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। শ্রীমতী উড্‌স্-এর দৌহিত্রীর নিকট থেকে যে চিঠি শ্রীমতী বার্ক পেয়েছেন তাতে শ্রীমতী উড্‌স্-এর বক্তা-স্বরপটি সম্পর্কে উল্লেখ আছে, "তিনি ১০ই জুলাই, ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে মরা যান। তখন তাঁর বয়স ৭৫ বছর হয়েছিল। কিন্তু হাভ-ভাবে-চলনে-বলনে তাঁকে বৃদ্ধা বলে মনে হত না। সমগ্র দেশে তিনি বক্তৃতা করে বেড়াতেন।"[১] পূর্বেই বলেছি, বহু গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেছিলেন। যাদুবিদ্যার যে প্রবঞ্চনা এ সম্পর্কে 'হেস্টার হেপওয়ার্থ' নামে একটি বই লিখেছিলেন। এছাড়া 'এ ফেয়ার সেড অব্ মারবেলহেড,' 'হিডেন ইয়ারস্' ইত্যাদি অনেক বই রচনা করেছিলেন। ভাল কবিতাও তিনি রচনা করতে পারতেন। স্বামীজীর অন্তরতম সত্তাটিও ছিল কবিসত্তা। সুতরাং স্বামীজী এবং উড্‌স্-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হতে বেশি দেরি হয় নি।

সালেম পরিত্যাগ করে যাওয়ার পূর্বদিন অর্থাৎ ৩রা আগষ্ট তিনি ইস্ট চার্চে 'ভারতের ধর্ম ও দরিদ্র স্বদেশবাসী' এই বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন এবং ৪ঠা আগষ্ট তিনি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন স্যানবর্ণের আমন্ত্রণে সালেম পরিত্যাগ করে সারাটোগা স্প্রিংস নামক একটি স্থানে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য যান। উডস্ পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঐ কদিনে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সে কারণে উড্‌স-এর গৃহ পরিত্যাগ কালে তিনি তাঁর প্রিয়তম ভ্রমণ যষ্ঠিটি প্রিন্সকে এবং ট্রাঙ্ক ও কম্বলখানি শ্রীমতী উডস্‌কে দিয়ে আসেন। জিনিষগুলি দিয়ে বলেছিলেন, "যাঁরা এদেশে বাসকালে গৃহ সুখের ব্যবস্থা করেছেন, তাঁদের আমার

১. ডিসকভারিজ (১ম) শ্রীমতী মেরী লুই বার্ক, পৃঃ ৪৩—৪৩

সবচেয়ে ভাল জিনিষই দেওয়া উচিত।" মিসেস প্রিন্স উডস্ জানিয়েছেন, দ্বিতীয়বার স্বামীজী যখন উডস্ পরিবারের অতিথি হয়ে এসেছিলেন, সেসময়ই তাঁদের পরিত্যাগ করে আসার কালে স্বামীজী যষ্টিটি ডাঃ উডস্কে দিয়ে যান। সে সময় প্রিন্স চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করতেন। অপরদিকে, কম্বল ও ট্রাঙ্কটি শ্রীমতী টেন্নাট্ উডস্কে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে দান করেন। উল্লেখ্য, উডস্ পরিবারে স্বামীজীর দ্বিতীয়বার পদার্পণ শিকাগোর ধর্মমহাসভার পরে পরেই হয় নি। বেশ কয়েকমাস পরে তিনি এসেছিলেন। তখন স্বামীজী আমেরিকা উপমহাদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাদের কাছে সেমসয় 'যীশুখ্রীষ্ট-সম' হয়ে উঠেছেন। সেকারণে উডস্-পরিবার স্বামীজীর প্রদত্ত ঐ সমস্ত জিনিষগুলো তাঁর স্মৃতিচিহ্ন রূপে সুদীর্ঘকাল ধরে সংরক্ষণ করে এসেছেন। খুব মজার ব্যাপার, যে ট্রাঙ্কটি নিয়ে স্বামীজী অর্ধেক-পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন, সেটিই এমন একজনকে দিতে পারেন যাঁর সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব ছিল গভীর। সুতরাং উডস্-পরিবার স্বামীজীর যে কত নিকটের হয়ে উঠেছিল ঐ প্রদানই তাঁর নিদর্শন। শ্রীমতী বার্ক জানিয়েছেন, ১৯৫০ সালেও স্বামীজী প্রদত্ত ঐ জিনিষগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে সংরক্ষিত রয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ'

স্বামীজীর 'মিশনে' পাশ্চাত্যের কতিপয় ব্যক্তিত্ব

বিবেকানন্দ ও সারা বার্ণহার্ড

অনন্তকালের প্রবাহে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন আকস্মিক একটা কিছু নয়, তা দৈবনির্দিষ্ট। পাশ্চাত্যে ভারতীয় তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সঙ্গে ঐ দেশীয় গুণী মহিলা সারা বার্নহার্ডের সাক্ষাৎকার ঘটেছিল ঐ দৈবনির্দিষ্ট পথেই। সাক্ষাৎকারের সময় তাঁদের উভয়ের মধ্যে কী বিষয় আলোচিত হয়েছিল, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু উভয়ের সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে জগৎ চালকের একটা মহৎ উদ্দেশ্য যে সাধিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের সূক্ষ্ম ভাবাদর্শের প্রভাব বাংলা নট-নাট্যকার গিরীশ ঘোষের জীবনে পড়েছিল সেকথা সকলেরই জানা। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাচরণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীজীবনেও সেই পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল—তাঁর পৌরাণিক তথা আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পন্ন নাটকগুলিই তার প্রমাণ। অনুরূপভাবে, পাশ্চাত্যের বহু শিল্পীর জীবনকে প্রভাবিত করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী পাশ্চাত্যের বহু রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখেছেন। সে সময়ে বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল এবং কেউ কেউ তাঁর শিষত্বেও গ্রহণ করেছিলেন—সেকথা আমাদের জানা। তাঁদের জীবনে স্বামীজীর প্রভাব যে কত গভীর, বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী গায়িকা মাদাম ক্যালভে তার নিশ্চিত প্রমাণ। স্বামীজীর সংস্পর্শে আসার পরেই ক্যালভে আত্মহত্যার চিন্তা মাথা থেকে মুছে ফেলেন। সম্ভবত একারণেই স্বামীজী তাঁকে, 'লা দিভিন সারা' অর্থাৎ দেবী সারা বলতেন।

সারা বার্ণহার্ড (১৮৪৪—১৯২৩) প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। অমিত প্রতিভা নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাট্যপ্রতিভা ছিল অসাধারণ। কনভেন্টে শিক্ষা লাভ করে মাত্র ষোল বৎসর বয়সে রঙ্গমঞ্চে নামেন এবং খুব অল্প দিনের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তোলেন। তারপরে ফরাসী দেশ ত্যাগ করে লণ্ডনের Gaiety থিয়েটারে এবং পরে বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতে থাকেন। ১৮৯১ সালে তিনি দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকা ভ্রমণ করে বিশ্ববিখ্যাত হন। সমকালীন তরুণ নাট্য সমালোচক বার্নাড শ-এর সামনে কখনই বার্নহার্ড সংকুচিত হন নি। তিনি নিজেকে শিল্প-সুষমা ও ভাব মূর্চ্ছনা দিয়ে গড়েছিলেন।

বার্নহার্ড-এর সঙ্গে স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎকারটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বামীজী গিয়েছিলেন নিউইয়র্কের একটি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখার জন্য। সেই মঞ্চে একটি

আকর্ষণীয় ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বার্নহার্ড। সংসার-ত্যাগী বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করবার মরণপণ চেষ্টা করেছিলেন রাজ নর্তকীবেশী অপ্সরা বার্নহার্ড। খুবই চমৎকার অভিনয় করেছিলেন বার্নহার্ড এবং সেই সঙ্গে এত খুশি হয়েছিলেন যে, অভিনয়টির সারমর্ম লিখে পাঠালেন লণ্ডনের সি. ই. টি. স্টার্ডিকে (১৩-২-১৮৯৬)। স্বামীজীর চিঠিটি ছিল নিম্নরূপ ঃ—

"ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড এখানে 'ইৎশীল (Iziel) অভিনয় করেছেন। এটি কতকটা ফরাসী ধাঁচে উপস্থাপিত বুদ্ধজীবন। এতে রাজনর্তকী ইৎশীল বোধিদ্রুম মূলে বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট ; আর বুদ্ধ তাকে জগতের অসারতা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছেন। সে কিন্তু সারাক্ষণ বুদ্ধের কোলেই বসে আছে। যা হোক, শেষ রক্ষাই রক্ষা—নর্তকী বিফল হল। মাদাম বার্নহার্ড ইৎশীলের ভূমিকায় অভিনয় করেন। আমি এই যুদ্ধ ব্যাপারটা দেখতে গিয়েছিলাম। মাদাম কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে আমায় দেখতে পেয়ে আলাপ করতে চাইলেন। আমার পরিচিত এক সম্ভ্রান্ত পরিবার এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। তাতে মাদাম ছাড়া বিখ্যাত গায়িকা মাদাম ঘেরেল এবং শ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক টেসলা ছিলেন।"[১]

স্পষ্টতই এঁদের উভয়ের সাক্ষাৎকারটি নাটকীয়, অন্তত চিঠি থেকে যেটুকু প্রমাণিত হচ্ছে। স্বামীজীর সঙ্গে বার্নহার্ড-এর কথাবার্তা কী হয়েছিল তেমন কথা আমাদের জানা নেই ; তবে এটুকু অনুমান করা যেতে পারে, স্বামীজী বার্নহার্ড এবং তার দলটিকে বেদান্তের বাণী শুনিয়েছিলেন। বেদান্তের পথ যে বিজ্ঞান-সম্মত তা তিনি নিশ্চয় বলেছেন এবং সেই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদান্তের আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। স্বামীজী ঐ চিঠিতে লিখেছিলেন, "মাদাম (বার্নহার্ড) সুশিক্ষিতা মহিলা এবং অনেক দর্শনশাস্ত্র অনেক পড়ে শেষ করেছেন।"

স্বামীজীর সঙ্গে বার্নহার্ডের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয় ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে, 'ইউরোপীয় সভ্যতা—গঙ্গার গোমুখ' প্যারিস নগরীতে। স্বামীজীর নিকটতম বন্ধু মিঃ ফ্রান্সিস লেগেট তাঁর প্যারিসস্থ প্রাসাদে ভোজনের দ্বারা আপ্যায়িত করবার জন্য নিত্য নতুন ফরাসী যশস্বিনী নর নারীর মিলন ঘটাতেন। কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক গায়ক—গায়িকা অভিনেতা—অভিনেত্রী, চিত্রকর—ভাস্কর, শিল্পী প্রভৃতি নানা জাতীয় গুণীজনের সমাবেশ ঘটাতো। স্বামীজী লিখেছেন ঃ "সে পর্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিক—সমুত্থিত ভাববিকাশ ; মোহিনী সঙ্গীত, মনীষীমনঃসংযম সমুত্থিত চিন্তামন্ত্র প্রবাহ সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখতো।" স্বামীজী বার্নহার্ডের অভিনয় সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "মাদাম বার্নহার্ড বর্ষীয়সী, কিন্তু সেজে মঞ্চে যখন ওঠেন, তখন যে বয়স, পুরুষ বা নারী চরিত্রের অভিনয় করেন, তার হুবহু নকল। বালক, বালিকা যা বল তাই—হুবহু—আর সে আশ্চর্য আওয়াজ। এরা বলে তাঁর কণ্ঠে রূপার তার বাজে।" স্বামীজী পরিব্রাজক গ্রন্থে বার্নহার্ডের জনপ্রিয়তার কথা লিখেছেন—

"সার্দ প্রভৃতি নাট্যকার ন্যাপোলওঁ সম্বন্ধে অনেক নাটক লিখেছেন। মাদাম বার্নহার্ড, রেজাঁ প্রভৃতি অভিনেত্রী, কফেলা প্রভৃতি অভিনেতাগণ সে-সব পুস্তকে অভিনয় করে প্রতি রাত্রে থিয়েটার ভরিয়ে ফেলেচে। সম্প্রতি 'লেপলঁ' বা প্রভুর শাবক (L'Aiglon I.e.the Duke of Reichstaolt) নামক এক পুস্তক অভিনয় করে। মাদার্ম বার্নহার্ড প্যারিস নগরীতে মহাআকর্ষণ উপস্থিত করেছেন।" এই গড়ুর শাবক নামকরণটি স্বামীজীর দেওয়া। তাঁর চোখে নেপোলিয়ন গড়ুরের মতোই বীর যোদ্ধা ছিলেন। নাটকের নাম ভূমিকায় অর্থাৎ নেপোলিয়নের বালক পুত্রের ভূমিকায় অভিনয় করতেন ছাপান্ন বছরের বৃদ্ধা বার্নহার্ড। কী আশ্চর্য ব্যাপার! ভাবতেও অবাক লাগে। কৃষ্টফার ইশারউড তাঁর Exhumation গ্রন্থে বার্নহার্ডের এই অভিনয় সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

"She.........present's an astonishing slender and erlit little personage in a riding coat and high boots with spurs, neither boy nor girl, women nor man, sexless, ageless and altogether impossible by day light, outside the walls of a theater."

[উদ্বোধন ৭০মত বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৪০]

—একটু মজা করে ঈশারউড লিখেছেন 'unkind camera' বার্নহার্ডের বয়স অত্যন্ত কমিয়ে দিয়েছে। স্বামীজীর পরিব্রাজকে লেখা বর্ণনার সঙ্গে এ বর্ণনার একটা সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। তিনি বার্নহার্ডের এই নাটকের অভিনয় নিশ্চয়ই দেখেছিলেন।

এই বার্নহার্ড স্বামীজীর স্বদেশ, মাতৃভূমি—ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতেন। গভীর অনুরাগ ছিল এই দেশ সম্পর্কে। তাঁর সম্পর্কে স্বামীজী 'পরিব্রাজককে' মন্তব্য করেন—ঃ "বার্নহার্ডের অনুরাগ বিশেষ ভারতবর্ষের উপর। আমায় বারংবার বলেন, তোমাদের দেশ সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন, তাতে মঞ্চের উপর বিলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া করে দিয়েছিলেন—মেয়ে ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা, বিলকুল ভারতবর্ষ!! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন আমি মায়া বধি প্রত্যেক মিউসিয়ম বেড়িয়ে ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোষাক, রাস্তাঘাট পরিচয় করেচি।" কি অদ্ভুত প্রয়াস। নিজেকে শিল্পের সঙ্গে একাকার করে ফেলতেন বার্নহার্ড। অসাধারণ শিল্প প্রতিভা এবং গভীর অনুশীলন সেকালে তাঁকে করে তুলেছিল জগৎ বিখ্যাত। ভারতীয় আঙ্গিকে এবং রীতিতে তিনি কেবল একখানিই নাটক অভিনয় করেছিলেন তা হচ্ছে, Morand And Silvestre রচিত 'Izeil' (ইৎশীল)। স্বামীজীর সান্নিধ্যে তিনি আসেন এই নাটকখানির সুবাদেই।

দেবী সারা সম্পর্কে পরিব্রাজকে স্বামীজীর যে বিবরণ, তাতে মনে হয় বার্নহার্ডের দ্বারা স্বামীজী অতিমাত্রাই প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং এই প্রভাবের অন্যতম কারণ, আমাদের মনে হয়, সারা বার্নহার্ডের ভারতপ্রীতি। দেশপ্রেমিক স্বামীজীর মনে সারার ভারতপ্রীতি যে কী গভীর প্রভাব ফেলেছিলো তার পরিচয় নিম্নোক্ত অংশ ঃ—

"বার্নহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল। সে মঁ র‍্যাভ (Ce mon rave), 'সে মঁ র‍্যাভ'—সে আমার জীবন স্বপ্ন। আবার প্রিন্স অব্ ওয়েলস তাঁকে বাঘ, হাতি শিকার করাবেন প্রতিশ্রুত হয়েছেন। তবে বার্নহার্ড বললেন—সে দেশে যেতে গেলে দেড় লাখ দুলাখ টাকা খরচ না করলে কি হয়? টাকার অভাব কি? যাঁর স্পেশাল ট্রেন ভিন্ন যাতায়াত নেই, সে ধুমবিলাস, ইউরোপের অনেক রাজরাজড়া পারে না। যার থিয়েটারে মাসাবধি আগে থেকে দুনো দামে টিকিট কিনে রাখলে তবে স্থান হয়, তাঁর টাকার বড় অভাব নেই। তবে সারা বার্নহার্ড বেজায় খরচে। তাঁর ভারতভ্রমণ কাজেই এখন রইল।

সারা বার্নহার্ডের ভারত আসা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তাঁর ভারতপ্রীতি শুধু স্বামীজী কেন, আমাদেরকেও বিস্মিত করে দেয়। ভারতপ্রেমিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জীবন যা মূলতঃ ভারতচেতনার মূর্তিমান বিগ্রহ তা নিবেদিতাকে যেমন আকৃষ্ট করেছিল, ঠিক তেমনি সারাকেও। প্যারিসেই বার্নহার্ডের সঙ্গে স্বামীজীর শেষ সাক্ষাৎকার ঘটে। পরস্পরের কথোপকথনকেই যদি যোগসূত্রের মাধ্যম ধরা হয় তবে উভয়ের সাক্ষাৎকার মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু মহৎ জীবন শুধু প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষভাবে থেকেও, অন্তরালে থেকেও বিশ্বের যে-কোন প্রান্তের মানুষকে কাছে টানতে পারে—প্রভাবিত করতে পারে। স্বামীজীর মহৎ হৃদয়ও তেমনি প্রভাবিত করেছিল সারাকে। অপরদিকে সারার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জীবনচর্চা তথা ভারতপ্রেম স্বামীজীকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। স্বামীজী সরাসরি সূক্ষ্মভাবেও অপরের ভিতর ভাব সঞ্চালন করতে পারতেন। স্বামীজীর 'দৈবী সারা'ও ঐভাবে স্বামীজীর আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। তা না হলে, হাসপাতালে বিরাট অপারেশনের সময় যখন সকলে শঙ্কিত ছিলেন তখন সারা নির্বিকারভাবে বলেছিলেন ; "তোমরা ঘাবড়ে যেও না আমি খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবো।"[1] অসাধারণ ছিল তাঁর মনোবল। স্বামীজীর আশীর্বাদের দান ছাড়া এ মনোবল কি সম্ভব!

'স্বামীজী ও গুডউইন'

জে, জে, গুডউইন স্বামীজীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন একজন সাংকেতিক লিপিকার হিসাবে নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে। কিন্তু একথা সকলেরই সুবিদিত, মাত্র সপ্তাহকাল পরে....তিনি অবৈতনিক ভাবে ভারতীয় সন্ন্যাসীর বহু বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনার সাংকেতিক লিপিকারের কাজ করতে থাকেন এবং ক্রমশ স্বামীজীর একজন একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত ভক্ত সেবকে পরিণত হন। বেতনশীল সাংকেতিক লিপিকার থেকে অবৈতনিক সাংকেতিক লিপিকারে পরিণত হওয়ার পশ্চাতে তাঁর জীবনে ঐ অতি স্বল্প দিনগুলোর মধ্যে স্বামীজীর যে কী অপরিসীম প্রভাব পড়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। গুডউইন স্বামীজীর সংস্পর্শে দৈব নির্দেশেই এসেছিলেন, তা ইতিহাস প্রমাণ দেয়।

---

১. ১৪২ পৃঃ উদ্বোধন, ৭০ তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রথম আবির্ভাবেই স্বামী পাশ্চাত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। পরিচিত হয়েছিলেন 'Cyclonic Hindu Monk of India' (ঝঞ্ঝাপ্রতিম হিন্দু ভারতীয় সন্ন্যাসী) অথবা 'Warrior Monk of India' (বীর ভারতীয় সন্ন্যাসী)-রূপে। প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর সেই ঐতিহাসিক অভিযানের কথা ভারত ও পাশ্চাত্যের নানান পত্র পত্রিকায়। সে অভিযান দৃঢ় পদক্ষেপে চলেছিল উপল-বন্ধুর পাশ্চাত্য ভাবজগতের মধ্য দিয়ে ভারতচেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতচেতনা তথা বেদান্তের পথকে অন্বয় সাধন করতে। আমেরিকায় থাকাকালীনই রাতারাতি তিনি বিশ্ববিখ্যাত বেদান্ত প্রচারক রূপে পরিচিত হন। ফলে সেখানকার নানা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁকে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান আসতে থাকে এবং ভাবতে অবাক লাগে স্বামীজী প্রায় সর্বত্রই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় শুধু ধর্মই ছিল না, উপস্থিত বক্তা স্বামীজী ভারতের শিক্ষা, শিল্প, সমাজ ও পৌরাণিক ইতিহাস সম্পর্কে অনর্গল বক্তৃতা করে শ্রোতাবৃন্দকে মুগ্ধ করে রাখতেন। পাশ্চাত্যের কৃতী লেখিকা বিবেকানন্দ-ভক্ত মেরী লুই বার্কের "Swami Vivekananda : New Discovery in America" গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি, স্বামীজী শুধু চিকাগো বক্তৃতার পরেই নয়, আমেরিকা পৌঁছানোর পর এবং চিকাগো বক্তৃতার পূর্ব থেকেই অসংখ্য বক্তৃতা ও ভাষণ বোষ্টন, অ্যানিস্কুয়াম প্রভৃতি শহরে দিয়েছিলেন। প্রথম দিকে এসব বক্তৃতা বিনা-দর্শনীতেই করেছিলেন, কারণ ভারতীয় সন্ন্যাসধর্মের তা ছিল একটা প্রথা বা আদর্শ। পরবর্তীকালে তিনি সেই প্রথাকে অন্তত দুটি কারণে রক্ষা করে চলেননি, তা হলো, এক. ঐশ্বর্যদৃপ্ত ও নিয়মানুবর্তিতার পীঠস্থান আমেরিকার সামাজিক জীবনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা তিনি বক্তৃতা-কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দর্শনী অর্থের বিনিময়ে করতে চেয়েছিলেন ; দুই. অর্থশালী প্রতিপত্তিবান পাশ্চাত্য থেকে বক্তৃতার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে স্বদেশের নিরন্ন মানুষের কাছে অন্ন-বস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার আশায় ভারতীয় সন্ন্যাস-রীতি তিনি ভঙ্গ করেছিলেন। অর্থের বিনিময়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কৃষিকে উন্নত করে সাধারণ মানুষ যাতে সুস্থ-জীবন লাভ করতে পারেন, এ অভিপ্রায় তাঁর যে ছিল একথা সুবিদিত। যাইহোক, বক্তৃতা কোম্পানীর কাছে প্রতারিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় বলে তিনি ঐ কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে পুনরায় স্বাধীনভাবে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন।

স্বামীজীর পাশ্চাত্য ভ্রমণের ইতিহাস থেকে জানা যায়, তিনি সেখানে শুধু বক্তৃতায় দিতেন না, জ্ঞান পিপাসু ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুরোধে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের শেষ ভাগ থেকে তিনি আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক শহরে ধ্যানধারণা শিক্ষা তথা যোগাভ্যাসের নিয়মিত ক্লাসও শুরু করেন। ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত স্বামীজীর

অমূল্য ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা, আলোচনা ও ভাষণরাশি নিয়মিত লিপিবদ্ধ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই তাঁর বাণীর বহু তথ্যই আমাদের অজানা থেকে গেছে। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগে মিস জোসেফাইন ম্যাকলাউড প্রমুখ স্বামীজীর কয়েকজন বিদগ্ধ ও দূরদর্শী সম্পন্ন অনুরাগী শিষ্য-শিষ্যা ও বন্ধুর প্ররোচনায় একজন কুশলী সাংকেতিক লেখক রাখবার কথা ঠিক হয় এবং পরীক্ষামূলকভাবে দু' একজনকে নিযুক্ত করে বিফল মনোরথ হলে দৈব-প্রেরিতরূপেই গুডউইন নিযুক্ত হন। অসাধারণ কুশলী সাংকেতিক লিপিকার হিসাবে মোটা বেতনের বিনিময়ে তিনি কর্মে যোগদান করেন।

গুডউইন সে সময় ছিলেন একজন অবিবাহিত বৃটিশ যুবক। জন্ম ইংলণ্ডে। স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় বয়স ছিল আনুমানিক পঁচিশ বৎসর।[১] সেখানে তিনি তিনটি পত্র পত্রিকার সম্পাদকরূপে ও বহুস্থানে ক্ষিপ্র লিপিকার রূপে কাজ করবার পর ভাগ্যান্বেষণে—অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বহুস্থান ঘুরে যখন আমেরিকা আসেন, সময়টা ১৮৯৫-এর ডিসেম্বর মাস। ঠিক তখনই দৈব-প্রভাবে স্বামীজীর পদপ্রান্তে আশ্রয় পান। আজ আমাদের কাছে স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা'-র যে অমূল্য পুস্তকগুলি এসে পৌঁচেছে, তা এই মহৎ হৃদয় গুডউইনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ভক্তি নিবেদিত প্রাণের জন্যই সম্ভব হয়েছে। মাত্র এক সপ্তাহকাল স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে তিনি বিমোহিত হয়ে পড়েন।

স্বামীজীকে তাঁর মনে হয় একজন অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ রূপে। স্বাভাবিকভাবে, স্বামীজীর বক্তৃতা গ্রহণ করে ও তাঁর গাঢ় সান্নিধ্যে এসে গুডউইনের ভাব-ধারার অমূল্য পরিবর্তন ঘটে এবং ফলত বিপুল উদ্যোগ নিয়ে স্বামীজীর কর্মযজ্ঞের সঙ্গী হন। পূর্ব জীবনের উশৃঙ্খলতারূপ পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি ঐ পথই বেছে নেন। সেই গুডউইনের মুখে কী অনাসক্ত কমযোগী সুলভ উক্তি।—

"স্বামীজী যদি তাঁর জীবনটাই পরহিতের জন্য দিতে পারেন—তবে গুডউইন না হয় তার পারিশ্রমিকটা দিয়ে দিলে। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি আধিকারিক পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে এসে গুডউইনের এই পরিবর্তনে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। জীবকল্যাণ উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মহাপুরুষদের প্রবল ইচ্ছাশক্তিই যেন ঐশী শক্তির সাথে মিলিত হয়ে এ সমাজ 'পূর্বনির্দিষ্ট' মহাত্মাগণকে তাঁদের সহকারী তথা সাহায্যকারীরূপে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে। তারই জলন্ত প্রমাণ গুডউইন। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই কোর্ট-স্টোনোগ্রাফার মিঃ জে. জে. গুডউইন স্বামীজীর একান্ত অনুরাগী শিষ্য My faithful goodwin-এ রূপান্তর। উল্লেখ করা যেতে পারে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি স্বামীজীর ভাবধারাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা পারেন নি পূর্বসূরী সাংকেতিক লিপিকাররা।

---

১. 'কথাপ্রসঙ্গে' উদ্বোধন পত্রিকা, পৃঃ ২২৮, ৬৯তম বর্ষ, ৫ম সংখ্য

মাস্টারমশায় শ্রী মহেন্দ্র গুপ্ত ওরফে 'শ্রীম' ছায়ার মতো অনুশীলন করেছিলেন পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণকে। নিশ্চয়ই পরমেশ্বর তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন ঊনিশ শতকে একজন ত্যাগী আত্মভোলা অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের মুখ-নিঃসৃত বাণীকে সর্বকালের মানুষের জন্য,—তাদের পাথেয় হিসাবে ধরে রাখার জন্য। শ্রীম কি জানতেন কালে ঐ নিরক্ষর ব্রাহ্মণই ভগবান রূপে পূজিত হবেন? বিবেকানন্দ ও গুডউইনের যোগাযোগের ক্ষেত্রেও সেই একই প্রশ্ন জাগতে পারে—গুডউইন কি দৈবপ্রেরণা পেয়েছিলেন যে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মানুষের কাছে ঐ ভারতীয় সন্ন্যাসী তাদের চলার পাথেয় পাবে। সেকারণে কী অক্লান্ত পরিশ্রমেই না তাঁর গুরুর সেই অমৃতবাণীকে লিপিবদ্ধ করতেন গুডউইন। স্বামীজী কিছুকাল নিউইয়র্ক কেন্দ্রে বক্তৃতা ও ক্লাস করবার পর মিঃ স্টার্ডি ও মিস মুলার প্রমুখ ইংলণ্ডের কয়েকজন অনুরাগী শিষ্যের নাছোর অনুরোধে ও আমন্ত্রণক্রমে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগে প্যারী হয়ে দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড ভ্রমণে আসেন। সেখানে পৌঁছবার অব্যাহিত পরেই তিনি বক্তৃতা ও ক্লাস আরম্ভ করেন। ঐ সময় গুডউইন স্বামীজীর নিত্য সহচররূপে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন এবং প্রকাণ্ড অনুরাগ ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁর বক্তৃতা ও আলোচনা প্রভৃতির দ্রুত নোট নিতেন। স্বামীজীর ইংল্যাণ্ড পৌঁছানোর কিছুকাল পূর্বেই তাঁর আহ্বানে স্বামী সারদানন্দ ভারতবর্ষ থেকে তাঁকে সহায়তা করার জন্য সেখানে আসেন এবং মিঃ স্টাডির গৃহে অবস্থান করতে থাকেন এবং তাঁর আসার কিছুকাল পরেই গুডউইনও আমেরিকা থেকে সেখানে আসেন। স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে গুডউইনের হৃদ্যতা সেই সময় থেকেই বাড়তে থাকে এবং গভীর বন্ধুতে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে পরে বলার চেষ্টা করবো।

গুডউইন স্বামীজীর সঙ্গে বিভন্ন বক্তৃতায় ঘুরতে ঘুরতে গুরুদেবের কর্মের সঙ্গে ক্রমশ নিজেকে নিবিষ্ট করে ফেলেছিলেন। লণ্ডন শহরের পিকাডেলি অঞ্চলে ওয়াটার পেইনটিং গ্যালারীতে স্বামীজীর জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের উপর বক্তৃতা চলছে। সে সময় গুডউইনের ভূমিকা কেবলমাত্র সাংকেতিক লিপিকারই ছিল না, অনুগত সেবক ও একান্ত সচিব রূপেও তিনি তখন স্বামীজীর সেবা করে চলেছেন। কোন্‌দিন স্বামীজী কী বিষয়ের উপর বক্তৃতা, কখন এবং কোথায় বক্তৃতা দেবেন—তা পূর্বেই লিখে চার্চ-কলমে লিখে তিনি ঘোষণা করে দিতেন। এছাড়া, স্বামীজীর কোন সংস্থা বা ব্যক্তির বাড়ি নিমন্ত্রণ আছে, কখন যাবার সময়, তাঁর বক্তৃতা কোন কোনটা পুস্তকাকারে ছাপাতে হবে—ইত্যাদি সবকিছু কাজেরই বন্দোবস্ত গুডউইনকে করতে হতো।

গুডউইন আর একটি কাজও খুব সচেতনভাবে করতেন। স্বামীজী বক্তৃতা হয়তঃ তখনও শুরু করেন নি, মঞ্চের বাইরে সাধারণ কথাবার্তায় মগ্ন আছেন ; গুডউইন তখন স্বামীজীর কানে কানে কোন্ বিষয়ে বক্তৃতা দেবার কথা কাগজে বিজ্ঞপিত হয়েছে তা জানতেন। স্বামীজী তাঁর কথায় বক্তৃতা দেবার জন্য মঞ্চের দিকে এগিয়ে যেতেন। স্বামীজীর

বক্তৃতা, তা তিনি যত দ্রুতই দিন না, তিনি ক্ষিপ্রভাবে নোট করে নিতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মধ্যে এমন একটি ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল, যার মাধ্যমে তিনি (স্বামীজীর ইংরেজি ও বাংলা জীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যাচ্ছে) স্বামীজীর মুখনিঃসৃত প্রায় সকল কথায় তিনি যথাযথভাবে ধরে রাখতেন। কোন কোন দিন বা বক্তৃতান্তে ক্লান্ত হয়ে স্বামীজী গুডউইনের সাথে—কী বক্তৃতা দিলেন, বক্তৃতা কেমন হলো, বিষয়ে কথপোকথন করতেন। আর যেদিন গুরুদেবের বক্তৃতা জমে উঠতো সেদিন গুডউইনের কী অপরিসীম যে আনন্দ হতো, তা বলাইবাহুল্য।

ঘরে এবং বাইরে—উভয় পরিবেশেই গুডউইন স্বামীজীর নিত্যসহচর ও সেবক। বাইরের ক্ষেত্রে যেমন দেখলাম তিনি একান্ত সেবকের মতো কাজ করে চলতেন, ঘরেও তেমনি। একটি ঘটনার কথা বলি। একদিন স্বামীজী নানা ধরণের কাজের চাপে এক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়ার কথা একদম ভুলেই গেছেন। হয়ত সে নিমন্ত্রণে যেতেই হবে। এমনি সঙ্গে সঙ্গে হাঁক ডাক পড়ল গুডউইনের। পোষাক পরিচ্ছদ-টুপী, লাঠি থেকে শুরু করে স্বামীজীকে গাড়িতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত গুডউইনের প্রায় দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মের মধ্যে পড়তো। তাঁর সে কর্ম আসলে সেবারই নামান্তর। কী অপরিসীম ভক্তি নিয়ে তিনি ঐ সেবা দিনের পর দিন করে যেতেন। এমনিভাবে কাটছিল আনন্দেই। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে জুন অবধি ছিল ঐ সময়সীমা। লণ্ডন শহরে থাকা-খাওয়ার সমস্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। তাই একদিন গুডউইন স্বামীজীকে বললেন, "স্বামীজী। আমার জন্য আপনার কতই না অসুবিধা হচ্ছে। তার চেয়ে বরং আমায় কিছুকালের জন্য আমেরিকা পাঠিয়ে দিন—সেখানে গিয়ে আপনার বই, প্যামপ্লেট প্রচার প্রভৃতি কাজ কিছু করি এবং বাইরে কিছু রোজগারের চেষ্টা করি।" স্বামীজী তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত সহচরকে সাময়িকভাবে ছেড়ে দেওয়ার চিন্তায় খুবই দুঃখিত হলেন। অবশেষে আমেরিকায় প্রচারের কাজে স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। আনুমানিক জুন মাসের শেষ সপ্তাহে গুডউইন গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে লণ্ডন থেকে আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছলেন। বাসস্থান নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি।

স্বামীজীর ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে গুডউইনের যে ভূমিকা আমরা দেখতে পেয়েছি, স্বামী সারদানন্দের দৈনন্দিন কর্ম বা বক্তৃতা—আলোচনার সময়ও তাঁর সেই একই ভূমিকা ছিল। তিনি সর্বদাই স্বামী সারদানন্দের সাহায্য কল্পে প্রস্তুত থাকতেন। বক্তৃতা শেষে আমেরিকান শ্রোতারা স্বামী সারদানন্দকে ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম সম্পর্কে নানা জটিল প্রশ্ন করতেন এবং পাদ্রীদের প্রচারিত কাল্পনিক কুসংস্কার, যেমন কুমীরের মুখে সন্তান নিক্ষেপ প্রভৃতি উদ্ভট বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। স্বামী সারদানন্দের উত্তর দেওয়ার সময় গুডউইন তাঁকে সাহায্য করতেন। আর সবথেকে উল্লেখযোগ্য যেটি তা হলো ঃ স্বামীজী সম্বন্ধে পাদ্রীদের দ্বারা

ঈর্ষাপ্রণোদিত নানা ধরণের অপপ্রচারের বিরুদ্ধেও তিনি বক্তৃতা মঞ্চে ও খবরের কাগজে প্রয়োজন মত জোর প্রতিবাদ করতেন। ঐ সময় স্বামী সারদানন্দের সহযোগে আমেরিকার প্রচার কার্যও চালিয়েছিলেন। মিসেস ওলিবুলকে লেখা ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে স্বামীজীর একটি চিঠিতে তাঁদের প্রচারকার্যকে উৎসাহদানের কথা দেখতে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন ঃ 'গুডউইন ও সারদানন্দ যদি আমেরিকায় কাজের প্রচার করতে পারে তো ভগবৎসহায় তারা তা করতে থাকুক।' গুডউইন তাঁদের আমেরিকার প্রচারকার্য কেমন চলছে বা ঐ সম্পর্কে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে পথনির্দেশের ব্যাপারে স্বামীজীকে চিঠি দিতেন। আমরা স্বামীজীর পত্রাবলীর মধ্যে পুডউইনকে লেখা স্বামীজীর একটি পত্রের সন্ধান পেয়েছি। চিঠিখানি সুইজারল্যাণ্ড থেকে লেখা ১৮৯৫-এর ৮ই আগষ্ট। স্বামীজী অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সন্ন্যাসীর একান্ত কাম্য অনাসক্ত কর্মযোগ, চূড়ান্ত বৈরাগ্য ও অদ্বৈতজ্ঞান সম্বন্ধে গুডউইনকে গীতা ও উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি সহ যে তত্ত্বোপদেশপূর্ণ চিঠিখানা লিখেছেন, তার ভাব গুরগম্ভীর ; ভাষা মন্ত্রবৎ এবং বিষয় অনন্ত বৈচিত্রে পরিপূর্ণ। গুডউইনের উপর স্বামীজীর যে সুগভীর প্রভাব তার প্রমাণ, মাত্র আট মাস সময়ের মধ্যেই তাঁর মননভূমির অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। মাত্র ঐ আট মাস মাত্র সময়ের মধ্যেই তিনি ব্রহ্মাচর্যাশ্রম অতিক্রম করে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশধিকার লাভ করেন। তিনি নিশ্চয়ই সাধনায় এমন এক পর্যায়ে অনুপ্রবেশ করতে পেরেছিলেন, যে অবস্থায় গভীর অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন গুরুদেবের ঐ বাণী 'জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি' (গীতা), 'তমেবৈকং জানথ আত্মানস্, অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ' (মুণ্ডক—উপনিষদ)—স্বাভাবিকভাবেই ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কখনোই স্বমীজী এইসব চূড়ান্ত বৈরাগ্যপূর্ণ শাস্ত্রীয় উপদেশ কোন অনাধিকারী শিষ্যকে লেখার প্রয়োজন মনে করতেন না।

সারা বার্নহার্ডের ভারতকে দু'চোখ ভরে দেখবার স্বপ্ন সার্থক হয় নি, গুডউইনের তা হয়েছিল। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে প্রচার কার্য সাময়িকভাবে শেষ হলে স্বামীজী ১৯৯৫-এর ডিসেম্বরে ভারতবর্ষের পথে রওনা হন। গুডউইন তখন তাঁর সঙ্গী হন। আর ছিলেন ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার। কলম্বো থেকে আলমোড়া এবং মাদ্রাজ থেকে কলকাতা সর্বত্র স্বামীজী যে বিপুল রাজকীয় সম্বর্দ্ধনা পেয়েছিলেন, তাঁর সাক্ষী ছিলেন অনুচর গুডউইন। 'ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থের বিবরণ থেকে দেখি ; কী বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল ভারতীয় জনমানসে। স্বামীজীর ঐতিহাসিক পাশ্চাত্য অভিযানের সাফল্যে ভারতীয়দের গর্ব প্রকাশিত হয়েছিল। অন্তত স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য যে বিপুল সমাবেশ হয়েছিল সর্বত্র সেটাই তার প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গবেষক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থে—এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। গুডউইনের কথায় ফিরে আসি। সে সময় বিশ্বস্ত শিষ্য গুডউইন স্বামীজীর পাশে ছায়ার মতো থেকে তাঁর মুখনিঃসৃত প্রায় প্রত্যেকটি কথাকে ঐকান্তিক

নিষ্ঠা ও যত্নসহকারে লিপিবদ্ধ করে রাখতো। সাংকেতিক লিপিকারের ভূমিকা নিয়ে তিনি ঐ কাজ করতেন না ; 'গুরুর উদ্দিষ্ট কার্য' বলেই তিনি তা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ করে যেতেন। গুরুর সেই আকাশ সমান কীর্তিকে কী গভীর মূল্যের মতোই-না তিনি বিবেচনা করতেন। গুরুর জন্য শিষ্যের এমন আত্মনিবেদন ইতিহাসে বিরল।

গুডউইনের পদধূলিতে মাদ্রাজের 'Ice House' এবং কলকাতার গোপাললাল শীলের বাগানবাড়ী ধন্য, ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে তা আজও স্মরণীয়। সাত্ত্বিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। একান্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মত ছিল তাঁর আচার ব্যবহার। স্বামীজীর সান্নিধ্যে বাসকালে গুডউইনকে দেখে অনেকে তাঁকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলেই মনে করতেন। ধুতিচাদর পরিহিত অবস্থায় একজন অভারতীয় যুবককে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সদৃশ বলে অনেকের নাকি ভ্রমও হতো। পূর্বেই বলেছি, গুডউইন ভারতবর্ষকে, তার মানুষকে, প্রকৃতিকে দু'চোখ ভরে দেখেছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত, এমনকি সুদূর পাঞ্জাব ও কাশ্মীর পর্যন্ত সারাভারত পরিক্রমা করেছেন তিনি এবং স্বামীজী যেখানে যা বক্তৃতা বা আলোচনা করেছেন তার সাংকেতিক লিপি গ্রহণ করেছেন। কিছুকাল বাদে তিনি মাদ্রাজে গিয়ে 'মাদ্রাজ মেল' সংবাদ পত্রের অফিসে চাকুরী নেন। এই পত্রিকায় স্বামীজীর সম্পর্কে যে সমস্ত লেখা বের হয় তার বেশির ভাগের পিছনেই গুডউইনের অবদান ছিল।

স্বামীজীর একান্ত অনুরাগী এই শিষ্য বেশিদিন এ পৃথিবীর বুকে থেকে স্বামীজীর সেবা করে যেতে পারেন নি। হঠাৎ ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ২রা জুন সাময়িক অসুস্থতার কারণে তাঁর দেহান্ত হয়। যাইহোক, গুরুর অপরিসীম আশীর্বাদ গুডউইন পেয়েছিলেন। তাঁর গভীর কর্তব্যনিষ্ঠা ও গুরুভক্তি জগৎবাসীর কাছে আদর্শ। স্বামীজীর জীবন ও কার্যকে আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম না যদি-না ঈশ্বর গুডউইনকে স্বামীজীর পার্শ্বচর হিসাবে পাঠাতেন। তাঁর লিপিবদ্ধ জীবনীই আমরা আজ পাঠ করে অমৃতধারায় অবগাহন করতে পারছি। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত অগণিত ভক্ত ও পাঠক অনন্তকাল ধরে গুডউইনের সশ্রদ্ধ অবদানের জন্য চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবেন। স্বামীজীর জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক এবং কলম্বো থেকে আলমোড়া অবধি প্রদত্ত সমগ্র বক্তৃতাবলী—এ সবই আমরা গুডউইনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পেয়েছি।

গুডউইনের দেহান্তকালে স্বামীজী আলমোড়ায় অবস্থান করছিলেন। কাশ্মীর ও হিমালয় ভ্রমণে যাবার প্রাক্কালে ঐ মর্মান্তিক ঘটনা। এই দুঃসংবাদটি শোনামাত্র তুষারমৌলী হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে একান্ত বিষাদভাবে স্বামীজী বলে ওঠেন—"আমার ডান হাত গেল ; এই ক্ষতি অপরিমেয়। আমার প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার পাটও উঠে

গেল।" লোকান্তরিত গুডউইনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে স্বামীজী ইংলণ্ডে গুডউইনের মাতৃদেবীকে সান্ত্বনার বাণী পাঠিয়েছিলেন একটি চিঠিতে। সেই সঙ্গে একটি মর্মস্পর্শী কবিতাও। কবিতাটি উদ্ধৃত করে গুডউইন প্রসঙ্গ শেষ করবো। কবিতাটির নাম "Requiescat in peace" (শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম)। কবিতাটিতে একদিকে প্রকাশিত হয়েছে যেমন তাঁর সেবা-নিষ্ঠা-ত্যাগও কর্মের, অন্যদিকে অনাবিল মুক্তির কথাও ধ্বনিত হয়েছে—

'চল আত্মা শীঘ্রগতি তারকাখচিত তব পথে,
ধাও হে আনন্দময় যেথা নাহি বাঁধে মনোরথে ;
দেশকাল দৃষ্টিপথ যেথা নাহি করে আবরণ,
চিরশান্তি আশীর্বাদ যেথা করে তোমারে বরণ।
সার্থক তোমার সেবা, পরিপূর্ণ তব আত্মদান,
অপার্থিব প্রেমপূর্ণ হৃদয়েতে হোক তব স্থান ;

টুটেছে বন্ধন তব, পেয়েছ সে আনন্দ-সন্ধান,
জন্মমৃত্যুরূপে যিনি, তাঁর সাথে হলে একপ্রাণ।

স্বামী বিবেকানন্দ যে দু'জন ইংরেজকে ভারতের কল্যাণে আত্মত্যাগী শহীদ বলেছেন, গুডউইন তাঁদের অন্যতম। বলেছেন, "........দু'জন মহাপ্রাণ ইংরেজ আমাদের জন্য—হিন্দুদের জন্য আত্মত্যাগ করলেন। শহীদ কোথাও থাকে তো এঁরাই।" গুডউইনের মাতৃদেবীকে ঐ চিঠিতেই লিখেছিলেন—"পরার্থে যাঁহারা জীবন ধারণ করেন এরূপ লোক জগতে অতি অল্প। সেই অত্যল্প সংখ্যারও আরও একটি হ্রাস পাইল।"[১]

পাশ্চাত্যের নারীভক্ত জোসেফিন ম্যাকলাউড

প্রথম দর্শনেই যাঁকে চিনে নিতে ভুল করেন নি, যাঁর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন নিজের স্বপ্নকে, আদর্শকে, যাঁর পথ তাঁকে আজীবন দিয়েছিল ঐশী প্রেরণা ও কর্মশক্তি, সাধনা ও সিদ্ধি, সেই যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও ভক্ত ছিলেন পাশ্চাত্যের দেবীশক্তি সম্পন্না সাধিকা জোসেফিন ম্যাকলাউড—স্বামীজীর প্রিয় 'জো'। নিবেদিতার মতো শিষ্যত্ব তিনি গ্রহণ করেননি ঠিকই, কিন্তু তিনিও ছিলেন নিবেদিতার মতো স্বামীজীর আশীর্বাদধন্য। সমর্পণ ও বিশ্বাস, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, প্রেম-সেবা—এগুলি ছিল তাঁর জীবনের মৌলিক ধর্ম। এগুলির পরিচয় ফুটে উঠেছে তাঁর আচার আচরণে, জীবন সাধনায়। অফুরন্ত কর্মশক্তির প্রকাশ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে, আর সেসব কর্মশক্তির রূপায়ন ঘটেছে স্বামীজীর সুমহান আদর্শ ও সাধনাকে রূপান্তর করবার মধ্য দিয়েই।

মহাপুরুষ বা ত্যাগী প্রেমিক মহামানবের সংস্পর্শ ও সান্নিধ্য যে কোন মানুষের জীবনে আমুল পরিবর্তন সাধন করতে পারে, তার প্রকৃত স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করতে পথ বাতলে দেয়। অথবা এমনও দেখা যায় যে, তার মধ্যে পরিপূর্ণ সত্তা নিদ্রায় বিভোর হয়ে আছে, মহাপুরুষের মুখ নিঃসৃত বাণী কিংবা তার আলোক দ্যুতিময় তনু সেই মানুষের জীবনের গভীর রূপান্তর সাধন করে তাকে আলোকের পথে, পরিপূর্ণতার পথে, সত্যের পথে নিয়ে যায়। আমাদের বিশ্বাস, স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সান্নিধ্য—তাঁর দৃপ্তময় অবয়ব, আয়ত নয়ন, মুখ নিঃসৃত মন্ত্রবৎবাণী শুধু নিবেদিতাকে নয়, এই আমেরিকান মহিলা জোসেফিন ম্যাকলাউডকেও মহত্তর করে সত্যের পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিলো। ঐ সাক্ষাতের প্রথম দিন থেকেই ম্যাকলাউডও বিবেকানন্দ-প্রাণা হয়ে গেলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাই-ই হয়ে রইলেন। স্বামীজীর সান্নিধ্যে এই বিদেশিনী নারী স্বাভাবিকভাবেই এমন কিছু পেয়েছিলেন যা তাঁকে সারা জীবন ধরে এক বিরাট অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলো। সত্যের অনুসন্ধান 'জো' প্রথম জীবন থেকেই শুরু করেছিলেন। স্বামীজীকে দেখার পূর্বে বহু জায়গায় ঘুরেছেন তিনি সত্যের সন্ধানে। স্বামীজীর পদপ্রান্তে আসার পরমুহূর্ত থেকে আর অন্যত্র যাওয়ার কথা বিন্দুমাত্রও মনে স্থান দেন নি। প্রথম দর্শনেই বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দকে সত্যস্বরূপ হিসাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা 'জো'র যথার্থ সত্যানুসন্ধানের ফলস্বরূপ।

গুরু ও ভক্তের মহামিলনের ক্ষেত্র ছিল নিউইয়র্ক ; আর দিনটি ছিল ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি। স্বামীজী আলাপরত ছিলেন, উপস্থিত মহিলা পুরুষদের সঙ্গে নানান প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতের মুনি ঋষিদের উপলব্ধির বাণী বেদান্তের বিষয়কেই তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন ৫৪ ওয়েষ্ট ৩৩নং স্ট্রিটের বাড়ির একটি ঘরে। জনাকীর্ণ ঘর, বসবার কৌচগুলো সব পরিপূর্ণ। এমনকি সিড়ি, বারান্দাতে বসেও শোতৃবৃন্দ সেই নবীন হিন্দু সন্ন্যাসীর মুখে দেববাণী শুনছিলেন। এঁদের মাঝখানে সেদিন, প্রথম এসেছিলেন দুই বোন, জোসেফিন এবং বেটি ম্যাক্লাউড। তাঁরা এসেছিলেন হাডসনের উত্তরে ৩০ মাইল দূর থেকে। ঘরের প্রায় সমস্ত বসবার জায়গা পরিপূর্ণ দেখে তাঁরা একেবারে সামনের সারিতে মেঝেয় গিয়ে বসেছিলেন। স্বামীজী তখন এক কোণে জীবনের চরম সত্যের স্বরূপকে ব্যাখ্যা করছিলেন। অনেক গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ কথা তিনি সেদিন বলছিলেন, সেসব কথা জোসেফিনের স্মরণে ছিল না ; কিন্তু এটুকু তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল, তিনি যা কিছু বলছিলেন তা তাঁর কাছে সত্য বলে মনে হয়েছিল। অপরিচিত এই সন্ন্যাসীর প্রথম দর্শনেই জো উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি তাঁর জীবনের মহত্তম ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসে পড়েছেন।[১] আকাঙ্ক্ষিত মহাপুরুষকে পাওয়ার মুহূর্তে অভিভূত 'জো'র মনে স্বামীজী সম্পর্কে যেসব কথা জেগে উঠেছিল তার সামান্য উল্লেখ করছি—

---

১. Late and soon—Francis Legget, P.95

"স্বামীজী সেদিন একটি ভাষণ দিচ্ছিলেন, সে ভাষণের সঠিক ভাষা আজ আর মনে নেই।' তবে সেই মুহূর্তেই অনুভব করেছিলাম, এ বাক্যটি একটি সত্য। দ্বিতীয় বাক্যটি যা স্বামীজী উচ্চারণ করলেন তাও একটি সত্য, আর তৃতীয় বাক্যটিও সত্য। তারপর থেকে আমি সাত বছর ধরে তাঁর বাণী শুনেছি। আর যা যা বলেছিলেন তা-ই আমার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছিল। সেদিনকার সেই বিশেষ মুহূর্তের পর থেকেই জীবন আমার কাছে নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছিল। তিনি সকলকে এই উপলব্ধি করিয়েছিলেন—তোমরা সকলে অনন্তের মধ্যে অবস্থান করছো। এই অনন্তের পরিবর্তন নাই, পরিণাম নাই—তা সূর্যের মতোই দীপ্যমান, সূর্যের মতোই তাকে একবার দেখলে জীবনে কখনো তা ভুলতে পারবে না। সেই মুহূর্ত থেকেই আমার কাছে জীবনের অর্থটাই পাল্টে গিয়েছিল।"[১]

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার ইলিনয়েস-এ জো-এর জন্ম। সুতরাং বয়সের দিক থেকে স্বামীজীর চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় ছিলেন তিনি। তাঁর পিতা ডেভিড্ ম্যাকলাউড ছিলেন উদার ভাবসম্পন্ন এমন একজন ব্যক্তি যিনি শুধু জাগতিক ব্যাপারে নয়, ধর্মের ব্যাপারেও উদারভাব সবসময়ই পোষণ করতেন। মৃত্যু শয্যায় শুয়ে একদিন কন্যা জোসেফিনের মুখে ভারতীয় বেদান্ত ধর্মের মাধুর্যমণ্ডিত বাণী শুনে বলেছিলেন, "জীবনে আজ প্রথম একটা বাণী শুনলাম।"[২] নিশ্চয়ই মৃত্যুপথযাত্রী পিতার মুখে এই বাণী শুনে জেসেফিন অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এসব ঘটনা তাঁর জীবনের অনেক পরের দিকের ঘটনা। প্রাচীন ভারতকে জানার আকাঙ্ক্ষা, ভারতচেতনার বাণীকে উপলব্ধি করার বাসনা তার মনে অতি অল্প বয়স থেকেই সংক্রামিত হয়েছিল। আমরা তাঁর স্মৃতি কথায় পাচ্ছি, স্বামীজীকে দেখার পূর্ব থেকেই তিনি ধ্যান অভ্যাস করতেন, নিয়মিত গীতা পাঠ করতেন, এমনকি গীতার বেশ কিছু শ্লোক তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। অবাক লাগে, জড়-সর্বস্ববাদী দেশের একজন তরণী হয়ে তিনি প্রাচ্যের সনাতন ধর্মের ঐ বিশেষ জীবনধারাকে কী মোহে, কী আকারে গ্রহণ করেছিলেন! কিন্তু লক্ষণীয় স্বামীজীকে দেখার পূর্বে অতসব পাঠ-অভ্যাস করা সত্ত্বেও প্রাণের গভীরে এমন একজনের তৃষ্ণা অনুভব করেছিলেন যাঁর জন্য তিনি নানা জায়াগায় নানা জনের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেউ পারেন নি জেসেফিনের তৃষ্ণা প্রশমিত করতে। অবশেষে সংঘটিত হয়েছে সেই দৈব সাক্ষাৎকার। স্বামীজীকে পাওয়ার পরেই তার তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছে। এলোমেলো চলা হয়েছে বন্ধ। জাগতিক জীবনের কোলাহল হয়েছে স্তব্ধ। সেদিন থেকেই তার নবজন্ম ঘটেছে। জো বলতেন জানুয়ারী মাসের ঐ দিনটি তাঁর প্রথম জন্মদিন। কেউ তাঁর বয়স জিজ্ঞাসা করলে তিনি ঐ দিনটি থেকেই বয়স হিসেব করে বলতেন। ঐ দিনের পূর্বে জীবনে যেসব মুহূর্তগুলো কেটেছিল তা তিনি চিরতরে ভুলে যেতে চেয়েছিলেন। স্বামীজীর মুখে জীবনদর্শনের বাণী শুনে তিনি

---

১. Reminiscences of Swami Vivekananda, 2nd Edu, P. 233

২. Late and soon--P.--46

পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন এক নারী-ঋষিতে। স্বামীজীর বাণী তাঁর কাছে মনে হয়েছিল দৈববাণী। তরুণ সন্ন্যাসীর সেই বাণী—"সবসময় মনে রেখো তুমি ঈশ্বরের সন্তান, কেবল বাইরের দিক থেকেই একজন আমেরিকান এবং নারী।"[১]—তাঁকে আন্তর্জাতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তলেছিলো। তারই ফলস্বরূপ তাঁর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে সনাতন ধর্ম তথা বেদান্তের বাণীর প্রচার। সে কারণে তিনি স্বামীজীর ঐ প্রভাবের কথাকে সবসময় স্বীকার করতেন। বলতেন—"After I met him I was never the same." অর্থাৎ তাঁকে দেখার পর থেকে আমি আর পূর্বের মানুষটি ছিলাম না।[২] তাঁর বোনের মেয়ে ফ্রান্সি তার মাসির জীবনের ঐ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের এক অদ্ভুত চিত্র এঁকেছেন—"বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই জো-র জগতের সব কিছুই তাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। এর জন্যই জো কোনদিন ওল্ডমেড হলেন না। তাঁর সাদা চুল, নীল চোখ এবং বাঁধা জীবন যাত্রার জন্য তাঁকে নারী ঋষি বলেই মনে হত। প্যারিস ফ্যাসানের পোষাক পরিহিতা আধুনিকা থেকে জো হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ব্রত ধারিণী নারী—ট্যান্টিন, জয়ানন্দ, সার্বজনীন আণ্ট,—পরিবারের নারী পুরোহিত।"[৩] তাঁর হৃদয় স্বামীজীকে দেখার পূর্বেই পরিপূর্ণ ছিল ঐশ্বরিকভাবে, শুধু প্রয়োজন ছিল যুগাচার্যের সান্নিধ্য ও আর্শীবাদ। জো-এ পরিপূর্ণ ঐশ্বরিকভাব-সম্পন্ন হৃদয়ের কথা স্বামীজী নিবেদিতার কাছে স্বীকার করেছিলেন। নিবেদিতা তাঁর প্রিয় ইয়ুম সম্পর্কে লিখেছিলেন যে, স্বামীজী বলতেন অন্যরা তাঁকে দেখার পর পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, কিন্তু জো ব্যতিক্রম ; সে আগেই ঈশ্বরীয়ভাবে পরিপূর্ণ। আর সব ভক্ত শিষ্য এবং সাধারণ মানুষেরা বসেছিলেন শান্তির আশায় কিন্তু জো এসেছিলেন স্বামীজীকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম ও শান্তি দিতে। তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন স্বামীজীর কাছে। এই আত্মোৎসর্গের প্রেরণাতেই সামাজিক, পারিবারিক সমস্ত বন্ধনকে উপেক্ষা করেছেন। নিজের দিকে একবারও চেয়ে দেখেন নি। চিরকুমারী থেকেছেন। এই ত্যাগ বিশ্বজাগতিক কল্যাণের জন্যই তিনি করেছিলেন।

স্বামীজীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় থেকে স্বামীজীর তিরোধানের সময় কাল মাত্র সাত বছর। ঐ অতি স্বল্পকালীন সময় সীমার মধ্যে ম্যাকলাউড অভাবণীয় ভাবে বহুবার স্বামীজীর সান্নিধ্য পেয়েছেন এবং তা খুবই ঘনিষ্ঠভাবে। কখনও নিউইয়র্কে, রিজলী ম্যানরে, অথবা ক্যালিফোর্নিয়ায় আবার কখনও বা কাশ্মীর বা বেলুড়ে। সেবাব্রত ছিল তাঁর জীবনের পরম লক্ষ। স্বামীজীর সেবা, স্বামীজীর কর্মের সেবা করাই ছিল তাঁর জীবনের পরম অবলম্বন ও ব্রত। জো-এর দিক থেকে রিজলী ম্যানরের দিনগুলি ছিল অতিশয়

১. Reminiscences, 2nd Edu. P. 234

২. Vedanta and the West No. 158. পৃঃ 61

৩. এক অসামান্য নারী ; একটি পরিবার ও স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু শারদীয়া যুগান্তর, ১৯৮৬, পৃঃ ৪২

তাৎপর্যপূর্ণ। সেইসব দিব্য দিনগুলির স্মৃতি তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিস্মৃত হন নি। সেই দিব্য স্মৃতির কথা বেলুড়ে থাকাকালীন তরুণ ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসীদের মাঝে মাঝেই শোনাতেন। রিজলী ম্যানরে স্বামীজী দু' দু'বার বিশ্রামের জন্য গিয়েছিলেন। প্রথমবার ১৮৯৫-এ। আমেরিকা বিজয়ের পর রণক্লান্ত গৈরিক-সন্ন্যাসী আমেরিকান বন্ধু ও গুণগ্রাহী মি. ফ্রান্সিস লেগেটের আমন্ত্রণে এসেছিলেন ঐ নির্জন পার্বত্য নিবাসে। দ্বিতীয়বার গিয়েছিলেন এর চার বছর বাদে ১৮৯৯-এ। সেবার সগে ছিলেন দুই সন্ন্যাসী গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ, অভেদানন্দ মহারাজ এবং ভগিনী নিবেদিতা ও মিসেস ওলিবল। পাশ্চাত্যের নানা কোণ থেকে ছুটে এসেছেন অগণিত মানুষ ভারতীয় তরুণ সন্ন্যাসীর বাণী শুনবার আশায়। জো দু'বারই ছিলেন ঐ সময়ের সাক্ষী। ম্যাকলাউড তাই রিজলীর সেই স্মরণীয় মুহূর্তকে স্মরণ করেছেন 'Great Summer' বলে। 'জো' রিজলীর দিনগুলো থেকেই স্বামীজীর অতি সান্নিধ্যে এসেছিলেন, সেবা করেছিলেন আত্মমগ্ন হয়ে। সেই সেবায় কোনরকম স্বার্থ-বিজড়িত ছিল না। সেকারণে স্বামীজীরও খুব প্রিয় পাত্রী তিনি হয়ে উঠেছিলেন, সব থেকে কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। যে কোন ব্যাপারেই স্বামীজী তাঁর 'প্রিয় পাত্রী' 'জো'-এর কাছে সাহায্য চাইতেন। 'জো'-ও নিষ্ঠাভাবে তাঁকে সাহায্য করে যেতেন। নিঃস্বার্থ প্রেম ও পূর্ণ সেবাপরায়ণতার প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি। পবিত্র ছিল তাঁর প্রেম। স্বামীজী মহাপ্রয়াণের দু'দিন আগে নিবেদিতাকে বলেছিলেন, "সে পবিত্রতার মতোই পবিত্র এবং প্রেমের মতই প্রেমস্বভাবা।"[১] স্বামীজীর অসংখ্য ভক্ত, শিষ্য-অনুরাগী ছিল, কিন্তু ম্যাকলাউডের মতো এতো গভীর ভক্তির অধিকারী জীবন অতি বিরল। নির্ভীক সরলতা ও পবিত্র সেবাপরায়ণতার জন্য জো স্বামীজীকে কোনদিন ভয়ও পান নি, কোন সংকোচও করেন নি। বক্তৃতা শেষে ক্লান্ত স্বামীজীকে জো হাত ধরে নিয়ে আসতেন। বহু দৈব মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন জো। তাঁর স্মৃতি থেকে এই সব ভাব-ঘন মুহূর্তের পরিচয় আমরা পেতে পারি। স্বামীজী জো-এর মধ্যে দেখেছিলেন এক মাধুর্যময় মূর্তিকে। তিনি বলতেন—'Joe is the sweetest spirit of us all."[২] কোন আবিলতা তাঁর চেহারার মধ্যে, চলন-চালনের মধ্যে লক্ষ করা যেত না। ঈশ্বরীয়-পুরুষ স্বামীজীকে সেবা করার মধ্যেও সেই মাধুর্য প্রকাশিত হতো। রামকৃষ্ণ মিশনের যে সেবাদর্শ, পাশ্চাত্য দেশে তার সূচনা এবং চূড়ান্ত প্রকাশ ম্যাক্লাউডের জীবন সাধনার মধ্যে। আত্মমগ্ন সন্ন্যাসীকে প্রয়োজনের মুহূর্তে সেবা করেছেন কোন সংকোচ না করে। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের নর-নারীর সামনে সভায় বক্তৃতা দিতে যাওয়ার সময় স্বামীজীকে তাঁর উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সচেতন করে দিতেন। সময় মতো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাওয়ার পূর্বে গাড়িতে তুলিয়ে দিতেন, অথবা গুরুগম্ভীর আলোচনা বা

১. Reminiscences : P. 249

২. Reminiscences : P. 372

বক্তৃতা সমাপণকালে স্বামীজীকে হাস্য-পরিহাসে ও সেবা যত্নে সতেজ করে তুলতেন স্বামীজীর প্রিয় জো। 'জো'-এর উপস্থিতি স্বামীজীর কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ স্বামীজীর ঐ চিঠি—"জো! লণ্ডনে কোন কাজ হবে না, কারণ তুমি এখানে নেই, তুমিই দেখছি আমার নিয়তি।" স্বামীজীর এই কাজ জো আমৃত্যু করে গিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বামীজীর মতো মহাপুরুষের সান্নিধ্য জো-কে অজ্ঞাতসারেই পরবর্তীকালে প্রভাবিত করেছিল এই ধরনের ত্যাগ সমুজ্জ্বল মহৎ জীবনের পথে। কোন্ দৈব আকর্ষণে পাশ্চাত্যের এই আধুনিকা নারী স্বামীজীর কাজের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন? এ প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে জো-এর স্বীকারোক্তিকেই স্মরণ করতে হয়। স্বামীজীর তিরোধানের পর বেলুড় মঠ থেকে একটি ঐতিহাসিক পত্রে লেখেন—

"স্বামীজীর জীবনের মধ্যে যে ভাবটি আমাকে ধরে রেখেছিল, সেটি হল তাঁর অসীমতা।....ও রকম একটি জীবন মানুষকে কতখানিই না মুক্ত স্বভাব করে তোলে। আমাকে মুক্ত করার জন্যই স্বামীজী এসেছিলেন। নিবেদিতাকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করার এবং মিসেস সারা-র জীবনে অদ্বৈতের অনুভূতি দেওয়ার মতো এটাও কি তাঁর জীবনের একটা ব্রত ছিল।'

স্বামীজীর উপর গভীর বিশ্বাসই জো-কে আত্মত্যাগের পথে নিয়ে গিয়েছিল, আবার এই বিশ্বাসই তাঁর জীবনীশক্তির মূল উৎস।[১] স্বামীজীর কর্মশক্তির প্রভাবও জো-র উপর পড়েছিল। স্বামীজীর দেওয়া 'ওঁ' মন্ত্রধ্বনি জো-কে গভীর আধাত্মিকতার রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। এই আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে জো পেয়েছিলেন অফুরন্ত শক্তি ও মনোবল, —দুর্বলতা কখনোই তাঁর মনকে গ্রাস করতে পারে নি। স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের এই প্রভাব শুধু ম্যাকলাউডকে নয়, যিনিই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁকেই গ্রাস করেছিল। যুগাচার্যের চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি সম্বন্ধে জো যা বলেছেন তা তাঁর জীবনের গভীর আধ্যাত্মিকতার পরিচায়ক। বলেছেন—"অপরের মধ্যেই যেন তিনি দেখতে পেতেন সমস্ত শক্তি, শ্রদ্ধা এবং গৌরবের মহিমা। যিনিই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি অনুভব করেছেন তাঁর নিজের মধ্যে যেন শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে, তাই যাঁরা তাঁর কাছে এসেছিলেন সকলেই নতুন উদ্দীপনা শক্তি আর ভরসা নিয়ে ফিরেছেন। সেইজন্য লোকে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে "তোমার কাছে আধ্যাত্মিকতার অর্থ কি"[২] আমি সব সময়ই বলেছি, মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এলে মানুষ যে শান্তি অনুভব করে, তাই হল 'আধ্যাত্মিকতা।'"[৩]

স্বামীজীর মুক্তস্বভাব ও সীমাহীনতা 'জো' এর মানসজগতে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। শুধু শিষ্যা হিসাবে থাকলে হয়তো জো স্বামীজীর এই স্বরূপের পরিচয় পেতেন

১. বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৮।৫৯

২. Reminiscences, P. 250

৩. Reminiscences. P. 246

না। 'বন্ধু' ছিলেন বলেই স্বামীজীর অনন্ত মানসিকতার পরিচয় পেতে তাঁর অসুবিধে হয়নি। বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃই তিনি সারাজীবন ধরে রামকৃষ্ণ মঠের প্রগতি ও মিশনের কাজের সঙ্গে অভিন্নভাবে মিশে গিয়েছিলেন। জো-র ছিল অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি এবং তীক্ষ্ম কর্মতৎপরতা। আর তার সঙ্গে মিশে ছিল স্বামীজীর কাছ থেকে পাওয়া মুক্তজীবনবোধ। জো-এর তীক্ষ্ম ধীশক্তি এবং সুচতুরতা সম্পর্কে স্বামীজী যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য—

"আমি জো-র বুদ্ধিমত্তা এবং নীরব কার্যপ্রণালীর প্রশংসা না করে পারছি না। তাঁকে একজন সচতুর রাজনীতিবিশারদ রমণী বলা যেতে পারে। তিনি প্রয়োজন হলে একটা রাজ্য চালাতে পারেন। মানুষের মধ্যে এমন সব বিষয় ধরার তীক্ষ্ম সহজ বুদ্ধি, আবার উহাকে ভাল বিষয়ে প্রয়োগ করবার ক্ষমতা আমি খুব কমই দেখেছি।"—এ চিঠিটি স্বামীজী লণ্ডন থেকে লেখেন ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জুলাই। জো-র কর্মশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আমরা একটু পরে বিশদভাবে দেব, তার পূর্বে ঐ কর্মশক্তির ও মুক্তস্বভাবের পিছনে স্বামীজীর যে কী অপরিসীম প্রভাব ছিল, তার ইতিহাস আমরা বলবো জো-এর জবানীতেই। স্বামীজীর দেহত্যাগের কিছুকাল পরে বেলুড় মঠে অতিথিশালা থেকে জো একটি তারিখশূন্য অসম্পূর্ণ পত্র লেখেন ; তার করা টাইপ করা প্রতিলিপি আছে ; এতে তিনি স্বহস্তে লিখে ইচ্ছা প্রকাশ করে গেছেন যে, এটি যেন রক্ষিত হয়। এই পত্রে জো তাঁর জীবনের উপর স্বামীজীর প্রভাব বর্ণনা করেছেন।* —"স্বামীজীর যে গুণটি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, তা হচ্ছে তাঁর সীমাহীনতা ; আমি কখনো তার তল বা ঊর্ধ্ব বা পার্শ্বদেশ স্পর্শ করতে সক্ষম হয় নাই। আমার মনে হয়, নিবেদিতারও আকর্ষণের কারণ এটাই—তাঁর বিস্ময়কর বিস্তৃতি। আহা, এরূপ প্রকৃতি মানুষকে কী মুক্ত স্বভাবই না করে তোলে। (এরূপ প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে) নিজের ওপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, আসলে সেইটাই হল সব ; তাই নয় কি? যা পাওয়ার, এ থেকেই তা পাওয়া যায়।

তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, চরম সত্যকে আমি স্থিরবিশ্বাসে নিশ্চিতভাবে আঁকড়ে ধরতে পেরেছি কিনা। হাঁ, পাকা করেই ধরেছি। মনে হয় উহা আমার সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে মিশে গেছে। স্বামীজীর মধ্যে যে সত্য প্রত্যক্ষ করেছি, তাই আমাকে মুক্তি দিয়েছে। লোকের দোষকে কত তুচ্ছ জিনিস বলে মেনে হয়—ক্রীড়াক্ষেত্র রূপে সামনে যখন সত্যের পারাবার বিস্তৃত রয়েছে, এসব তুচ্ছ কথা আবার মনে করা কেন। স্বামীজী আমাকে মুক্তি দিতে এসেছিলেন। নিবেদিতাকে তিনি যেমন ত্যাগ দিয়েছিলেন, মিসেস এস-কে যেমন একত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি তার মাকে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা ; এ সবই ছিল তাঁর জীবনোদ্দেশ্যের অংশ বিশেষ। ভারতের আধ্যাত্মিক উপহার হিসাবে তাঁর মহত্ব কিন্তু ত্যাগের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত ; তাই ভারতীয় এবং ভারতের জন্য উৎস্বর্গীকৃত প্রাণ

(নিবেদিতা) কর্মীরা বলতো, "দিবারাত্র আমার কর্ণকুহরে কেবলমাত্র একটি কথাকেই অনুরণিত হতে শুনতে পাচ্ছি—'ত্যাগের কথা স্মরণ রেখো।' ....আমার ত্যাগ নেই, কিন্তু স্বাধীনতা আছে। ভারতকে উন্নত হতে দেখা ও উন্নতির পথে তাকে সহায়তা করার স্বাধীনতা আমার আছে—সেইটাই আমার কাজ, এবং সে কাজটি আমি কত ভালোবাসি। জ্বলন্ত পাবকতুল্য আদর্শবাদীদের নিয়ে গঠিত এই সঙ্ঘটি গাছপালা পুড়িয়ে 'জীবন' নামক অরণ্য থেকে বেড়িয়ে আসার নতুন নতুন পথ প্রস্তুত করছে—এসব দেখতে কত ভালোবাসি আমি!...........।

স্বামীজী হচ্ছেন আমাদের একটি সুদৃঢ় শৈল সদৃশ আশ্রয়, এটা আমি অনুভব করি। আমার জীবনে এই প্রয়োজনই তিনি সিদ্ধ করেছেন—পূজা নয়, গৌরব নয়, কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার সময় পায়ের নিচে অবলম্বন ভূমির অটলতা। যাক, শেষ পর্যন্ত আমি স্বাধীন হয়েছি। মুক্তির বোধ মনে কী বিস্ময়ই না জাগায়।—আমার বৈশিষ্ট্যগুলির প্রয়োজন এখন আর পাশ্চাত্যে নেই, আছে ভারতে।.............অতিথিশালায় উপরের দুখানি নতুন ঘর নিয়ে এই বিশাল নদীতীরের নিস্তব্ধতায় স্থানের প্রাচুর্য ও বিপুল বিলাসিতার মধ্যে বাস করছি। কোথাও এত বিলাসিতার কথা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। জায়গা প্রচুর রয়েছে—কোন আগবার নেই যার যত্ন নিতে হবে ; একরাশ কম্বল, ছবি, ডিস—এসব নেই, আছে শুধু এক সেট চায়ের সরঞ্জাম। জিনিসপত্রের সে ঠোকাঠুকি চলে গেছে। কাজ করবার মত, যত্ন নেবার মত কিছুই আর নেই—সবই হাওয়ায় মিলে গেছে। তবু আমি একা নই। (ওটা আমি সহ্যই করতে পারি না)। দেহত্যাগ না করেও স্বর্গের সন্ধান পাওয়া যায়।

আমি দেখছি—আর এসব কেনই বা? এটাই আশ্চর্য।

"সামান্য বুদ্ধি দিয়ে আমাদের বোকা বানিয়ে রাখা হচ্ছে, কিন্তু এবারে আর আমাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখতে পাবে না। বুদ্ধির সীমানার ওপারের দু'একটি জিনিস আমি খুঁজে পেয়েছি—তা হচ্ছে প্রেম"—একথা স্বামীজী মিসেস লেগেটকে লিখেছিলেন ; তাঁদের উভয়েরই মঙ্গল হোক।"

"স্বামীজীর প্রদর্শিত কর্মে ম্যাকলাউড"

স্বামী বিবেকানন্দের পথেই তাঁর পবিত্র স্বভাবা বন্ধু জো আজীবন চলেছিলেন। বন্ধু-প্রদর্শিত কর্মকেই তিনি তাঁর জীবনের সাধনা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সেই কর্মের জন্য প্রায় সমগ্র বিশ্ব পরিক্রমা করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা প্রান্তে ঘুরে তিনি বিবেকানন্দের বাণীকে প্রচার করছেন এবং এই দুই সভ্যতার মধ্যে মিলন ঘটানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। প্রাচ্যের বেদান্ত ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে সমীকরণ করতে বিবেকানন্দের সমস্ত কর্মশক্তি নিয়োজিত হয়েছিল। জো স্বামীজীর সেই উদ্দেশ্যকেই পূর্ণরূপ দিতে

বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নি। স্বামীজীর সঙ্গে থাকাকালীন আমেরিকার বেদান্ত প্রচার কার্যে সব সময় পিছনে থেকে সাহায্য করেছেন জো। নিউইয়র্ক এবং লণ্ডনের বেদান্ত কেন্দ্রের বিপুল কর্মে তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রভূত সাহায্য করেছেন স্বামীজীকে। বলা যেতে পারে, স্বামীজীর প্রচার কর্মের তিনি ছিলেন মধ্যমণি। তাঁর কাজ ছিল বেদান্ত প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং শিক্ষিত ও আগ্রহী ব্যক্তিদের বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করা। ১৮৯৬ এর ৬ই জুলাই লণ্ডন থেকে লেখা একটি পত্রে মিঃ লেগেটকে স্বামীজী লিখেছেন, "গলসওয়ার্দিরা আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছেন। জো বড় অদ্ভুতভাবে তাদের এদিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।" নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির সমৃদ্ধিকল্পে লেগেট প্রাথমিক পর্বে যে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি ঐ সোসাইটির যে সভাপতি হয়েছিলেন, তার পিছনে জো-র অবদান যথেষ্টই। প্যারীতে ধর্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য স্বামীজী যখন যান জো-র উদ্যোগেই লেগেটের গৃহে স্বামীজীর বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়। প্যারীর অগিণত সুধীমণ্ডলী ও বিদ্যুৎজনের সঙ্গে স্বামীজী পরিচিত হন জো-র মাধ্যমেই। আর, আমেরিকার পূর্বকূলে স্বামীজীর বেদান্ত-প্রচার কর্ম শুরু হয়েছিল জো-র জীবনের আকস্মিক এক বিষাদময় ঘটনার সূত্র ধরেই, সেকথা অনেকেরই জানা। তবুও আবার স্মরণ করছি। অপরদিকে ক্যালিফোর্নিয়ায় স্বামীজী বেদান্ত প্রচারে গিয়েছিলেন এমন একজন ভক্তিপূর্ণা বৃদ্ধার অনুগ্রহে যিনি মনেপ্রাণে স্বামীজীকে দেবতা বা ঈশ্বর বলে মনে করতেন। বলতেন, "পৃথিবীতে যদি কোন দেবতা থেকে থাকেন, ইনিই সেই ব্যক্তি।"[১]

ম্যাকলাউডের জীবনের সেই আকস্মিক দুর্ঘটনা যা স্বামীজীকে রিজলীম্যানর থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় নিয়ে গিয়েছিল তার কথা একটু বলে নেওয়া যাক। ম্যাক্লাউড স্বামীজীর সঙ্গে রিজলী ম্যানরে থাকাকালীন শুনলেন তাঁর ভাই টেলর লসএঞ্জেলেসের মিসেস ব্লজেট নামক জনৈক এক মহিলার গৃহে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃতুশয্যার শায়িত। জো এ খবর শোনা মাত্রই ভায়ের পাশে উপস্থিত হওয়ার জন্য যাত্রা করলেন এবং মিসেস্ ব্লজেটের গৃহে গিয়ে পৌঁছলেন। ভাই-এর তখন অন্তিমঅবস্থা। তাঁর মৃত্যুশয্যার ঠিক উপরের দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের এক বিরাট প্রতিকৃতি। জো বিস্মিত হলেন, হলেন রোমাঞ্চিত। ব্লজেটকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, তিনি ছিলেন স্বামীজীর ঐতিহাসিক শিকাগো বক্তৃতার শ্রোতৃবৃন্দের একজন। জোসেফিন সেখানে থাকার তিন সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর ভাই মারা গেলেন। এরপর তিনি সমস্ত দুঃখ মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় স্বামীজীর বেদান্তের প্রচারক্ষেত্র প্রস্তুত করতে লাগলেন। অবশ্য স্বামীজীও তাঁকে এ ব্যাপারে পূর্বেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। যাইহোক, ক্যালিফোর্নিয়ায় স্বামীজীর ভারতবাণী প্রচারের ক্ষেত্রে জো-এর এই ভূমিকা চিরকাল মানুষ স্মরণ রাখবে।

১. Reminiscen..s, পৃ ঃ 245

ভারতের সঙ্গে জাপানের সাংস্কৃতিক মিলনের ক্ষেত্রেও জো-এর ভূমিকা অনবদ্য। জাপানে স্বামীজী অসুস্থতার কারণে যেতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর বাণী পৌঁছে ছিল সেখানে। শিল্পী ওকাকুরার আমন্ত্রণকে স্বামীজী রক্ষা করতে না পারলেও স্বামীজীর 'জো' পেরেছিল। সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভারতবর্ষের যা কিছু জাপান থেকে নেওয়ার আছে তা জো গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আর জাপান-সংস্কৃতির প্রতীক শিল্পী ওকাকুরাকে স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের একবছর পূর্বে বেলুড়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। শুধু জাপান নয়, বিশ্বের নানা প্রান্তে তিনি স্বামীজীর ভারতবাণীকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের বেদান্ত প্রচারকেরা যেখানেই গিয়েছিলেন, সেখানেই জো তাঁদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল। তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল 'To make lovers of Swamiji' এই কাজ করার জন্য তিনি কতজনকে যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। স্বামীজীর শিষ্য বিরজানন্দজীকে ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের একটি চিঠিতে স্বামীজীর বাণী প্রচারের জন্য উৎসাহ দিয়ে লিখেছেন—"হিমালয় কেন্দ্রে আমাদের প্রভুর কাজ চালাবার জন্য উপযুক্ত একদল নতুন কর্মী গড়ে তোলা যেতে পারে। কী গৌরবময় এই কাজ!...............এখনও হয়তো চল্লিশ বছর আমাদের এ কাজ করতে হবে। বেশ মজা লাগে যখন দেখতে পাই অন্তঃপ্রবাহিত স্রোত উপরে উঠে চোখের গোচরীভূত হচ্ছে। তাই নয় কি?.........আমার কাজ ছিল স্বামীজীকে চেনা। প্রথম যখন তাঁর দর্শন পেলাম তখনই যেন আমি সত্যকে দেখতে পেয়েছিলাম। আজও তাই দেখছি। সেই সত্যের মহিমান্বিত আবেশ কখনও কাঁপেনি, বাড়েনি বা কমেনি। সেইদিন থেকে আজ উনিশ বছর কেটে গেছে, আজ আমি এই কথা বলা শুরু করতে পারছি! কিন্তু তুমি, তুমি? তুমি তো তাঁর বাণী হাজার হাজার ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিয়েছো।"[১]

প্রকৃতপক্ষে জো স্বামীজীর ব্রত উদ্‌যাপনের কাজকে দেহী বিবেকানন্দকে সেবারই সমতুল্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজীর মধ্যে দেখেছিলেন তিনি একটি নৈর্ব্যক্তিক যুগাদর্শের পরিপূর্ণ রূপ। যার জন্য তিনি আজীবন স্বামীজীর ব্রতকেই বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর তিনি সেই ব্রতকেই তাঁর একমাত্র কাজ বলে গ্রহণ করেছিলেন।[২] পিছন ফিরে আর কখনও তাকান নি। স্বামীজীর বিশ্বজনীন যুগাদর্শকে কার্যে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষা জো-কে ধূমকেতুর মতো এক স্থান থেকে আর একস্থানে টেনে নিয়ে যেত—কখনো আমেরিকা, কখনো ইউরোপ, কখনো বা জাপান, আবার কখনো বা তার 'বন্ধুর' মাতৃভূমি ভারতবর্ষে। পথ চলতেই তাঁর আনন্দ,—আর উপনিষদের সেই বাণী 'চরৈবেতি চরৈবেতি'—এগিয়ে চলার মন্ত্রই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। বেটির কন্যা ফ্রান্স জো সম্পর্কে বলেছিল—'পথ চলাতেই, তাঁর সবচেয়ে ভালো বিশ্রাম ছিল'

১. Re.omoscemces. P. 245
২. অতীতের স্মৃতি, পৃঃ ১৭৭—৭৮

(She rested best 'on wheels')[১]। জোর একটা স্বভাবসুলভ ক্ষমতা ছিল, তা হলো এই যে, তিনি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যে কোন জায়গায় স্বামীজীর কাজের জন্য বেড়িয়ে পড়তে পারতেন। একটা দৈবপ্রেরণা তাঁকে স্বামীজীর কাজের জন্য এক স্থান থেকে আর এক অজানা স্থানে নিয়ে যেত। আমৃত্যু বিরাম-বিহীন ছিল এই চলা। কাঁধে ঝুলিয়ে নিতেন প্যাময় চামড়ার একটি ব্যাগ। তাতে সব সময়ই থাকতো হাজার ডলারের সমান বিভিন্ন দেশিয় মুদ্রা—টাকা, লায়ার, ষ্টার্লিং, ড্রাক্‌মা ইত্যাদি। সহজ সাবলীল ছিল তাঁর জীবনধারণ। ভ্রমণকালে তিনি টুপি পড়েই শুয়ে পড়তেন ; নিদ্রা যেতেন। তাঁর এমন কোন টুপি ছিল না যেটা মাথায় না দিয়ে তিনি ট্রেনে বা জাহাজে ঘুমোন নি। চিতাবাঘের চামড়ার তৈরি কোটটি ছিল তাঁর অঙ্গের চির-ভূষণ। বহুল-ব্যবহারে তা পরিধানের অযোগ্য হলেও তা বদলানোর জন্য তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। শুধু পোষাক নয়, খাওয়ার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন উদাসীন। রাস্তায় চালাকালীন দুধ ছিল তাঁর ক্ষুধা নিবারণের অন্যতম প্রধান খাদ্য। যে কোন খাবারের দোকান থেকে তিনি দুধ কিনে খেয়ে নিতেন। এইভাবেই যাযাবরের মতো বিশ্বপরিক্রমা করতেন, অবশ্য যাযাবরের মতো উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে কখনো নয়। ঘরে বা বাইরে যেখানেই হোক, স্বামীজীই জুড়ে ছিলেন জোর-র এই বিরাট যাযাবর জীবনকে। সাত বছরের বিবেকানন্দ সান্নিধ্যকে পরবর্তী সাতচল্লিশ বছর ধরে জো এইভাবেই জীবনযাপন করেছিলেন। জীবন যাপনের এই অদ্ভুত ধারা আমাদের বিস্মিত করে। এই বিশেষ কারণে রিজলীর আত্মীয় স্বজনেরা জো-কে "অবাস্তব," "মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত নারী' প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছিলেন। স্বামীজীও জো-প্রমুখ পাশ্চাত্য নারীদের 'Living Vedantin'[২] বলে অভিহিত করেছিলেন ঠিক ঐ একই বৈশিষ্ট্যের জন্য।

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামীজীর তিরোধান যেমন আকস্মিক ঘটনা, ম্যাকলাউডের জীবনে এ ঘটনাও তেমনি ততোধিক আকস্মিক। তিনি যখন লণ্ডনে, এ দুঃসংবাদ তখন তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল। ঠিক দু'মাস আগেই তিনি বেলুড় ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। জো-এর প্রিয় বন্ধুর মরদেহের উপর প্রজ্জ্বলিত চিতা। সম্মুখে দাঁড়িয়ে গুরুভ্রাতাগণ, ভগিনী নিবেদিতা এবং অসংখ্য ভক্ত অনুরাগীগণ। নির্বাক নিস্পন্দ, মৌন হয়ে কিছু ভাবছিলেন নিবেদিতা। হয়ত ভাবছিলেন স্বামীজীর প্রিয় জো-র জন্য স্বামীজীর কিছু স্মৃতি রাখতে পারলে তো খুশী হতো। ঠিক সেই মুহূর্তে উড়ে এলো লেলিহান শিখার মাঝখান থেকে একখন্ড বস্ত্রাঞ্চল। নিবেদিতা কুড়িয়ে নিলেন ; আর ভাবলেন 'হয়ত হয়ত ঐ বস্ত্রাঞ্চল টুকুই জো'-এর প্রতি স্বামীজীর শেষ আশীর্বাদ। পাঠিয়ে দিলেন ম্যাকলাউডকে, আর লিখলেন, "তোমার জন্য স্বামীজীর শেষ বাণী।"[৩] এ বাণী যখন জো'র কাছে

১. Late and soon. পৃ. 240
২. Late and soon, P. 238
৩. Late and soon, P. 244

পৌছাল, তখন তাঁর চারিদিকে অন্ধকার মনে হলো, ভাবলেন এত শীঘ্র তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর সমস্ত প্রেরণার উৎসস্থল ছিলেন স্বামীজী। সুতরাং জো-র আদর্শের জীবন্ত-পুরুষ হারিয়ে গেলেন, বেঁচে রইলো কেবলমাত্র স্মৃতি ও আদর্শ। আর তাই নিয়েই তিনি সুদীর্ঘ জীবন কাটিয়ে ছিলেন। এতটুকু আদর্শচ্যুত তিনি হতে পারেন নি। জো যে কী গভীর স্বামীজীকে ভালোবাসতেন নিবেদিতাও তা জানতেন। নিবেদিতা তাঁর বন্ধু ইয়ুমকে সেই ঘন দুর্যোগের দিনে লিখেছেন, "সমস্ত পৃথিবী পূজারত, কিন্তু আমি জানি তাঁর স্মৃতির শ্রেষ্ঠ পূজামন্দির তোমার হৃদয় ॥[১] নিবেদিতার পাঠানো স্বামীজীর সেই পূত পবিত্র বস্ত্র খণ্ড জো মহামূল্যবান সম্পদের মতোই সযত্নে কাছে রাখতেন। সময় বিশেষে তিনি তাঁর নিকটতর পাত্রপাত্রীদের মাথায় ছুঁইয়ে দিতেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেই পবিত্র গৈরিক বস্ত্রখণ্ডটি সমুদ্র যাত্রাকালে সমুদ্রের জলে এক বাতাসের ঝাপটে উড়ে গিয়ে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর ম্যাকলাউড তাঁর আদর্শ-মানবের স্মৃতিপূত স্থানগুলি ঘুরে বেড়িয়েছেন। শুধু তাই নয়, স্বামীজীর ফেলে যাওয়া কাজকে পরিপূর্ণ করার জন্য তিনি আমরণ চেষ্টা করেছেন। আমেরিকার বেদান্ত প্রচার কেন্দ্র গুলিকে তিনি সাহায্য করেছেন। শ্রান্তিহীন বিশ্বপরিক্রমা করেছেন এবং মানুষের কাছে উপস্থিত হয়েছেন শুধুমাত্র স্বামীজীর বাণী তাঁদের কাছে পৌঁছে দেবার আশায়। স্বামীজীর প্রতি তাদের অনুরাগ হোক—ম্যাক্লাউড সবসময়ই তা চাইতেন। যেখানেই রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সন্ন্যাসীকে পাঠানো হয়েছে, তা নিউইয়র্ক, ইংল্যাণ্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, প্যারিস, বার্লিন হোক না কেন সর্বত্রই তিনি গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন সাহায্য করতে। তারা "তাঁর ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপেই এসেছেন তাঁর বিশ্বাস।"[২] সত্যিই, বিবেকানন্দ তাঁর কাছে পূজিত হতো ঈশ্বররূপেই। রিজলীর যে ঘরটি জো পরবর্তী জীবনে ব্যবহার করতেন, সেখানে তিনি টাঙিয়ে রাখতেন স্বামীজীর বড় রঙীন প্রতিকৃতি যেটি তিনি মিসেস্ ব্লজেটের বাড়িতে প্রথম দেখেছিলেন। স্ট্রাট্ফোর্ড—অন—এভনে যে বাড়িটি লেগেট পরিবার কিনেছিলেন এবং যেটি কিনেছিলেন জো-র প্রভাবেই সেখানেও নতুন গৃহদেবতা হয়েছিলেন স্বামীজী। Alabaster-এর একটি বড় শ্বেত মূর্তি তৈরি করেছিলেন জো। আর যে ঘরে স্বামীজীর এই ধ্যানমূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে ঘরটির নাম দিয়েছিলেন 'Prophet's Chamber.'[২]

স্বামীজীর জীবনের প্রভাব সংক্রামিত হয়েছিল ম্যাকলাউডের জীবনে ; কিন্তু সেই প্রভাবকে নিজের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখেন নি, তিনিও তা সংক্রামিত করার চেষ্টা

করেছিলেন বিশ্বের আপামর তৃষ্ণার্ত মানুষের জীবনের মধ্যে। ঠিক এ কারণেই তিনি স্বামীজীর বাণী ও রচনাকে বিভিন্ন ভাষায় নিজের প্রযত্নে অনুবাদ করিয়েছিলেন,—এর পরিচয় মেলে অ্যালবার্টাকে লেখা চিঠিগুলিতে। অনুমেয় কী বিশাল পরিমাণ অর্থ এ জন্য তিনি ব্যয় করেছিলেন। স্বামীজীর রাজযোগ ও দেববাণী তিনিই প্রথম আমেরিকায় প্রকাশ করেন এবং জার্মান ভাষায় বইগুলির অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। রোমাঁ রোলাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন স্বামীজীর ও তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনী রচনায়। তিনি জানতেন, পাশ্চাত্যের মানুষকে দিয়েই প্রাচ্যের এই দুই যুগন্ধর পুরুষের জীবন ও বাণীকে পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। উদ্দেশ্য, এঁদের জীবন ও সাধনার সঙ্গে পাশ্চাত্যের মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ভাবতে বিস্ময় জাগে, এই ম্যাকলাউডই বার্নাড শ', লর্ড লিটন, লর্ড ওয়েভেলকে স্বামীজীর প্রতিকৃতি দান করেছিলেন যা তিনি তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন ফ্রান্সের বিখ্যাত শিল্পী লাশীককে দিয়ে। স্বামীজীর প্রতি এ কি তাঁর গভীর প্রীতির ফলশ্রুতি নয়?

ম্যাকলাউড ও ভারতবর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ ভারতভূমির প্রতি আকর্ষণ পাশ্চাত্যের বহু মনীষীর মনে জেগেছিল। জাগার কারণ ভারতবর্ষ প্রাচ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। স্বামীজীর ভারতবর্ষের আকর্ষণে কেউ আসতে পেরেছেন, কেউ পারেন নি। নিবেদিতা এসেছেন ; হৃদয়ের গভীর আকর্ষণ সত্ত্বেও ম্যাক্সমূলার জীবৎকালে আসতে পারেন নি ; কিন্তু ভারতবর্ষের জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন কী অদ্ভুতভাবে। স্বামীজীর প্রিয় বন্ধু, নিবেদিতার ইয়ুম এসেছিলেন এই ভারতবর্ষে। শুধু আসা নয়, নিবেদিতার মতো তিনিও এ দেশের দুঃখ-পীড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন,—সেবা করেছেন। ভারতবর্ষকে সেবা করার মধ্য দিয়ে তিনি স্বামীজীরই সেবা করেছেন। একবার জো স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'স্বামীজী কীভাবে আপনাকে সর্বাধিক সাহায্য করতে পারি?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—'ভারতবর্ষকে ভালোবাস।' স্বামীজীর পরাধীন ভারতবর্ষে জো এসেছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষের দুঃখ-পীড়িত মানুষের কথা স্বামীজী পূর্বেই জানিয়েছিলেন। ভারতের মানুষকে সেবা করার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতির দরকার সে সম্পর্কে স্বামীজী জো-কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন ; "হ্যাঁ, আসতে পার, যদি দেখতে চাও আবর্জনাস্তূপ, অবনতি, দারিদ্র আর কটি মাত্র বস্ত্রাবৃত সন্ন্যাসীর মুখে ধর্মের বাণী। যদি অন্য কিছু চাও তবে এসো না। আমরা আর একটিও সমালোচনা সহ্য করতে রাজী নই।"

১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে জো ভারতবর্ষে এলেন। সঙ্গী ছিলেন ধীরামাতা, মিসেস্ ওলিবুল ও সারদানন্দজী। গঙ্গাতীরের বেলুড় তাঁকে বিস্মিত করলো,—আশ্রয় পেল সেখানে। স্বামীজী সাদরে অতিথিদের নিয়ে এসেছিলেন সেখানে। কয়েকদিনের বিশ্রামের পর শুরু হলো

ভারতবর্ষ পরিক্রমা। নিবেদিতা, জো, ধীরামাতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী ভারতচেতনার অস্তিত্বকে দেখাতে লাগলেন সর্বত্র ঘুরে ঘুরে। এই ভ্রমণের অবিস্মরণীয় স্মৃতি রয়েছে নিবেদিতার লেখা ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'Notes on wanderings'—এ। ভারতবর্ষের মানুষের চালচলন-রীতিনীতি, ভারতের মাঠ-ঘাট-প্রান্তর, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, মঠ-মন্দির একই সঙ্গে বিস্মিত ও পুলকিত করে তুলেছিল তাঁদের মনকে। ভারতবর্ষকে আগে জান, তারপরে সেবা-যজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়—এই ছিল পাশ্চাত্য অনুরাগীদের প্রতি স্বামীজীর নির্দেশ। তিনি বলতেন, ভারতবর্ষকে যদি সেবা করতে হয় তবে তার রীতি-নীতি, জীবনচর্যা সবকিছুকে জানতে হবে, স্বীকার করে নিতে হবে, তারপরে সেবিকার মতো সেবা করতে হবে। প্রসঙ্গত একটি ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে, কাশ্মীরে বৈষ্ণব-তিলোক সজ্জিত আলাসিঙ্গাকে দেখে জো অবজ্ঞাসূচক উক্তি করেছিলেন। তাতে যারপরনায় রাগান্বিত হয়ে জো'কে তিরস্কার করেছিলেন। জো সেদিন ফুঁপিয়ে কাঁদলেও পরে তার ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। পরে আলাসিঙ্গার অতুলনীয় গুরুভক্তির পরিচয় পেয়ে জো বুঝেছিলেন, কেন স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্যের প্রতি অবজ্ঞাতেও এত গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। তারপর ক্রমশ তিনি ভারতবর্ষকে চিনেছেন, জেনেছেন, একাত্ম হয়ে. গিয়েছেন।

রিজলীর পর ভারতবর্ষে এসেই ম্যাকলাউড স্বামীজীকে আরও গভীরভাবে পেলেন। স্বামীজীর অনন্ত প্রসারিত হৃদয়ের প্রভাব তাঁর উপর আরো গভীরভাবে পড়েছিল এই সময়ে। বেলুড়ের গঙ্গাতীরের জীবন ও স্বামীজীর আদর্শ—এ দুই-কে তিনি তাঁর জীবনের পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মঠ বাসের দিনগুলি তিনি অতিবাহিত করতেন কাজে, ধ্যানে ও বিবেকানন্দ মননে। মঠের পাশে একটি পুরানো বাড়ি নতুন করে সারিয়ে নিলেন জো ও ধীরামাতা। এই বাড়িটিই লেগেট হাউস হিসাবে পরিচিত। সম্মুখে প্রবহমান স্রোতস্বিনী গঙ্গা, সকাল সন্ধ্যায় স্বামীজীর দিব্যসান্নিধ্য, মন্দিরে পূজা, আরতি, জপ, ধ্যান, ঈশ্বর তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা ; আরও অদূর ভবিষ্যতে স্বামীজীর স্বপ্নকে, তাঁর প্রবর্তিত যুগাদর্শকে বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার বাসনা—এ সবের মাঝে তাঁর দৈনন্দিন জীবনচর্যা। বেলুড় মঠ তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল স্বর্গের মতো। মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীরা তাঁর আপনজন। স্বামীজীর এই মঠটি যাযাবর জো-র হয়ে উঠলো স্থায়ী ঠিকানা। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর থেকে জো-র জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বেলুড়-ই ছিল তাঁর অপরিবর্তিত ঠিকানা। বছরের প্রায় প্রতি শীতেই তিনি উপস্থিত হতেন বেলুড়ের ঐ লেগেট হাউসে। মঠবাসের দিনগুলো তখন হয়ে উঠতো আনন্দে উচ্ছল ; কথায়, কাজে, চিন্তায়, ধ্যানে বিবেকানন্দময়। বিশ্বাস ও প্রেমের মধ্য দিয়েই স্বামীজীকে জীবন্ত করে রাখতেন। মঠের তরুণ সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনি ঐ বিশ্বাস ও প্রেমের ভাবকে সংক্রামিত করে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। তাঁর নিজের কথায়—"এখানে আমি মঠের তরুণদের মধ্যে বিবেকানন্দকে

জাগ্রত রাখি। মঠের দোতলার কক্ষটি আমার নিজস্ব ; সেখানে আমি প্রতি শীতে গিয়ে উঠি এবং সম্ভবত জীবন অবসানের পূর্ব পর্যন্ত গিয়া উঠিব।"[১] তরুণ সন্ন্যাসীদের 'প্রিয় ট্যান্টিন' উৎসাহ দিয়ে তাঁদের বলতেন—"তোরা বিবেকানন্দের ছেলে, তাঁর জয় জয়কার। বিবেকানন্দের জয় হোক।"[২] বিবেকানন্দের উপর কি গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল এই পাশ্চাত্যনারীর। তিনি বলতেন, "এই দীর্ঘ জীবনের বহুল অভিজ্ঞতার পরেও কেন 'বিবেকানন্দ', 'বিবেকানন্দ,' বলে পাগল হয়ে ছোটাছুটি করি জানিস? কারণ আজ পর্যন্ত তাঁর চেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষ চোখে পড়েনি। যেদিন দেখতে পাবো, সেই মুহূর্তে তোদের বিবেকানন্দকে ছেড়ে তাঁকে মানবো, তাঁর হয়ে যাবো ; তবে এখনো মিললো না এই যা।"[৩]

স্বামীজী প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যে জো সবসময়ই এগিয়ে যেতেন। স্বামীজীর তিরোধানের পরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বহু মঠ-মিশন গড়ে উঠেছে। এসব দেখে বৃদ্ধা ট্যান্টিন গর্ব অনুভব করতেন। স্বামীজীর স্বপ্নের ভারতবর্ষের রূপায়ণ দেখে জো-র স্বপ্নও সার্থক হয়েছিল। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন,—

"ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ হচ্ছে—এটি দেখা এবং এ কাজে মুক্তভাবে সাহায্য করা—এই হল আমার কাজ। আর এ কাজ আমার কতখানিই না প্রিয়! সংসার অরণ্যের মাঝখান থেকে এই অগ্নিময় অনুপ্রাণিত সেবকদল কেমন করে নতুন মুক্তির পথ তৈরি করেছে।"[৪] জো মঠের সেবামূলক কাজে সবরকমের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসতেন। সেই কাজ তাঁর কাছে স্বামীজীর সেবারই সমতুল্য বলে মনে হত। ভারতবর্ষের সেবায় জো'র আত্মনিয়োগের পরিমাণ অপরিসীম। স্বামীজী তাঁর মাতৃভূমিতে যে সুশিক্ষার ব্যবস্থা চেয়েছিলেন, জো নিবেদিতার সঙ্গে সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সবধরণের শিক্ষামূলক কাজে এগিয়ে আসতেন। বেলুড় বিদ্যামন্দির স্থাপনে তিনিই সর্বপ্রথম অর্থদান করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে, তখন ম্যাকলাউড দশ হাজার টাকা দান করেন। স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান সাধনা ও সেই বিজ্ঞানের প্রসারতার প্রকল্পে তিনিও অর্থ-সাহায্য করেন। তাঁর ভারতপ্রীতির আর একটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করছি। একবার মঠের জমির উপর দিয়ে রেললাইন বসানোর ব্যবস্থা করেন তৎকালীন ইংরেজ সরকার। মঠবাসীদের এই দুঃসময়ে অভাবনীয় সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন জো, মঠবাসীদের ট্যান্টিন। তিনি বিলাতে লেডী স্যাণ্ডউইচ-এর (বেটি ম্যাকলাউডের কন্যা, স্বামীজীর প্রিয় আলবার্টা) সঙ্গে যোগাযোগ করে বিলাতের সরকারের মাধ্যমে ঐ ব্যবস্থা বর্জন করান। তাঁর এই সফলতার জন্য সারদানন্দজী অভিনন্দন জানালে—তিনি স্বামীজীর মন্দিরের দিকে নির্দেশ করে বলেন—"এটা

১. Reminiscences. , 243, 245

২. রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ জীবনালোকে,—স্বামী নির্লেপানন্দ, পৃঃ ৫৮

৩. ঐ পৃঃ ৫৯

৪. Reminiscences, P. 251

কি আমার জয় স্বামীজী! ওখানে ঐ যে মর্মর মূর্তি বসানো রয়েছে, এটা তাঁর জয়।" বেলুড় মঠের উপর ব্রিটিশ সরকারের রোষ দৃষ্টি পড়েছিল, জো-ই মঠকে তখন বিপদ থেকে উদ্ধার করেন—এর প্রমাণ তদানীন্তন বড়লাটের গোপন ফাইল। (ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের "স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ মিশন" প্রবন্ধে প্রকাশিত)। সেই ফাইলে নিম্নরূপ বিবৃতি আছে,—"মাত্র কয়েকদিন পূর্বে একজন আমেরিকান মহিলা আমার সাক্ষাত করিয়া বলেন, যদি বেলুড় মঠ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহলে আমেরিকায় ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হইবে। এই সময় (বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ সরকার আমেরিকার সাহায্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন) কোনে রকমে আমেরিকার বিরুদ্ধভাজন হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।"[১] এই আমেরিকান মহিলাই যে ম্যাকলাউড তা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে।

বাংলাদেশে একটি ভালো পত্রিকার অভাব স্বামীজী অনুভব করতেন। সেসময় সাহিত্য, ধর্ম, দর্শনমূলক চিন্তা সমন্বিত সৎপত্রিকা অতি অল্পই ছিল। স্বামীজী 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশ করতে চাইলেন। জো সেসময় ৮০০ ডলার দিয়ে স্বামীজীকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। স্বামীজীর মাতৃভূমিকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য জো-ও এগিয়ে এসেছিলেন। নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপ যাতে নিরাপদ হয় তার জন্য তাঁর সবরকমের প্রচেষ্টা ছিল। এছাড়া, বেলুড় মঠের গেষ্ট হাউসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও লর্ড লিটনের গোপন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। কৃষির উন্নতি ঘটিয়ে তিনি ভারতবর্ষের দরিদ্র কৃষক শ্রেণীকে স্বাবলম্বী করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি নিজ অর্থব্যয়ে মিশরের নদী-পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ উইলকস্ত্রকে এনেছিলেন এবং ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড ওয়েভেলকে এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেন। ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বলকারী সন্তানদের সঙ্গে তিনি মিলিত হয়েছিলেন। অ্যালবার্টাকে লেখা চিঠিগুলিতে তার প্রমাণ মেলে। গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর তিনি লিখেছেন—

"ভারতমাতার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান যিনি সত্যকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"[২] তিনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডীচেরী শ্রী অরবিন্দ আশ্রমে গিয়েছেন। অরবিন্দ ছিলেন স্বামীজীর একান্ত অনুরাগী ও ভক্ত। তাই আলিপুর জেলে তিনি স্বামীজীর দর্শন পেয়েছিলেন ধ্যানের মধ্যে। এ খবর যখন ম্যাকলাউড শুনেছিলেন তখন তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠেছিলেন। অ্যালবার্টাকে তিনি লিখেছেন,—"স্বামীজী ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন, তার সাত বছর পড়ে তিনি অরবিন্দ ঘোষের কাজে আবির্ভূত হয়েছেন। আমার কাছে এটা গভীর তৃপ্তিকর, কারণ স্বামীজীর এই মহান উত্তরাধিকারী বর্তমান আছেন।"[৩]

শ্রীমা, স্বামীজী এবং নিবেদিতা—এই তিন ব্যক্তিত্বের চোখে ম্যকলাউড সম্মান

১. পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন—শ্রী লাডলী মোহন রায়চৌধুরী পৃঃ ১৩৮
২. Letters of Macleod from. 1924—46
৩. Ibid—P. 1924—46

পেয়েছেন মহীয়সী নারীর। শ্রীমা তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'সে প্রকৃত নারী,' নিবেদিতা সম্মোধন করেছেন 'আধাত্মিক মা' বলে ; আর স্বামীজী তাঁকে পেয়েছিলেন তাঁর কর্মের শক্তিরূপিনী হিসেবে। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ১লা মে নিবেদিতা স্বামীজীর দর্শনে বলরাম মন্দিরে উপস্থিত হন। সেদিন জো সম্পর্কে স্বামীজী যা বলেছিলেন তা নিবেদিতার চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে। বলেছিলেন, "সে আমার শুভভাগ্য, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে জো ছিল তাই। আমার কাজ ঠিকমত হয়েছে, ভারতে জো নেই তাই কিছুই হচ্ছে না।"[১] জো-এরও ছিল স্বামীজীর উপর গভীর ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার গভীরতর কথা বলতে গিয়ে জো-কে লিখেছিলেন নিবেদিতা—"তুমিই সেই দেবী, তুমি জন্মেছ "to Protect Him—Our Divinest Incarnation."[২] স্বামীজীর উপর এই ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর সন্তানদের উপরও। তাই দেখি তিনি মঠের ত্যাগী ছেলেদের জন্য দশ হাজার টাকার পোষাক পরিচ্ছদ ও শরীর স্বাস্থ্য সবল রাখার জন্য আনাচ্ছেন জারসি গরু। এ সবই তিনি করেছেন বিবেকানন্দকে ভালোবেসে। সেই মহাপুরুষকে কী গভীর শ্রদ্ধায় না তিনি করতেন। বিবেকানন্দ-পূজা, তাঁর ধ্যানকে তিনি জীবনের অবলম্বন হিসেবেই শেষদিন পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর চারপাশের জগতের যে কেউ বিবেকানন্দের কথা জানতে চেয়েছেন, তাকেই তিনি স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছেন। একবার মঠে একটি চোর ধরা পড়েছে। গভীর রাত্রে গেষ্ট হাউসের দোতলার ঘরে এক বিদেশিনী বৃদ্ধার গলা থেকে হার নিয়ে পালাচ্ছিল। তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে বিচার চলছে। ঠিক তখনই বিদেশিনী মহিলা ঘরে ঢুকে মহারাজকে বললেন, "মহারাজ, আমার মনে হয় চোরটি ভক্ত। তা না হলে ঘরে কত জিনিস ছিল, সে-সব না নিয়ে আমার গলার নেকলেশটা নিতে যাবে? আপনি তো জানেন, ঐ নেকলেশটার মধ্যে স্বামীজীর প্রদত্ত লকেটটি আছে। আমার বিশ্বাস লকেটটা নেওয়াই চোরটির মতলব ছিল।"[৩] মহাপুরুষ মহারাজ বেকসুর খালাস দিলেন। শুধু তাই নয়, গঙ্গাস্নান করিয়ে নোতুন কাপড়, চাদর পরিয়ে তাকে মুক্তি দিলেন। এইভাবে মুক্তি দিলেন বিবেকানন্দ প্রাণা ম্যাকালউডকে। জো মনে করেছিলেন, স্বামীজীর স্মৃতি বিজড়িত লকেট যে চুরি করতে আসে সে চোর নয়, বরং তার প্রিয় ভক্তই। এই বিশ্বাসের উপর ভর করেই তিনি সারাজীবন দিব্যানন্দে কাটিয়ে দিলেন।

অবশেষে বৃদ্ধা ট্যান্টিনের জীবনপরিক্রমা শেষ হলো। স্বামীজীর স্মৃতি পূত পবিত্র হলিউড বেদান্ত সেণ্টারে ৯১ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সালটা ছিল ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর। ভারতবর্ষ তখন পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়েছে।

১. Letters of Nivedita, Edited by Sankri Prsad Basu, 1st Part, P. 128
২. L:etters of Nivedita, Part—1, P. 385
৩. শিবানন্দ স্মৃতিসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪

'স্বামীজীর সংস্পর্শে ক্রিস্টিন'

ক্রিস্টিন-কে ১৯০১, ৬ই জুলায় স্বামীজী লিখেছেন, ".......আমি ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র ; কিন্তু আমি জানি যে তুমি মহৎ, আর তোমার মহত্ত্বে আমার সর্বদা আস্থা আছে। অন্য সকলের বিষয়ে ভাবনা হলেও তোমার সম্পর্কে আমার একটুও দুশ্চিন্তা নেই।" তারপরেই লিখেছেন, "জগজ্জননীর কাছে তোমাকে সমর্পণ করেছি। তিনিই তোমাকে সর্বদা রক্ষা করবেন ও পথ দেখাবেন। একথা নিশ্চয় জানি যে, কোন অনিষ্ট তোমাকে স্পর্শ করতে পরাবে না—কোন বাধা বিঘ্ন মুহূর্তের জন্যও তোমাকে নিরুৎসাহ করতে পারবে না।"[১]

প্রিয় শিষ্যা ক্রিস্টিনের উপর কী গভীর আস্থা ও বিশ্বাস স্বামীজীর মনে ছিল তা উপরিল্লিখিত পত্রাংশে লক্ষ করা যায়। ক্রিস্টিনের দৈব-নির্ধারিত জীবন সম্পর্কে স্বামীজী গভীর আশা পোষণ করতেন। এই বিদেশিনী যে বেপথু হতে পারে তিনি তা মনেও ঠাঁই দিতেন না। বরং পরমেশ্বরের শুভ দৃষ্টিতেই যে ক্রিস্টিনের জীবন নিয়ন্ত্রিত—একথা স্বামীজী গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। অন্যান্যদের থেকে তাঁকেই না-কি স্বামীজী বেশি ভাসবাসতেন, একথা স্বামীজীর অন্যতম আমেরিকান অনুরাগিনী মিস ম্যাকলাউড বলতেন। তবে একথা পরিস্কার যে, ক্রিস্টিনের উন্নত জীবন সম্বন্ধে স্বামীজীর বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল না। অপরদিকে স্বামীজীর আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে তাঁর জীবন আলোকিত হয়েছিল। গুরুর আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে অন্যমাত্র সংশয়ের ধোঁয়াশা তাঁর মনে ছিল বলে মনে হয় না। এমন নিবেদিত প্রাণা নারী পৃথিবীতে কম জন্ম নেয়। স্বামীজী সম্ভবত এই কারণেই ক্রিস্টিন-কে গভীরভাবে ভালবাসতেন। যাঁরা স্বামীজীর নিকট সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ক্রিস্টিন ছিলেন স্বামীজীর শ্রেষ্ঠতম ও সর্বাধিক প্রিয় শিষ্যা।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে যে দশ-বারো জন্য পাশ্চাত্য নর-নারী স্বামীজীর আধ্যাত্মিক জীবনের গভীর সংস্পর্শে এসেছিলেন ক্রিস্টিন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এস. ই. ওয়াল্ডো—বর্ণীত 'Inspired talk' থেকে স্বামীজীর সে সময়কার পূত-পবিত্র জীবন সম্পর্কে, স্বামীজীর জীবনে দৈব অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। স্বামীজীকে সশরীরে দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। অধ্যাত্ম-জগতের কোন্ শিখরে তিনি বিরাজ করতেন—'দেববাণী'-ই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'দেববাণী'-র ভিতর দিয়েই যাতে স্বামীজীর স্পর্শ পাই—এই আমাদের আন্তরিক আশা। যাহোক, ক্রিস্টিন স্বামীজীর পবিত্র জীবনের স্পর্শ পেয়েছিলেন। ক্রিস্টিন ধন্য! ক্রিস্টিন সৌভাগ্যবতী।

ক্রিস্টিনের জীবনে স্বামীজীর প্রভাব গভীর, যে জীবন শুনিয়েছিল ভারতচেতনার কথা, আধ্যাত্মিকতার বাণী। প্রথম দর্শনেই তিনি স্বামীজীকে চিনতে ভুল করনে নি। আপন করে

১. স্বামীজীর বাণী ও রচনা ঃ ৪র্থ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, ৮।১৯২

নিয়েছিলেন। ক্রিস্টিন তাঁর জীবনজিজ্ঞাসার সদুত্তর পেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক স্বামীজীর বাণী থেকে। আর কিন্তু একবারের জন্যও পিছন ফিরে তাকান নি। এসবকথা আমরা জানতে পারি তাঁর 'মেমোয়ার্স অফ্ বিবেকানন্দ' রচনায়। মিসেস ফ্রাঙ্ক, মিস ওয়াল্ডো-ও তাঁদের স্বামীজীর সংস্পর্শে—জীবনের কথা অনেক শুনিয়েছেন স্মৃতি কথায়। ক্রিস্টিন লিখেছেন—"বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনার পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা বুঝলাম আমরা সেই পরশপাথরের সন্ধান পেয়েছি যা আমরা এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছি। এক নিঃশ্বাসে আমরা বলে উঠেছিলাম 'ভাগ্যিস এসেছিলাম'।"[১] ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথার প্রতিটি ছত্রে বিবৃত অসাধারণ নৈষ্টিক গুরুভক্তি। শিষ্যের কছে গুরু শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক পুরুষ নন, তিনি স্বয়ং জ্যোতির্ময় দেবতা। সেই জ্যোতির্ময় দেবতা এ জগতে এসেছেন মানব কল্যাণের তাগিদে। ক্রিস্টিন তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন,—"ধন্য সেই দেশ যে দেশে তিনি জন্মে ছিলেন, তাঁরাও ভাগ্যবান যাঁরা তাঁর সময় এই পৃথিবীতে ছিলেন, আর শতধারায় আশীর্বাদপুষ্ট অল্প কয়েকজন যাঁরা তাঁর পাদমূলে বসবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ক্রিস্টিনের মনে উপরোক্ত প্রভাব পড়েছিল স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনেই। সেই দিনটি ছিল ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি। কোন্ মানসিকতা নিয়ে সেদিন বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন এবং স্বামীজীর বক্তৃতায় কী পেলেন সে প্রসঙ্গে পরে আবার আসবো। এই অবসরে ক্রিস্টিন কোন্ পরিবেশ থেকে উঠে এসেছিলেন তার পরিচয় রাখি।[২]

জার্মানীর নুরেন বার্গ শহরে ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট ক্রিস্টিন এ পৃথিবীর আলো দেখেন। পিতা জার্মান পণ্ডিত ফ্রেডারিক গ্রীনসাইডেল। জার্মান পণ্ডিতদের ধারায় এসেছিলেন পণ্ডিত গ্রীনস্টাইডেল। স্বভাবতই কন্যার ধমনীতে প্রবাহিত হয়েছিল ঐতিহ্যের ধারা ; কাণ্ট-হেগেল-স্পিনোজার দর্শনচেতনা ও মনস্বিতা প্রথম জীবনে হয়ত কিছু পরিমাণে প্রভাব ফেলতে পারে। সব থেকে ক্রিস্টিনের জীবনে যাঁর প্রভাব বেশি পড়েছিল, তিনি হলেন স্বয়ং পিতৃদেব গ্রীনস্টাইডেল। তিন বছরের শিশু ক্রিস্টিনকে নিয়ে গ্রীনস্টাইডেল ও তাঁর স্ত্রী চলে আসেন সুদূর জার্মানি ছেড়ে আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরে। সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন ৪১৮ নং অ্যালফ্রেড স্ট্রিটের বাড়িতে, আমেরিকার জার্মান—অধ্যুষিত এলাকায়। ক্রিস্টিনের বয়স যখন ১৭ তখন তিনি পিতাকে হারালেন। আত্মভোলা পণ্ডিত ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় করেন নি। সুতরাং ক্রিস্টিনের সামনে দুঃখ-কষ্টের জমাট-পাহাড়। মা-বোনেদের দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়েছিল। সেই সংকট-মুহূর্তে সংগ্রাম ছাড়া অন্যপথ ক্রিস্টিনের সামনে ছিল না। দুঃখ-কষ্ট নিত্য-সাথী ছিল তাঁদের। দীর্ঘ বিশ বছর দারিদ্রের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ। সংসারের দাবিতে তাঁকে ডেট্রয়েটের ফ্রি পাবলিক স্কুলে শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। জীবনধারণের কঠিন

---

১. Reminiscences of Swami Vivekananda, 2nd Edition, P. 106

২. Reminiscences of Swami Vivekananda, 2nd Edition, P.149 .

সংগ্রামই তাঁকে সংসার জীবনের প্রতি অনীহা করে তুলেছিলো। প্রচণ্ড হতাশার মধ্যে তিনি কিছু খুঁজে ফিরছিলেন যা তাঁকে শান্তি দিতে পারে। অন্তর্জীবনে তিনি যেন কোন অদৃশ্য মহাশক্তির প্রেরণা অনুভব করতে লাগলেন। নানান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সভা-সমিতি প্রভৃতি জায়গায় তিনি যাচ্ছেন। খ্রিষ্টান পাদ্রীদের নিষ্প্রাণ উপদেশ তাঁর মনের খোরাক যোগাতে পারতো না। খ্রিস্টান সায়েন্টিস্ট দলের সদস্যও তিনি হয়েছিলেন। কিন্তু হায় শান্তি! শুধু দিন-যাপনের বিড়ম্বনা ও ক্লান্তি তাঁর নিত্য সঙ্গী। অবশেষে নোতুন সূর্যের দেখা মিললো। প্রথম সাক্ষাতেই সব সমস্যার সমাধান পেলেন ; পেলেন নতুন জীবন। তার ইতিহাস আমরা পাবো ক্রিস্টিনের স্মৃতিচারণায়।

১৮৯৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারির এক শীতের সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ ডেট্রটের ইউনিটেরিয়ান চার্চে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মানুষের দেবত্ব'। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেদিন সন্ধ্যায় ক্রিস্টিন বন্ধু মিসেস ফাঙ্কির সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে গতানুগতিক বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন। কিন্তু বক্তৃতা শুরু হওয়ার পর ক্রিস্টিনের মনে শুধু বিস্ময় আর আনন্দ। এক অভূতপূর্ব আস্বাদ তিনি আহরণ করতে লাগলেন। বক্তৃতার মাঝে খুঁজে পেলেন জীবনের আকাঙ্ক্ষিত সত্যকে। ইতিপূর্বে যত বক্তৃতা-আলোচনা তিনি শুনেছেন সবগুলিই ছিল একঘেঁয়ে, অসম্পূর্ণ এবং সত্য থেকে অনেক দূরের। সেসব বক্তৃতা মনের মধ্যে নোতুন খোরাক জোগাচ্ছিল না। স্বামীজীর সেই বক্তৃতায় কী যাদু ছিল যা শুনে ক্রিস্টিন বিমোহিত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর জীবনে একটি বিশেষ বাঁক নিয়েছিল? ১৮ই ফেব্রুয়ারির 'ফ্রী প্রেস'-এর মন্তব্যটি উল্লেখ করলে এ ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে—"আবহাওয়া প্রতিকূল হইলেও প্রাচ্য ভ্রাতার (ইনি এই ভাবেই সম্বোধিত হইতে চান) আগমনের আধঘণ্টা পূর্বেই গীর্জার দরজা পর্যন্ত লোক পরিপুর্ণ হইয়া গেল। সমুৎসুক শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে সর্বশ্রেণীর এবং সর্ব-ব্যবসায়ের ব্যক্তিদেরই সমাবেশ হইয়াছিল ; সেখানে ছিলেন উকিল, জজ, খ্রিষ্টধর্ম প্রচারক, ব্যবসায়ী, ইহুদী ধর্মপ্রচারক ; আর মহিলাদের তো কথাই নাই, কারণ ইহারা বারংবার বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিয়া এবং গভীর মনোযোগসহ উহা শ্রবণ করিয়া ইহাই জানাইয়া দিতেছিলেন যে, এই অশ্বেতাঙ্গ অতিথির প্রতি তাঁহারা তাঁহাদের প্রশংসা করিতে সমুৎসুক। আর ইনি ঘরোয়া বৈঠকে যেমন প্রকাশ্য বক্তৃতায়ও তেমনি সমভাবে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন।..........প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া বিবেকানন্দ মানবীয় ও দৈব তথ্যবলী লইয়া এমন একটি দার্শনিক পটচিত্র অঙ্কিত করিলেন যাহা এতই যুক্তিযুক্ত যে, তিনি বিজ্ঞানকেও সাধারণ ব্যাপার সদৃশ সহজবোধ্য করিয়া তুলিলেন। যে পটখানি তিনি চিত্রিত করিলেন তাহা বড়ই মনোরম, উহাতে এত উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশ ছিল এবং ভাবিতে ও দেখিতে তাহা এতই চিত্তাকর্ষক ও আনন্দপ্রদ ছিল, উহা তাঁহার স্বদেশের চিত্রিত একখানি বহুবর্ণরঞ্জিত গালিচা, আর প্রাচ্যদেশেরই মতো মন ভুলানো, সুবাস-বাসিত ছিল উহা। এই ময়লা রঙ্গের ভদ্রলোকটি চিত্রকরের বর্ণ-প্রয়োগেরই

মতো কাব্যিক অলঙ্কার বাব্যহার করিয়া থাকেন এবং যেখানে যে রংটি দরকার ঠিক সেখানেই তাহা প্রয়োগ করেন। ফলে যে ছবি দাঁড়ায়, উহা হয়তো অনেকটা অদৃষ্টপূর্ব কিন্তু তবু বিশেষ চমকপ্রদ। যেসকল ন্যায়পূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি পরপর বলিয়া যাইতেছিলেন তাহা ছিল বিচিত্র বর্ণশীল বস্তুর দ্রুত পরিবর্তনেরই মতো, আর যে কৌশলী ব্যক্তি উহাদের নাড়িতেছিলেন, তিনি প্রায়ই এই পরিশ্রমের জন্য আবেগপূর্ণ প্রশংসাধ্বনি পাইতেছিলেন।"[১]

জটিল দর্শন ও বিজ্ঞানের বিষয়কে অতি প্রাঞ্জলভাবে স্বামীজী বক্তৃতায় উপস্থাপনা করতে পারতেন। সর্বোপরি, তাঁর বক্তৃতা যেন ঐশী বাণী হয়েই শ্রোতাদের মনে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিতো, এমন সমর্থন উপরোক্ত বর্ণনায় মেলে। ক্রিস্টিন স্বামীজীর বক্তৃতায় ঐ ঐশী বাণীকেই খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর যুক্তিবাদী মন ও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা স্বামীজীর মধ্যে সেদিন পেয়ে গিয়েছিল পরম আশ্রয়। ভারতাত্মার প্রতিমূর্তিরূপে ক্রিস্টিনের মানস-চক্ষে উন্মোচিত হয়েছিলেন স্বামীজী। ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথায়—"সেই নবীন সন্ন্যাসীর দেহ স্বর্ণাভায় মণ্ডিত ; সুদূর ভারত থেকে তিনি প্রাচীন আদর্শ ও আত্মার বাণী বহন করে এনেছিলেন।"[২] স্বামীজীর বক্তৃতা ক্রিস্টিনকে কেমনতর আবিষ্ট করেছিল?—ক্রিস্টিনের কথায়— "সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের সান্নিধ্যে এসেই সব সন্দেহের অবসান হয়েছিল। তাঁর বক্তৃতার প্রথম কটি বাক্য শোনার পরে সবসময়ই মনে হত এ শুধু শোনা নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতি।" স্বামীজী তাঁদের শোনাতেন ভারতের রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদের কথা। উপনিষদের সংস্কৃত শ্লোকগুলি যখন স্বামীজী সুর করে আবৃত্তি করতেন তখন শ্রোতারা বিমোহিত হয়ে যেতেন। ক্রিস্টিন সাধারণ শ্রোতাদের থেকে আরও গভীরভাবে স্বামীজীর ভাবালোকে প্রাণিত হয়েছিলেন। ডেট্রয়েটের ঐ দর্শনের পরে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘদিন সাক্ষাৎ হয় নি। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জুলাই আবার ক্রিস্টিন ও ফাঙ্কি স্বামীজীর সান্নিধ্যে এলেন। প্রথম সাক্ষাৎ থেকে দ্বিতীয় সাক্ষাতের কাল অবধি স্বামীজীর দর্শন না পেলেও আপন অন্তর জগতে তাঁকে স্থায়ী আসন দিয়েছিলেন। 'গুরু' শব্দটি তখনও তাঁদের কাছে ছিল অপরিজ্ঞাত। ক্রিস্টিন লিখেছেন, "কি এসে যায় তাতে, যা জেনেছি তা হৃদয়ঙ্গম করতেই তা কত বছর কেটে যাবে।"[২]

প্রাচীন ভারতবর্ষের 'আত্মার বাণী' স্বামীজীর মুখ থেকে সেই প্রথম শুনলেন ক্রিস্টিন ও তাঁর সঙ্গী। অতীত ভারতের জ্ঞানের বিষয় একজন নবীন সন্ন্যাসীর কাছে শুনে যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলেন। ক্রিস্টিন বলেছেন, "আমি ইতিপূর্বে এমন কথা শুনিনি।" শুধু ক্রিস্টিন বা তাঁর সঙ্গী নন, সমস্ত শ্রোতৃবৃন্দই স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে বাক্‌রহিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেদিনের স্বামীজীর বক্তব্য-বিষয় উপস্থাপনার কথা বলতে

গিয়ে ক্রিস্টিন লিখেছেন—'কখন হাস্যরসে, কখনও বিষাদময়তার মধ্য দিয়ে গভীর জ্ঞানের কথা, আদর্শের কথা, দার্শনিক চেতনার কথা সূক্ষ্মভাবে যেন বয়ন করে চলেছেন। ভারতচেতনার বাণীই সেই বক্তৃতায় স্থান পেয়েছে—মানুষের দেবত্বের কথা, অসীম-অনন্ত আত্মার কথা তিনি বলেছেন।...........ক্রিস্টিনের জীবনে এসব বাণী অনুভবের গভীরতায় সত্য হয়ে উঠেছিল। তিনি স্বামীজীর এই বাণীকে চিহ্নিত করেছেন, "The wondrous Evangel of the Self."[১]

বিবেকানন্দের গম্ভীর অথচ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে যেদিন প্রথম ক্রিস্টিন 'ইণ্ডিয়া' শব্দটি শুনিছিলেন সেদিন থেকেই তিনি ভারতবর্ষকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। পাঁচ অক্ষরের এই নামের মধ্যে যেন যাদু-মেশানো ছিল। সেই নামে ক্রিস্টিন আবিষ্কার করেছিল ভালবাসা, স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-উদ্দীপনা, বিষাদ-যন্ত্রণা ; সবার অভ্যন্তরে ছিল ভালবাসা—শুধু অকৃত্রিম ভালবাসা। ক্রিস্টিনের মনে এ ব্যাপারটি ঘটেছিল স্বামীজীকে ভালবেসে, ভারতবর্ষকে ভালবেসে। ভারতবর্ষের মানুষ, তাঁর ইতিহাস, শিল্প, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পাহাড়-পর্বত, তার সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ক্রিস্টিন ডুবে যেতে চাইলেন। স্বামীজীকে দেখা ও তাঁর বক্তৃতা শোনার পর এইভাবেই ক্রিস্টিন একজন বিশেষ নারী'-রূপে নিজেকে আবিষ্কার করতে চাইলেন—তাঁর মানসিক পরিবর্তনের এই ব্যাপারটি আমরা তাঁর স্মৃতিকথা থেকে জানতে পেরেছি।

দুই

সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দ কেমন ধরনের জীবন-যাপন করতেন তা আমরা মিস ওয়াল্ডো লিখিত 'দেবাবাণী' তে পাই। ১৮ই জুন থেকে ৬ই আগষ্ট পর্যন্ত স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যানে ছিলেন তাঁর ছাত্রী শ্রীমতী ডাচারের কুটিরে। সেখানে স্বামীজী বিশ্রামের প্রয়োজনে গিয়েছিলেন। নিরিবিলি পরিবেশে তিনি আধ্যাত্মিক সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে থাকতেন। যে অল্প-ক'জন শিষ্য তার সাহচর্য পেয়েছিলো তাঁরা আর এক নতুন রূপে স্বামীজীকে খুঁজে পেলেন। সহস্রদ্বীপোদ্যানের পরিবেশ, স্বামীজীর দিব্যবাণী ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের কথা আমরা শ্রীমতী ওয়াল্ডো, শ্রীযুক্তা ফাঙ্কি ও ভগিনী ক্রিস্টিনের গ্রন্থ ও স্মৃতিকথাতে পাই। আমরা সে সবের উল্লেখ এখানে করবো না। শুধু সেই দৃশ্যটুকু বর্ণনা করবো যা ক্রিস্টিনদের কাছে স্বর্গ-সুষমায় প্রতিভাত হয়েছিল। মিস ওয়াল্ডোর 'দেববাণী'তে সেই বর্ণনা—

"এইখানেই আমাদের অবস্থান-কালের প্রতি সন্ধ্যায় আচার্যদেব তাঁহাদের দ্বারের সমীপে বসিয়া আমাদের সহিত কথাবার্তা বলিতেন। আমরাও সন্ধ্যায় স্তিমিত আলোকে নির্বাক হইয়া বসিয়া তাঁহার অপূর্ব জ্ঞানাগর্ভ বচনামৃত সাগ্রহে পান করিতাম। স্থানটি যেন

১. Rminiscences : P. 155 1st Edition.

সত্য সত্যই একটি পুণ্যনিকেতন ছিল। পাদনিম্নে হরিৎ পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষশীর্ষগুলি হরিৎ সমুদ্রের মতো আন্দোলিত হইত, কারণ সমগ্র স্থানটি ঘন অরণ্যে পরিবৃত ছিল। সুবৃহৎ (দ্বীপস্থ) গ্রামটির একখানি বাড়িও সেখান হইতে দৃষ্টিগোচর হইত না ; আমরা যেন লোকালয় হইতে বহু যোজন দূরে কোন নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে বাস করিতাম। বৃক্ষ-শ্রেণী হইতে দূরে বিস্তৃত সেন্ট লরেন্স নদী ; উহার বক্ষে মাঝে মাঝে দ্বীপসমূহ ; উহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার হোটেল ও ভোজনালয়ের উজ্জ্বল আলোকে ঝিকমিক করিত। এগুলি এত দূরে ছিল যে, উহারা সত্য অপেক্ষা চিত্রিত দৃশ্য বলিয়াই মনে হইত। আমাদের এই নির্জন স্থানে জনকোলাহল-ও কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না। আমরা শুধু কীট-পতঙ্গাদির অস্ফুট রব, পক্ষীগণের মধুর কাকলি, অথবা পাতার মধ্য দিয়া সঞ্চারমান বায়ুর মৃদু মর্ম্মরধ্বনি শুনিতে পাইতাম। দৃশ্যটির কিয়দংশ স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত থাকিত, এবং নিম্নের স্থির জলরাশিবক্ষে দর্পণের ন্যায় চন্দ্রের মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হইত। এই অপূর্ব মায়ারাজ্যে আমরা আচার্যদেবের সহিত সাতটি সপ্তাহ দিব্যানন্দে তাঁহার অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বার্তা সমন্বিত অপূর্ব বচনাবলী শ্রবণ করিতে করিতে অতিবাহিত করিয়াছিলাম—তখন আমরা জগৎ-কে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, জগৎ-ও আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছিল।

"এই দিব্য অবসরে আমরা যে উচ্চাঙ্গের গভীর ধর্মানুভূতি লাভ করিতাম তাহা আমাদের কেহই ভুলিতে পারিবে না। স্বামীজী ঐ সময়ে তাঁহার হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া দিতেন।"[১]

সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর আদর্শ প্রচার ও রূপায়ণের জন্য পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যাদের প্রথম দলটি তৈরি করেন। ক্রিস্টিনের সৌভাগ্য, তিনি ঐ দলটির অন্যতমা ছিলেন। বিবেকানন্দের বিশ্ব-বিজয়-ইতিহাসে তাঁর নাম অবশ্যই সেকারণে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জুলাই ক্রিস্টিন ও ফাঙ্কি দুর্গম পথ অতিক্রম করে দুর্যোগময় রাত্রিতে স্বামীজীর পদপ্রান্তে পৌঁছেছিলেন ;—তাঁদের কষ্ট ও শ্রম অসার্থক হয় নি। বিবেকানন্দ-সমীপে পৌঁছেই তাঁরা বলে উঠেছিলেন—"ভগবান যীশু এখন পৃথিবীতে বর্তমান থাকলে যেভাবে আমরা তাঁর কাছে যেতাম এবং উপদেশ ভিক্ষা করতাম, আমরা আপনার কাছে সেভাবেই এসেছি।" বিবেকানন্দ বলেছিলেন "শুধু যদি আমার ভগবান্ খ্রিষ্টের মতো তোমাদের এই মুহূর্তে মুক্ত করে দেবার ক্ষমতা থাকতো।"[২] স্বামীজীর প্রভাব ক্রিস্টিনের জীবনে বেশি পড়েছিল বলে মনে হয়। সহস্রদ্বীপোদ্যানে দীক্ষা দেবার পূর্বে স্বামীজী মানসনেত্রে দেখেছিলেন ক্রিস্টিনের ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ণ চিত্র—ভারতের বেদীতে স্বামীজীর উৎসর্গীকৃত পুষ্প। গুরু অভয়বাণী দিয়েছিলেন, ঐ জীবনেই ক্রিস্টিনের তৃতীয় নেত্র বা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবে। স্বামীজীর দৈবী বাণী শুনতে এক জগতাতীত অসীমরাজ্যে তাঁরা বিচরণ করতেন।

১. বাণী ও রচনা ঃ পঞ্চম খণ্ড ঃ 'দেববাণী'

১. দেববাণী, ১৯শ সং., পৃঃ ২১

ভারতবর্ষের মহীয়সী নারীর মতোই তিনি হয়ে উঠেছিলেন। গুরুও তাঁকে ঐ আদর্শেই গড়তে চেয়েছিলেন। ভারতের আদর্শ নারীসমাজের কথা তুলে ধরতেন ; সীতা, সাবিত্রী, সতী, উমা, পদ্মিনী এঁদের কাহিনী বর্ণনা করতেন এবং শিষ্যার হৃদয়ে ভারতীয় নারীর আদর্শ চিরকালের মতো অঙ্কিত হয়ে উঠতো। এখানেই গুরু শিষ্যার কাছে ভারতের ভাবী নারীশিক্ষার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছিলেন এবং ভারতের অসহায় বিধবাদের শিক্ষাদান করা ও অর্থোপার্জনের দিক থেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার কথাও বারবার বলতেন। শিষ্য ক্রিস্টিন বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বে এক আধুনিক মানুষকে খুঁজে পেলেন। বিবেকানন্দকে তিনি দেখেছেন একজন আস্তিক্যবাদী মানুষ হিসেবে। ভারতবর্ষের কুপ্রথাকে নিন্দা না করে যখন সংশোধনের পথ স্বামীজী দেখাতেন তখন স্বামীজীর ঐ বিশেষ রূপটিই তাঁদের সামনে প্রতিভাত হতো। শিষ্যা আরও প্রত্যক্ষ করেছেন, গুরু একজন নিঃস্ব সন্যাসী কিন্তু আপন স্বরূপকে তিনি কখনও ভুলে যান নি। একটি মুক্ত স্বাধীন আত্মা যেন দেহপিঞ্জরে বদ্ধ থেকে ছটফট করছে। ক্রিস্টিন গুরুর এই মানসিক-অবস্থাকে অনুভব করেছিলেন গভীরভাবে।

গুরু-শিষ্যার সম্পর্কটি ছিল পরমাত্মীয়ের মতো। সুখ-দুঃখের দিনে এই পিতা-কন্যা আপন করে নিজেদের কথা একে অপরের কাছে প্রকাশ করেছেন। হয়তো শান্তি পেতেন তাতে। স্বামীজী এই আমেরিকান শিষ্যাকে যে গভীর স্নেহ করতেন তার তাঁর 'ক্রিস্টিনা'কে লেখা চিঠিগুলি থেকে বোঝা যায়। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল স্বামীজী তাঁর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য পরিভ্রমণের প্রাক্কালে ক্রিস্টিনকে ইংল্যাণ্ডে আসার জন্য যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে শিষ্যার প্রতি গভীর স্নেহের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে—"তোমাকে দেখলে বড় খুশী হবো।"[১] স্বামীজী অত্যাধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলন। শরীরের সেই দুর্বলতা আর কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। অন্ততঃ পূর্ব্বের মতো সুস্বাস্থ্য আর ফিরে পান নি। অসুস্থ শরীরের সেই যন্ত্রণার কথা একমাত্র ক্রিস্টিনকেই স্বামীজী জানিয়েছেন। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ই অক্টোবর প্যারিস থেকে স্বামীজী লিখছেন, "তোমার পরম সুন্দর শান্তিময় চিঠিখানি আমাকে নূতন শক্তি দিয়েছে, যে-শক্তি আমি অনেকসময় হারিয়ে ফেলি।"[২]

গুরু বিবেকানন্দের কাছে শিষ্যা ক্রিস্টিনা কি পেয়েছিলেন? এক কথায় জীবরেন চরম সত্যকে তিনি পেয়েছিলেন গুরুর সান্নিধ্যে ; পেরেছিলেন ভারতচেতনার সঙ্গে একাত্ম হতে ; মানবাত্মার পূর্ণ জাগরণ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। সহস্রদ্বীপোদ্যানেই ক্রিস্টিনা প্রথম শুনলেন, চেতনার সমুদ্রে ডুবে গিয়ে কীভাবে 'সমাধি' লাভ করা যায়। স্বামীজীর শিক্ষাদানের পদ্ধতি তাঁদের খুবই অনুপ্রাণিত করতো। যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কবি-মন মিশিয়ে গভীর দর্শন তিনি প্রকাশ করতেন—একথা ক্রিস্টিন স্মৃতিকথায় বলেছেন। তাঁদের

মনের বিচিত্র প্রশ্নের সমাধান পেয়ে যেতো স্বামীজীর শিক্ষাদানের মধ্য থেকেই। চেতনার উর্দ্ধলোকে রয়েছে সূক্ষ-চেতনার জগৎ। যুক্তি পরম্পরার সঙ্গে সে জগতের কোন বিরোধ নেই, স্বামীজী বলতেন। ক্রিস্টিন এই সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "Remember the Superconscious never Contradicts reason. It trancends it, but contradicts it never."[১] স্বামীজী মনকে নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা দিতেন। ক্রিস্টিন স্বামীজীর নির্দেশ মতই মনকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করতেন। মনকে নিয়ন্ত্রনের মধ্য দিয়েই মুক্ত আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়। স্বামীজী তাঁদের উপদেশ দিতেন, "নাম-সুনাম বিত্ত—সব ত্যাগ কর ; এগুলোই আমাদের বাধাস্বরূপ। তুমি ভাবো—তুমি মুক্ত-মুক্ত ; তুমি অনুভব করবে—তুমি অনন্ত। দেখবে, আত্মা অনন্ত—শুরু ও শেষ বলে তার কিছু নেই।"[২] অতীত ভারতবর্ষের মুনী-ঋষীদের সাধনাও শিক্ষার মধ্য দিয়ে কীভাবে গুরু-শিষ্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও দর্শনের কথা চলে এসেছে, সেসব কথা ক্রিস্টিন শুনে বিস্মিত হতেন। এক অতিজাগতিক আনন্দ তাঁর মনকে সদা-সর্বদা আবৃত করে রাখতো। সহস্রদ্বীপোদ্যানের সেই দিনগুলোই স্বামীজীর কাছে সবথেকে সুসময় ছিল। স্বামীজীর আধ্যাত্মিক জীবনের স্পর্শ ও তাঁর বাণীর অলৌকিক আবেশের মোহজালে ক্রিস্টিনের জীবন বিবেকানন্দময় হয়ে থাকতে পেরেছিলেন। স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যানে সেই যে বলেছিলেন, নিজেকে প্রতারিত করো না। 'মায়া' হচ্ছে সব থেকে বেশি প্রতারক। তা থেকে বেড়িয়ে এসো ; এসময় মায়া যেন তোমাকে পরশ করতে না পারে।"[৩] সত্যিই আজীবন সেই মায়া ত্যাগ করে গুরু-নির্দেশিত পথেই তিনি চলেছিলেন। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে মায়ের মৃত্যুর পর সমস্ত কিছু ত্যাগ করে তিনি বৃহত্তর কর্মে জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন।

তিন

সহস্যদ্বীপোদ্যানে গুরু-সান্নিধ্যের পর পাশ্চাত্যে আর দু'বার স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ক্রিস্টিনার।—স্বামীজীর দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণকালে, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই ; এবং এর পরে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ডেট্রয়েটে। স্বামীজী এই সময় আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন ক্রিস্টিন ভারতে এসে তাঁর আরব্ধ কাজে অংশগ্রহণ করুন। তাঁর শেষের দিকের চিঠিতে ক্রিস্টিনের কাছে বার বার স্বামীজী সেকথা প্রকাশ করেছেন। অবশেষে স্বামীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল কলকাতায় স্বামীজীর কাছে এলেন ;—এসব ঘটনা আমাদের জানা। শুধু একটা দৃশ্য এখানে উপস্থাপিত করা যেতে পারে—তাহলো সেদিনের গুরু-শিষ্যার মিলন-দৃশ্য। মধুর

১. Reminiscences, P.174
২. ঐ P. 174—75
৩. ঐ P. 180

সেই দৃশ্য। শিষ্যার নৌকাটি ঘাটের কাছে আসামাত্র স্বামীজী তাঁর ঘরের জানালা থেকে অভিবাদন জানালেন। ক্রিস্টিনের অন্তরে গভীর আশা প্রথমেই গুরুর শ্রীমুখ দর্শন করবেন। হ্যাঁ, সত্যিই প্রথম দর্শন তাঁর স্বামীজীর সঙ্গেই। কী আকুল আকর্ষণ।

কলকাতায় আসার পর গুরু-শিষ্যার মধ্যে সাক্ষাৎকার অল্প কয়েকদিন হয়েছিল। কলকাতায় প্রচণ্ড গরমে কষ্ট হবে ভেবে গুরু শিষ্যাকে পাঠিয়েছিলেন মায়াবতীতে। আর দেখা হয় নি। ৪ঠা জুলাই ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ—অকস্মাৎ ইন্দ্রপতন। নিবেদিতার চিঠিতে ঐ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ক্রিস্টিনের মনে সৃষ্টি হয়েছিল মহাশূন্যতা। গুরুর জন্যই তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তখন থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে গুরুকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ডিসেম্বরে শ্রীশ্রী সারদাদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে নারী-শিক্ষার জন্য এক বিদ্যালয়ের সূচনা করেছিলেন। স্বামীজীর মানসকন্যা নিবেদিতা নিরলস পরিশ্রম ও কর্তব্যনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানটিকে বহন করে নিয়ে চলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন স্বামীজীর 'ক্রিস্টিনা'। স্বামীজীর আরব্ধ কাজ করতে তিনি বিপুল উদ্যামে কাজ করে চলেছিলেন। নিবেদিতা লিখেছেন, ভগিনী ক্রিস্টিনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সবকিছুই এক পূর্ণাঙ্গ রূপ নিল, কারণ এর পূর্বে বিদ্যালয়টির প্রাথমিক বিভাগই শুধু ছিল। ক্রিস্টিন এসে বিধবা মহিলা ও বালিকা বধূদের সেলাই শিক্ষা দিতে শুরু করলেন এবং ক্রমে ইংরেজি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠেরও ব্যবস্থা করেন। ক্রিস্টিন স্বামীজীর পথ ধরেই তাঁর ছাত্রীদের শিক্ষা দিতেন। পুরাণ ও মহাকাব্যগুলি ছাত্রীদের তিনি পড়াতেন, যাতে তারা ভারতীয় নারীর আদর্শকে উপলব্ধি করতে পারে। বিবেকানন্দ সহস্যদ্বীপোদ্যানে শিষ্য-শিষ্যাদের কাছে যেমন নিয়েছিলেন পিতার স্থান, ক্রিস্টিনাও তেমনি তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কাছে মায়ের ভূমিকা নিয়েছিলেন।

স্বামীজীর কাছে ক্রিস্টিন শিখেছিলেন হিন্দুনারীর পবিত্রতা, সহনশীলতা ও ধর্মবোধের আদর্শ। এসব গুণগুলি তাঁর জীবনচর্যা ও বৃহত্তর কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতো। এমন নিষ্ঠাবতী নারী পাশ্চাত্যজাতির মধ্য থেকে স্বামীজী আবিষ্কার করেছিলেন বৃহত্তর স্বার্থেই ; সমগ্র নারীজাতির কল্যাণের জন্যই। স্বামীজীর সে অভীপ্সা পূর্ণ করেছিলেন ভগিনী ক্রিস্টিন। ১৭নং বোসপাড়া লেনের "হাউস অফ দি সিস্টারস্" তীর্থস্থানে পরিণত করেছিলেন ক্রিস্টিন-নিবেদিতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, ডাক্তার নীলরতন সরকার, দীনেশচন্দ্র সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি তৎকালীন বুদ্ধিজীবী ও মনীষিবৃন্দ তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসতেন। বশী সেন, নন্দলাল বসু প্রমুখ যুবকগণও তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। উদীয়মান বিজ্ঞানী বশী সেন তো ক্রিস্টিনকে তাঁর ৮নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে এনে রেখেছিলেন। পরে তিনি ক্রিস্টিনকে আলমোড়ায় নিয়ে আসেন। ইতিপূর্বে অবশ্য ক্রিস্টিন ১৯১০ এবং ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা গিয়েছিলেন। প্রথমবার কয়েকমাস সেখানে ছিলেন ;

দ্বিতীয়বার অবশ্য দীর্ঘ কয়েকবৎসর (প্রায় দশ বৎসর) আমেরিকায় অতিবাহিত করতে হয়েছিল। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। সেখানে তিনি নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকেন নি। স্বামীজীর আদর্শ-কর্ম রূপায়ণের কাজে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তিনি আমেরিকার ডেট্রয়েটে ও অন্যান্য জায়গায় ভারতের বাণী ও বেদান্তদর্শন প্রচার করে গুরুর আরেকটি স্বপ্ন সফল করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কারণ স্বামীজী চেয়েছিলেন, আমেরিকানরা যেদিন আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করবে সেদিনই যথার্থ কাজ হবে। ব্রহ্মবাদিনী সন্ন্যাসী আমেরিকায় বক্তৃতা করার সময় নিজেকে আচার্য শঙ্কর ব্যাখ্যাত আদি পুরুষরূপে প্রতিপন্ন করতেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে বিমোহিত হতেন শ্রোতৃবৃন্দ। শ্রীমতী গ্রাট্রুড এমারসন (শ্রীমতী বশী সেন) আমেরিকার এক শিল্পীর মুখে শুনেছিলেন ক্রিস্টিনের বক্তৃতার সময় কেমন আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল তৈরি হতো। তিনি বলেছিলেন, বেদান্ত-দর্শন ব্যাখ্যা করার সময় তিনি ভগিনী ক্রিস্টিনের মুখমণ্ডলের চারিপাশে এক নীলাভ জ্যোতি দর্শন করতেন। ক্রিস্টিনের চরিত্রে ও দেহে এই আধ্যাত্মিকভাব একদিনে অর্জিত হয় নি। স্বামীজীর জীবন ও আদর্শ-কে গভীরভাবে তিনি দিনের পর দিন অনুসরণ ও অনুশীলন করে আধ্যাত্মিক সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন, আধ্যাত্মিক নারীরূপে বিরাজ করতে পেরেছিলেন। আমরা শ্রীমতী বশী সেনের প্রবুদ্ধভারতে প্রকাশিত 'As I knew Her' প্রবন্ধে এবং মিসেস্ অ্যাকশা বার্লো ক্রষ্টারের স্মৃতিসঞ্চয়ন এবং বশী সেনের স্মৃতিকথায় ক্রিস্টিনের ভারতবর্ষের প্রয়োজনে নিবেদিত-জীবন, তাঁর আলমোড়ার জীবন-বৃত্তান্ত, তাঁর ভাগবতী সত্তা, বিবেকানন্দপদে অর্পিত জীবনের অন্তরঙ্গ সাধনার কথা, তাঁর জাগতিক দুঃখ-কষ্ট অভাব-অনটনের কথা বিধৃত রয়েছে। আমরা তাঁদের স্মৃতিসঞ্চয়ণ থেকে কিছু কিছু চয়ন করছি যার মধ্যে ভারত-প্রাণা ক্রিস্টিনের অন্তর ও বাহিরের রূপ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

বশীসেন স্মৃতি কথায় লিখেছেন ঃ তাঁর স্বচ্ছ তন্বীদেহে এক স্বর্গীয় আভিজাত্যের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ছিল। তাঁর চিক্কণ-সুগঠিত মাথাটি, ঈষৎ বক্র নাসিকা, কম্পমান নাসরন্ধ্র সবকিছুর মধ্যেই আভিজাত্যের পূর্ণপ্রকাশ। মুখের রঙ ও গঠনে মাধুর্য ও বিষাদের এক অপূর্ব মিলন। পরের দুঃখে গভীরভাবে অভিভূত হতেন তিনি। ভারত ও ভারতবাসীকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। কারণ ভারত ছিল তাঁর প্রিয় গুরুর দেশমাতৃকা—তাই পূণ্যভূমি। তাঁকে দেখে মনে হত ভারতে থাকতে পারায় ও ভারতের কাজে নিজেকে নিবেদন করতে পারায় তিনি যেন এক পরম সৌভাগ্যের অধিকারী।"[১]

মিসেস্ অ্যাকশা বার্লো ক্রষ্টার ও তাঁর স্বামী—এই শিল্পী দম্পতি প্রাচ্য অনুরাগী ছিলেন। ক্রিস্টিনের সঙ্গে তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনার সম্পর্কে শ্রীমতী অ্যাকশা লিখেছেন, (সাক্ষাৎকারটি ঘটেছিল ৮নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে)—ক্রিস্টিন অতি স্নেহের সঙ্গে

তাঁদের গ্রহণ করেছিলেন। ক্রিস্টিনের মুখের কথাতেই তাঁর চরিত্রের ঐশ্বরিক ভাব, পবিত্রতা ও মাধুর্য প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিটি অঙ্গ সেই ভাবই ব্যক্ত করেছিল। মুখের প্রতিটি রেখা, নাসিকা, নাসারন্ধ্র দেখে মনে হয়েছিল যেন রাজপুত ছবিতে সীতার মূর্তি। চোখদুটি যেন প্রাচ্যের সন্ন্যাসিনীর। সে চোখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল অন্তরের আলো। বিবেকানন্দের-চেতনা নিয়ে কীভাবে জীবনটি কী পবিত্রভাবে কাটিয়েছিলেন তার পরিচয় পাচ্ছি মিসেস অ্যাকশার-এর স্মৃতিসঞ্চয়ণে। লিখেছেন,—

"আলমোড়ার বারন্দায় বসে যখন তিনি নিজ গুরু বিবেকানন্দের কথা বলতেন, তখন মনে হত অমন কণ্ঠস্বর কখনও শুনিনি। আবেগে স্বরের ওঠানামা, সেই সঙ্গীতময়তা কারো কণ্ঠে কখনও শুনিনি, সবটাই পরিপূর্ণ সঙ্গীত। বিবেকানন্দের নাম ওঁর মুখে উচ্চারণ হওয়া মাত্র যেন ঈশ্বরের উপস্থিতি সকলে অনুভব করত। মনে হত আমরাও যেন তাঁকে দেখেছি এবং চিনেছি।"[১]

"বিবেকানন্দ অবতার ছিলেন ; আমি বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বরকে আমি দেহধারীরূপে দেখেছি"[২]—একথা যখন ক্রিস্টিন বলতেন তখন রোমাঞ্চ সৃষ্টি হতো।

রবীন্দ্রনাথ রোমাঁ রোলাঁকে বলেছিলেন, যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও তবে বিবেকানন্দকে জানো। ("If you want to know India, Study Vivekananda. In him everything is positive and nothing negative.")। রোমাঁ রোলাঁ বিবেকানন্দ-সাহিত্য পড়ে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক স্বরূপকে উপলব্ধি করেছিলেন। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ তখনও তাঁর মনে সম্ভবত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, কিন্তু তাঁর মনে ছিল বিবেকানন্দকে জানার তীব্রতম আকূতি। সুতরাং দ্বারস্থ হতে চাইলেন বিবেকানন্দ-প্রাণা ক্রিস্টিনের সঙ্গে। কারণ রোলাঁ জেনেছিলেন ক্রিস্টিনের জীবন বিবেকানন্দের অন্তরঙ্গ সাহচর্যে ধন্য। বিবেক-কন্যা ক্রিস্টিনের কাছে আসার জন্য এবং তাঁর অন্তরঙ্গ উপলব্ধির কথা শোনার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে জুন 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র সম্পাদককে যে চিঠি লিখেছেন, তাতে ক্রিস্টিন ও বিবেকানন্দ জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে। লিখেছেন, "আমার ও আমার ভগ্নীর ইচ্ছা আমরা সিস্টার ক্রিস্টিনের সঙ্গলাভ করি—যাঁর কথা আমরা লোকের মুখে ভক্তি ও ভালবাসার সঙ্গে শুনতে পাই। বিবেকানন্দের সঙ্গে মেশবার সুযোগ তিনি যেমন পেয়েছেন, এমন খুব কম লোকেরই সৌভাগ্য হয়েছে। আমরা তাঁর সঙ্গে পত্রের আদান-প্রদান করতে পারলে সুখী হবো, যদি একদিন তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়।"[১]—রোমাঁ রোলাঁ ক্রিস্টিনের জীবন-সাহচার্যের মধ্য দিয়েই বিবেকানন্দকে অনুভব করতে চেয়েছিলেন—এ কথা যেমন ঐ চিঠিতে প্রমাণিত হয়, অপরদিকে ক্রিস্টিনা যে কী গভীর বিবেকানন্দ-প্রাণা ছিলেন—সে সত্যও প্রকাশ পেয়েছে।

১. ঐ ১৬ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা পৃঃ ৩৯
২. ঐ, ১৬ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা পৃঃ ৪২
১. উদ্বোধন, ৩০ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৯৩৫, পৃঃ ৩৪৯

ক্রিস্টিনের জীবনে স্বামীজীর প্রভাবের ব্যাপারটি লক্ষ করা যাচ্ছে তাঁর স্মৃতিকথায়। আলমোড়ায় থাকাকালীন ক্রিস্টিনকে বলা হয়েছিল তাঁর উপলব্ধির কথা লিখে রাখার প্রয়োজন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমার উপর কীভাবে যে স্বামীজীর প্রভাব হত! নিবেদিতা বরং নোটখাতা নিয়ে বসত, আমি উপলব্ধি করতাম, উনি প্রথম পংক্তি বলার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার জগৎ থেকে অন্য জগতে চলে যেতাম, ব্যক্ত করার চেষ্টা থেকে উপলব্ধি করার দিকে মন দিতাম।" বলতেন, "সকলে কত প্রশ্ন করত, কিছু পাবার চেষ্টা করত ; কিন্তু আমার বড় দুঃখ হত তাঁর জন্য।........ঐ রকম জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বের সামনে সব সন্দেহ, সব প্রশ্নের আপনিই নিরসন ও নিবৃত্তি হয়ে যায়।"[১]

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে ক্রিস্টিন প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লেন। স্বামীজীর ভারতবর্ষ, তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষে আসার ইচ্ছা তখনও ক্রিস্টিনের মনে। আসা আর হয় নি। ক্রমশ গভীর অসুখের যন্ত্রণার মাঝে স্বামীজীর ইচ্ছার কাছে পূর্ণ সমর্পণ করলেন নিজেকে। অসুস্থ অবস্থায় বিবেকানন্দের রক্তিম পদচিহ্ন বুকে নিয়ে শুয়ে থাকতেন। অবশেষে শেষের সেদিন ঘনিয়ে এল,—১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে মার্চে আমরা হারালাম মাতৃসমা ক্রিস্টিনাকে। কিন্তু দেহের বিনাশেই তাঁর মৃত্যু ঘটেনি ; তিনি যে 'মৃত্যুহীন প্রাণ' নিয়েই এ পৃথিবীতে এসেছিলেন।

১৯০২ থেকে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিগুলি থেকে ক্রিস্টিনের জীবনদর্শন উপলব্ধি করা যেতে পারে। তিনি ছিলেন শান্ত, সুমিষ্ট, নির্বিরোধী ও গুরু নির্দিষ্ট কর্মে সমর্পিত-প্রাণা। তাঁর ধারণা ছিল, ধর্মস্থাপকতা অপেক্ষা মানবিকতার পরকাষ্ঠা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। 'ক্রিস্টিনা'র মনের গভীরে ছিল যন্ত্রণা ; স্বামীজী তা জানতেন। সেকারণে তিনি প্রিয় শিষ্যাকে নানা সময় নানা উপদেশ দিয়েছেন। দুঃখ যন্ত্রণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করায় যে মানবজীবনের চরম পথ, সেকথা তিনি ক্রিস্টিনাকে কবিতা উপহার দিয়ে জানিয়েছেন। দুঃখ-যন্ত্রণার বিপরীত দিকেই আছে নিরবিল আনন্দসাগর। অন্ধকারে পথ অতিক্রম করার পরই তো আলো মেলে। অস্তিত্ববাদী গুরুর মুখে কখনও আশাভঙ্গের কাহিনী শোনেন নি ; সব কিছুই 'Positive' হয়ে উঠেছে তাঁর দৃষ্টিতে—

> I look behind and after
> And find that all is right
> In my deepest sorrows
> There is a soul of light.[২]

---

১. অমৃত, ১৬ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, পৃঃ ৩০

২. বাণী ও রচনায় কবিতাটি মিস ম্যাকলাউডকে স্বামীজী লিখেছিলেন—এরকম বলা হয়েছে। কিন্তু 'The Complete works of Swami Vivekananda' (Subsidized edition)—Volume VIII—তে মিস ক্রিস্টিনকে স্বামীজী দিয়েছিলেন একথা লেখা আছে। আমরা Subridized edition টিই গ্রহণ করলাম। 'Light' কবিতাটি বিশদভাবে আলোচনা করেছি 'স্বামীজীর ইংরেজী ভাষায় রচনা ও ভারতচেতনা' প্রবন্ধে।

আর একটি কবিতা উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। কবিতাটি ক্রিস্টিনাকে লেখা। কবিতাটি ক্রিস্টিনের কাছে ছিল মন্ত্রস্বরূপত্র। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারি স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্যাকে এ কবিতাটি লিখেছিলেন। পরার্থে নিবেদিতা-প্রাণ এই নারীর যথোচিত বর্ণনা এ কবিতায় ঃ—

"তুষার কঠিন মাটিই না হয়
হোক না তোমার শয্যা,
আবরণ তব শীতার্ত ঝঞ্ঝার
জীবনের পথে নাই বা জুটিল বন্ধুজনার হর্ষ,
ব্যর্থ তোমার সৌরভ বিস্তার ;

তবু প্রশান্ত বিকশিত থাক, পবিত্র মধুময়—
থাক অবিচল আপনার মহিমায়—,
দাও, ঢেলে দাও স্নিগ্ধ উদার মধু, সৌরভ তব
চির-প্রসন্ন অযাচিত করুণায়।"[১]

স্বামী বিবেকানন্দের অপার্থিব স্নেহ স্বর্গীয় সুষমায় ভরিয়ে দিয়েছিল গুরুপদে নিবেদিতা ক্রিস্টিনের জীবন।

পাশ্চাত্য জীবন ও মনোভূমিতে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতচেতনার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব

'এত আলো জ্বালিয়েছো'

ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে ঐতিহাসিক বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেসবের মধ্যে ভারতবর্ষের শ্বাশত প্রজ্ঞা-ই উৎসারিত হয়েছিল, যা পাশ্চাত্যের মানুষকে শুধু সেকালেই নয়, আজ-ও প্রবলভাবে আকর্ষণ ও প্রভাবিত করে চলেছে। নিবেদতা যথার্থ-ই বলেছেন ঃ "ভারতের ধর্মচেতনাই তাঁহার মধ্য দিয়া বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছিল—ভারতের সমগ্র অতীতের দ্বারা সুনির্দিষ্ট তাঁহার দেশের সকল মানুষের বাণী।....নবীনতম ঋষিকণ্ঠে সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল ভারতের প্রচীনতম অথচ চিরন্তন সত্যের বাণী।"[১]

বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় কথিত কিস্টোফার ইশারউডের একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাক—"তোমরা ভারতীয়রা যতখানি বিবেকানন্দকে ভারতীয় মনে কর, আমরা তাঁকে ততখানিই পাশ্চাত্যের মনে করি।" শুধুমাত্র ঈশারউড নন, সেদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ যাঁরা স্বামীজীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, বা তাঁর বাণী শুনেছিলেন, তাঁরাও জীবনের ধ্রুবতারা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন বেদান্তের সেই "মধুরতম আশ্বাস পূর্ণ" বাণী—"শোন অমৃতের সন্তানগণ, দিব্যধামবাসিগণ, তোমরাও শোন! আমি সেই মহানপুরুষের দর্শনলাভ করেছি—যিনি সকল অন্ধকারের পারে, সকল অজ্ঞানের উর্দ্ধে বিরাজ করছেন। তাঁকে জেনে তোমরাও মৃত্যুকে অতিক্রম করবে।"[২]

বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠে বিঘোষিত এই 'সত্যবাণী' প্রচণ্ডভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল শ্রোতাদের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই অনুভব করেছিলেন, তিনি 'প্রেরণাদৃপ্ত বক্তা—কোন গ্রন্থ থেকে বলছেন না, যদিও গ্রন্থসমূহ তাঁর ভালভাবেই আয়ত্তে ছিল। তিনি বলেছিলেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা।"[৩] এই ধরনের মন্তব্য করেছেন রাশিয়ার প্রতিনিধি প্রিন্স ওলকোনস্কি, পরবর্তীকালে দার্শনিকরূপে খ্যাত আর্নেস্ট হকিং এবং বিশিষ্ট কবি হ্যারিয়েট

---

১. 'বাণী ও বচন' ১ম খণ্ড, ভূমিকা

২. 'বাণী ও রচনা' ১ম খণ্ড, ভূমিকা

৩. নিউ ডিসকভারিজ'-মেরি লুইস বার্ক, প্রথম খণ্ড—বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী ও সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া।

মনরো ও সংবাদিক লুসি মনরো। ধর্মমহাসভা চলাকালে একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে লুসি মনরো লিখেছেন ঃ "ইনি বিধিদত্ত দিব্য অধিকারে বাগ্মী।" উইলিয়ম আর্নেষ্ট হকিং, তিনি তখন দর্শনের ছাত্র, হাবার্ট স্পেন্সারের অনুরাগী, বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্বের চর্চায় নিমগ্ন। অনেক পরে স্মৃতিচারণে তিনি লিখেছেন, ধর্মমহাসভার অগণিত শ্রোতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। 'হিন্দুধর্ম' প্রসঙ্গে আলোচনকালে বিবেকানন্দ যখন বললেন, 'মানষকে পাপী বলাই মহাপাপ' তখন সমস্ত সভা যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। এরকম অপূর্ব কথা তাঁরা কখনো শোনেন নি। বিবেকানন্দ আরও বলেছিলেন ঃ 'সত্য এক, শ্বাশত, অদ্বৈত। প্রতি মানুষে সেই দিব্যসত্তা ব্রহ্মাই আছেন।"—বিবেকানন্দের এই বাণী তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফল এবং তা বিশ্ববীক্ষার শেষকথা। একে স্বীকৃতি দিতেই হবে। কোন মতে একে অবহেলা করা যাবে না—এসব কথা হকিং অনুভব করেছিলেন। তাঁর অভিমত, বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্ব বিবেকানন্দের এসব কথা মানাতে রাজি হবে না। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, দার্শনিক হকিং-এর মনোজগত কী গভীর ভাবেই না প্রভাবিত হয়েছিল। শুধু হকিং বা মনরো নয়, আমেরিকার সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষভাবে নারীরা স্বামীজীর মুখনিঃসৃত ভারতচেতনা-সম্পৃক্ত বাণীর মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলো। তাঁরা বিবেকানন্দের মধ্যে প্রাচীন প্রাজ্ঞ বৈদান্তিক ঋষিকেই খুঁজে পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে মেরি লুইস বার্ক লিখেছেন ঃ

"বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে এত বিরাট যে, যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে আসত, তারা পরিবর্তিত না হয়ে পারত না। বিশ্বচিন্তার জগতকে নতুন করে আলোকিত করেছেন তিনি।" (নিউ ডিসকভারিজ) আমেরিকার বিখ্যাত মহিলা কবি হ্যারিয়েট মনরো বিবেকানন্দের আকর্ষণীয় দেবতুল্য ব্যক্তিত্ব ও বাণীর সৌন্দর্যে শুধু আকৃষ্ট হননি ; তিনি লিখেছেন, আমেরিকার যেখানেই স্বামীজীর পাদস্পর্শ ঘটেছে, সেখানকার মানুষ তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও স্বর্গীয় ভাষণে আপ্লুত হয়েছে। মনরো সেই সময়কার জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেছেন তার অনন্য উচ্চারণে ঃ

সুমহিম বিবেকানন্দই ধর্মসভাকে গ্রাস করিয়াছিলেন, গোটা শহরটাকেই আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। অন্যান্য বিদেশিরা ভালই বলিয়াছিলেন...কিন্তু কমলাবস্ত্র-ভূষিত সুদর্শন সন্ন্যাসীই নিখুঁত ইংরেজিতে আমাদের সর্বোত্তম বস্তু ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রচণ্ড ও আকর্ষণীয় ; তাঁহার কণ্ঠস্বর ব্রোঞ্জের ঘণ্টাধ্বনিরই মতো গম্ভীর ও মধুর ; তাঁহার সংযত আবেগের অন্তর্লীন প্রবলতা, প্রতীচ্য জগতের সামনে প্রথম উচ্চারিত ও আবির্ভূত তাঁহার বাণীর সৌন্দর্য—এই সমস্ত কিছু মিশ্রিত হইয়া চরম অনুভূতির একটি নিখুঁত বিরল মুহূর্ত আমাদের জন্য আনিয়াছিল। মানব-ভাষণের এই ছিল চরম উৎকর্ষ।"[২]

১. নিউ ডিসকভারিজ'-মেরি লুইস বার্ক, প্রথম খণ্ড—বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী ও-সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া।

২. যুগনায়ক বিবেকানন্দ (২য় খণ্ড)—স্বামীগম্ভীরানন্দ, পৃঃ ৪৩—৪৪

শুধু আমেরিকা নয়, ইউরোপ, জাপান—স্বামীজী যেখানেই গিয়েছেন, সেখানকার মানুষ তাঁকে দৈবী পুরুষ হিসেবেই মান্য করেছেন। নিবেদিতাকে জামসেদজী টাটা বলেছিলেন ঃ "স্বামীজী যখন জাপানে ছিলেন তখন যে-কেউ তাঁকে দেখেছে তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে বুদ্ধের সাদৃশ্য দেখে চমকিত হয়ে উঠেছে।"[১] আমরা বর্তমান আলোচনায় স্বামীজীর সঙ্গে প্রতীচ্যের যাঁরা গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের কথা বলার চেষ্টা করবো। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র প্রভাবেই ভারতবর্ষ বিশ্বমনে এক শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করলো। ম্যাক্স্‌মূলার থেকে টলস্টয়, উইলিয়াম জেমসের মতো সমকালীন শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় ও আমেরিকান মনীষিগণ কর্তৃক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মনীষা উচ্চ প্রশংসিত হলো। বিবেকানন্দের অপূর্ব আকর্ষণে তাঁর বিদেশি ও বিদেশিনী ভক্তগণ ভারতবর্ষে, ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতচেতনা তথা ভারতভাবগরিমার প্রচারে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেবামূলক মানবধর্মের সম্প্রসারণে আত্মনিয়োগ করলেন। বিশ্বের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, যুগকে যাঁরা নির্মাণ করেন তাঁরা যেন তাঁদের প্রিয় সহচর-সহচরীদের সঙ্গে নিয়েই পৃথিবীতে আসেন। বিবেকানন্দ নামক মহৎ- প্রাচ্যসূর্যটিকে ঘিরে যাঁরা আবর্তন করেছিলেন—সেভিয়ার-দম্পতি, গুডউইন, মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল, মিস মাককলাউড, মিসেস ওলি বুল, কৃস্টিন, হেল-পরিবার, রাইট-পরিবার, ম্যাকলাউড প্রমুখ কতশত মানুষ। এঁরা কী শুধুই বিবেকানন্দের বৌদ্ধিক দিকটির প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন? না, তা নয়। আমেরিকার মননভূমিকে সিঞ্চিত করেছিলেন তিনি তাঁর জীবন্ত অধ্যাত্মিকতা-মণ্ডিত ব্যক্তিত্ব দিয়ে। আমেরিকার মানুষ তাঁর দৈবীশক্তি-সম্পন্না ব্যক্তিত্বের আলোকে আলোকিত হয়েছিলেন। তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের হৃদয়ের দীপশিখা। স্বামীজীর অগ্নিময় সত্যের উচ্চারণে পাশ্চাত্যের মানুষের সমস্ত সংশয় নির্বাপিত হয়েছিল। টলস্টয় 'রাজযোগ' পড়ে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন, মানবপ্রজ্ঞার চূড়ান্ত নিদর্শন 'রাজযোগ'। বিবেকানন্দের প্রতিভায় চমৎকৃত হয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁকে প্রাচ্যদর্শনের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি অবশ্য তা প্রত্যাক্ষান করেছেন। তিনি অমেরিকার বুদ্ধিজীবী ও ধর্মসুপ্রীত পরিমণ্ডলে যে প্রবল অভিঘাত ও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সে সম্বন্ধে বলতে গেলে অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস তাঁর 'Pragmatism' গ্রন্থে স্বামীজী সম্পর্কে যা বলেছেন তার উল্লেখ করতে হয়। অধ্যাপক জেমস বলেছেন ঃ "বিবেকানন্দের মধ্যে ঘটেছে অধ্যাত্মবাদ বা মরমিয়াবাদের মহত্তম ও সুন্দরতম বিকাশ। প্রাচ্য বেদান্তদর্শনই সকল মিষ্টিসিজমের মধ্যে সেরা এবং সেই সেরা পথের যাত্রী যাঁরা তাঁদের চূড়ামণি হলেন

১. সমকালীন ভাতবর্ষ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৪০

বস্তুত ভারতচেতনার স্থূল সুর-ই হলো মানুষের চেতনার অন্দরমহলে আলোর বিকরণ করা, যে কাজটি করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সমাজতত্ত্ববিদদের ভাষায় ভারতবর্ষের "essential element is, and long has been, extremely unhomogeneous. In India, Indonesia, China, Oceania, Europe and the middle East, cultural disversity has been for centuries both especially great and especially complex. The edge of everything classical, it has been itself Shame-lessly eclectic."[১]

এই গ্রন্থের লেখক ভারতীয় জীবন-বেদের অন্তর্নিহিত মাধুর্য কোথায় তা উপলব্ধি করেছেন। তিনি আবিষ্কার করেছেন যে, ভারতবর্ষের জীবনসাধনার মূল লক্ষ্যই হলো এই পৃথিবীর জন্য আলো জ্বালাতে পারা। এ কাজের জন্যে বিবেকানন্দই আমাদের শক্তি ও সাহস জুগিয়েছেন। লেখকের এ বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। জোসিফিন ম্যাকলাউডের উপলব্ধি-ও এর সাক্ষ্য বহন করে। তিনি স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন ঃ "On The twenty-ninth of January 1895, I went with my sister to 54 West 33rd Street, New York and heard the Swami Vivekananda in his sitting room...The room was crowded...He said something, the particular words of which I do not remember, but instantly to me that was truth and the second sentence, he spoke was truth and the third sentence was truth. And I listened to him for seven years and whatever he uttered was to me truth. From that moment life had a different impart. It was as if he made you realize that you were in eternity."[২]

জেসেফিন স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম দিনের সাক্ষাৎ-এর অভিজ্ঞতা চিরকাল একইভাবে বহন করেছিলেন। স্বামীজী তাঁর কাছে সত্যের জ্বলন্ত প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছু ছিলেন না। সেদিন থেকে তাঁর জীবনের অর্থ বদলে গিয়েছিল। লিখেছেন, "সেদিন থেকে জীবনের অর্থ বদলে গিয়েছিল। তাঁর কাছে থাকলে যেন অনন্তের উপলব্ধি হতো।" স্বামীজীর শক্তি ম্যাকলাউডের মতো আমেরিকার বহু নারীকে মুগ্ধ করেছিল।

শুরু করা যাক ধর্মমহাসম্মেলনের আগের ঘটনা দিয়ে। আমিরকায় শিকাগো যাওয়ার পথে (ভ্যাঙ্কুভার থেকে শিকাগোর পথে) ট্রেনে স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ মিস স্যানবর্ণের। স্যানবর্ণ ছিলেন মধ্যবয়স্কা এক আমেরিকান বিদুষী মহিলা। পেশায় অধ্যাপিকা ও সুলেখিকা। এই মহিলারই ম্যাসাচুসেটসের মেটকাফ-এ 'ব্রীজি মেডোজ' নামে খামারবাড়িতে স্বামীজী ধর্মমহাসভার আগে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। ওখানে থাকার সূত্রেই স্বামীজীর

১. The Interpretation of cultures—Clifford Greetz, Fontana Press, 1917, P—224.

২. 'Reminiscences', P—233

পরিচয় হয় অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের সঙ্গে এবং তাঁর সুপারিশেই স্বামীজী ধর্মমহাসম্মেলনে প্রতিনিধির আসন লাভ করেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে মিস স্যানবর্ণ নিজের অজ্ঞাতেই হয়েছিলেন দেবকর্ম সাধনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রবুদ্ধপ্রাণা এ সম্পর্কে যথার্থই লিখেছেন ঃ এখন মনে হয়, কেট স্যানবর্ণের জন্ম হয়েছিল দুটো কারণে—লেখিকা হবার জন্যে এবং আমেরিকায় স্বামীজীর 'মিশন'-এর দ্বার উন্মুক্ত করে দেবার জন্য।"[১]

বিবেকানন্দ স্যানবর্ণের কাছে ছিলেন 'শিক্ষা, আলোক এবং ঈশ্বরের বাণী।' ভারতচেতনায় 'মা' শব্দটির গুরুত্ব যে কত গভীর—স্বামীজীর কাছে স্যানবর্ণ তা শিখেছিলেন। স্বামীজীর আর একটা কথা তাঁর হৃদয়জুড়ে জায়গা করে নিয়েছিল, তা হলো, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহাঅনন্ত দিয়ে গঠিত এক শক্তি। স্বামীজীকে তিনি সন্তান হিসাবেই অনুভব করেছিলেন।—"বিদায়কালে তিনি আমাকে 'মা' বলে সম্বোধন করলেন ; আর আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, এই 'মা' বলে সম্বোধন ভারতীয় মহিলাদের কাছে এক বিশেষ সম্মান। আমি তাঁর এই সম্মানের তাৎপর্য অনুভব করলাম। এইরকম পুত্র পেয়ে আমি সত্যিই গর্বিতা।"[২] স্যানবর্ণ সর্বপ্রথম আমেরিকার নর-নারীদের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় ঘটিয়েছিলেন। এঁদের সামনে স্বামীজী তাঁর ধর্মমত, দর্শন ও আমেরিকায় আগমনের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন।

অধ্যাপক রাইট মানসিকভাবে যে কত স্বামীজীর কাছের মানুষ ছিলেন, সেকথা আজ সুবিদিত। এমনকী তাঁর সহধর্মিনী মেরি টাপ্পন রাইট-ও স্বামীজীর দৈবী-সত্তায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন গভীরভাবে। তাঁর মা-কে লিখেছেন ঃ 'আশ্চর্য সরল ও নিষ্কলঙ্ক মানুষ ইনি। নিজের জন্য তাঁর কোন দাবি নেই।...সারা শহরে তাঁকে দেখার জন্য কী তীব্র আবেগ।...উনি আশ্চর্যরকম বুদ্ধিমান—যুক্তি ও চিন্তাধারাকে উপস্থাপন করেন অত্যন্ত সাবলীল ও স্পষ্টভাবে। তুমি তাঁকে কখনো ভুল প্রমাণ করতে পারবে বা ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।"[৩]

স্যার হিরাম স্টিভেন্স ম্যাক্সিম ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রতীভাদীপ্ত এই ইঞ্জিনিয়ার, বন্দুক আবিষ্কর্তা, ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের দৈবীসত্তার প্রকাশ সম্পর্কে কুড়ি বছর পরে লিখেছেন ঃ " তাঁর প্রথম ভাষণটি ঐশ্বরিক উন্মোচন ভিন্ন আর কিছু নয়। রিপোর্টররা তার প্রতিটি শব্দ আগ্রহের সঙ্গে লিখে নিল, সেগুলি দেশের সর্বত্র টেলিগ্রামে পরিণত হলো, হাজার হাজার কাগজে তা মুদ্রিত হলো। বিবেকানন্দ সেদিনের সিংহে (Lion of the day) পরিণত হলেন। শীঘ্রই তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বিপুল হয়ে দাঁড়াল। তাঁর বক্তৃতাকালে এত শ্রোতার সমাগম হতো যে, কোন হলঘরেই জায়গা হতো না...যিনি সারা দেশের তাবৎ যাজক আর মিশনারীদের চেয়ে দর্শন ও ধর্ম অনেক ভালে ভালো

জানেন...।" এরপরেই ম্যাক্সিম ভয়ংকর একটি কথা বলেন—'বেড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করে তেমনি বিবা কানন্দ পাদরীদের নিয়ে খেলা করলেন। মিশনারিরা ভয়ানক আতঙ্কবোধ করল।...তাঁকে নিন্দা করলো শয়তানের চর বলে (বিবেকানন্দকে)। কিন্তু কাজের কাজ সমাধা হয়ে গেল, বীজ উপ্ত হলো, আমেরিকা চিন্তা করতে শুরু করলো।"[১]

মারউইন মেরি স্নেল—ধর্মমহাসভার বিজ্ঞান শাখার সভাপতি-ও স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে ও দৈবীসত্তায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আমেরিকায় ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজীর উপস্থিতি ও তাঁর ভাষণ সম্পর্কে কোন কোন মহল থেকে বেসুরো আওয়াজ শোনা গিয়েছিল—কিন্তু তা যে কত মিথ্যা বা অপপ্রচার সে সম্পর্কে অধ্যাপক স্নেল একটি পত্রপ্রবন্ধ লিখেছিলেন যেটি ভারতীয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকা 'পায়োনীয়ার'-এ ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮মার্চ প্রকাশিত হয়েছিলো। স্বামী বিবেকানন্দ কী শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে আমেরিকায় গৃহীত হয়েছিলেন, কী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তার অনাবিল স্বীকৃতি রয়েছে ঐ পত্র-প্রবন্ধে। অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনে শ্রোতারা আনন্দ পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন স্বামী বিবেকোনন্দ। অধ্যাপক স্নেলের ভাষায়—"সিংহল এবং জাপান থেকে আগত বহুসংখ্যক বৌদ্ধ প্রতিনিধি ধর্মমহাসভায় খুবই বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁরা অনেক প্রবন্ধ পড়েছেন,...তাতে শত শত লোক প্রতিদিন আকৃষ্ট হয়ে যোগদান করেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বলতে হবে, হিন্দুধর্মের মতো আর কোন ধর্মই ধর্মমহাসভায় এবং আমেরিকার জনগণের ওপর অনুরূপ বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।..কিন্তু যে কোন হিসাবে, হিন্দুধর্মের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ এবং 'নিজস্ব' প্রতিনিধি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি, কোন সন্দেহ নেই, ধর্মমহাসভার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।...তিনি যেখানেই যেতেন, লোকে দলবেঁধে ধাওয়া করতো এবং তাঁর মুখোচ্চারিত প্রতিটি শব্দের জন্য হাঁ করে অপেক্ষা করতো।[১] ইংলাণ্ডের বিখ্যাত ধর্মযাজক এইচ. আর. হাউইস-এর লণ্ডনের 'ডেইলি ক্রনিকাল' এবং 'লণ্ডন ওয়্যান্স হেরাল্ড'-এ ২৬ অক্টোবর ১৮৯৩ তারিখে লিখেছেন—"আমি মনে করি, ধর্মমহাসভায় সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের অন্যতম ছিলেন বিবেকানন্দ।"[২]

শ্রী রামকৃষ্ণের ওপিঠ বিবেকানন্দকে অবতাররূপেই দেখেছিল পশ্চিমী ভক্তমণ্ডলী। এঁদের একজন ক্যালিফোর্নিয়ার ডাঃ মিলবার্ন হিল লোগান। তিনি যেমন ছিলেন বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু, তেমনই অধ্যাত্মপিপাসু।

তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে, স্ত্রী এবং ভগিনীর বিরোধিতা সত্ত্বেও বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরুভাই অভেদানন্দ, তুরীয়ানন্দ এবং ত্রিগুণাতীতানন্দকে আতিথ্য দিয়েছিলেন। স্বামীজীর

১. 'সমকালীন' ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪
২. 'সমকালীন' ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৯—১২১
৩. 'New Discoveries', Pt. 1, P. 109

প্রতি তিনি এত আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, পারিবারিক বিরূপতা অগ্রাহ্য করে ঐ বাড়িতেই তিনি বেদান্ত সোসাইটির সদরদপ্তর বসিয়েছিলেন। ডাঃ লোগানের জীবনে স্বামীজীর প্রভাব কী গভীর ক্রিয়াশীল ছিল, স্বামী অভেদানন্দজীকে লেখা একটিপত্রে তার স্বীকৃতি মেলে। তিনি লিখেছেন ঃ

'স্বামীজী চলে যাবার পর বিষাদের মুহূর্তগুলি ছেয়ে ফেলল। মনে হত, সব দেবতাই আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন। কেননা তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই তাঁর দিব্য উপস্থিতি ছড়িয়ে দিত শান্তি ও প্রশান্তি ; তাঁর যাদুময় কণ্ঠস্বরে আমার আত্মা অনিশ্চয়তার আলোড়ন থেকে সরে আসত।...যাঁরা তাঁকে জানত তারাই তাকে ভালবাসত। যারা তাঁকে জীবন্ত সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেছে তারা একদিন উপলব্ধি করবে দিব্য অদ্বৈতের খাঁটি অবতারকেই তারা দেখেছে।

আমার কাছে তিনি খ্রিস্ট। তাঁর চেয়ে মহত্তর কোন অবতার জগতে আসেন নি। His mighty spirit was as free and liberal as the great Sun, or the air of heaven' শুধু লোগান নন, যাঁরাই তাঁর ক্লাসগুলিতে হাজির থাকতেন কিম্বা তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন তাঁদের হৃদয় ও মনে বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত সত্যের নিবিড় অনুভূতি হত। স্বামীজী শুধু 'দিব্য-অধিকারের বাগ্মী ছিলেন না, তাঁর বাক্য, স্পর্শ, এমনকি চাহনিতেও মানুষের মধ্যে আত্মানুভূতি জেগে উঠতো।

'আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়া আর সূর্যকে তার কিরণদানের অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা একই কথা'—স্বামী বিবেকানন্দের মনন ও প্রতিভার উৎকর্ষতা সম্পর্কে এহেন মন্তব্য করেছিলেন ডাঃ জন হেনরি রাইট, যিনি ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক ও ডিন, যাঁকে Dictionary of American Biography তে বলা হয়েছে 'encyclopaedia' (জ্ঞানকোষ সদৃশ)। যথার্থ জহুরীর দৃষ্টিতেই তিনি অসাধারণ প্রাচ্য-প্রজ্ঞা-স্বরূপ রত্নটিকে চিনেছিলেন। কেট স্যানবর্ণের মাধ্যমেই স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামীজীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ড. রাইটের ভূমিকার কথা বিবেকানন্দ অনুরাগী পাঠকেরা মাত্রই জানেন। স্বামীজী নিজেই আলাসিঙ্গাকে একটি চিঠিতে জানিয়েছেন—মিঃ রাইটই 'first man in Amrica who stood as my friend' রাইটের গোটা পরিবারই ছিল স্বামীজীর অনুরাগী ভক্ত। পাশ্চাত্যের চরম বিপদের দিনে স্বামীজীর পাশে অধ্যাপক রাইটই দাঁড়িয়েছিলেন আন্তরিকভাবে।

মিঃ রাইটের কথা বেশি বলার প্রয়োজন পড়ে না। তবে তাঁর বড় ছেলে অস্টিন স্বামীজীর প্রতি বড় অনুরক্ত ছিলেন। এডুইন আর্ণল্ডের 'Light of Asia' বইটি স্বামীজী অস্টিনকে উপহার দিয়েছিলেন। বইটিতে স্বহস্তে স্বামীজী লিখেছিলেন— 'Presented to Austin wright, with love and blessings of Vivekananda.'এই অস্টিন আধ্যাত্মিক চেতনার অধিকারী ছিলেন। স্বামীজী সম্পর্কে তাঁর অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল, এক

রহস্যময় ব্যক্তি হিসেবেই স্বামীজীর প্রতি ছিল তার বিশ্বাস। স্বামীজীর মতো অস্টিন-ও স্বল্পায়ু ছিলেন। অস্টিন রাইট 'Islandia' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেটি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। বইটিতে অস্টিন লিখেছেন ঃ "The Islandian God is called 'Om', can not be seen with eyes nor heard with ears".—এই রচনার মধ্যে ভারতচেতনার তাৎপর্যপূর্ণ অনুরনন প্রতিভাসিত। নিঃসন্দেহে অস্টিনের এই অনুভব স্বামীজীর প্রভাবেই সংক্রামিত হয়েছে।[১]

আমেরিকায় পদার্পণের পর পরই বিরেকানন্দের জীবনে এমনসব ঘটনা ঘটেছিল যাকে অতিলৌকিক ও দৈবনির্দিষ্ট বলা যেতে পারে। হেল পরিবারে তাঁর যোগাযোগ ঠিক এমনই একটি ঘটনা। এ ঘটনাও শিকাগো বক্তৃতার আগে। পরিচয়হীন, পরিশ্রান্ত, নিরাশ্রয়, ক্ষুধায় অবসন্ন, অদ্ভুত পোষাক ও কালো গাত্র-বর্ণের জন্য উপেক্ষিত ও অনাদৃত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এক অভিজাত পল্লীর পথপ্রান্তে দাঁড়িয়ে স্মরণ করেছেন তাঁর পথ-নির্দেশক গুরুদেবকে, কিম্বা বলা যেতে পারে তাঁর শিব-সত্তাকে, এমন সময় রাস্তার বিপরীত দিকের এক সুরম্য গৃহ থেকে এক অভিজাত মহিলা এসে সৌজন্যপূর্ণ কণ্ঠে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'মহাশয়, আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি?' স্বামীজীর হাঁ-বাচক উত্তর ও তাঁর ধর্মমহাসভার চেয়ারম্যান ডাঃ ব্যারোজের ঠিকানা হারিয়ে যাওয়ার কথা শুনে স্বামীজীকে সসম্ভ্রমে নিজগৃহে থাকার ব্যবস্থা করলেন।' পরে ধর্মমহাসভার কার্যালয়ে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। উক্ত সভার প্রতিনিধি হওয়া স্বামীজীর ক্ষেত্রে আর কোন অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এই 'আধ্যাত্মিক হেল পরিবারে' স্বামীজী আবিষ্কার করেছিলেন, 'মাদার চার্চ, ও 'ফাদার পোপকে'। হেল পরিবারই ছিল স্বামীজীর প্রথম পর্বের আমেরিকা বাসের স্থায়ী ঠিকানা। গৃহস্বামী জর্জ ডবল্যু হেল, তাঁর স্ত্রী, শ্রীমতী এলেন অথবা বেল হেল। এঁদের তিন সন্তান—মেরী বানার্ড হেল, স্যামুয়েল এবং কনিষ্ঠা কন্যা হ্যারিয়েট। এঁদের দুই মামাতো বোন হ্যারিয়েট ও ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডালি। স্বামীজী এঁদের সকলকে 'Babies' বলে সম্বোধন করতেন। আমেরিকায় এঁদের স্বামীজীর দেখে মনে হয়েছিল এঁরা কত স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত মানসিকতা সম্পন্ন। আত্মবিশ্বাস ও কর্মদক্ষতা—এঁদের সহজাত গুণ। এঁদের ভিতর অনন্ত-সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে নারী জাগরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাছাড়া আমেরিকার সমগ্র নারী সমাজ তাঁর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল এঁদের মধ্য দিয়ে। 'মাদার চার্চ' এবং 'ফাদার চার্চ' স্বামীজীকে দেখতেন আপন সন্তানের মত। চূড়ান্ত অভাবের দিনে অর্থ দিয়ে সাহাযের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বক্তৃতা কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় 'সাইক্লোনিক্ মঙ্ক', শিকাগোর শান্তি পল্লীর নির্জন গৃহকোণে শ্রীমতী হেলের মাতৃহৃদয় সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য প্রার্থনায় মগ্ন থেকেছেন। কী অপূর্ব ভালবাসা। যদিও হেল পরিবার ছিল 'কিশ্চান সায়েন্স'-এর ভক্ত। স্বামীজীর বেদান্তধর্মকে এই পরিবার গ্রহণ

১. মহিমা তব উদ্ভাসিত, পৃঃ ৫২, লেখিকা—প্রব্রাজিকা অমলাপ্রাণা।

করেননি। 'Babies'দের মধ্যে শুধুমাত্র ইসাবেল স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য সান্নিধ্যে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।[১] আর একজন, ম্যাক্‌কিগুলিদের বড় বোন মেরীর একটি সাত বছরের মেয়ে মাঝে মাঝে এসে থাকত হেল পরিবারে, তাঁর নাম মিসেস হার্বার্ট ই হাইড। বার্ধ্যকে পৌঁছে তিনি স্বামীজীর প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন।

আমেরিকায় স্বামীজী অনেক পরিবারের অতিথি হয়েছেন ; ডেট্রয়েটে ব্যাগলি পরিবারে, স্যানবর্ণ ও রাইট পরিবারের কথা আমরা আগেই বলেছি, নিউইয়র্কে গার্নাসি অথবা ফ্লিলিপস পরিবারে। 'লায়ন বা লেগেট পরিবারেও তিনি আশ্রয় পেয়েছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সম্পর্ক ছিল হেলপরিবারের সঙ্গে। স্বামীজীর মূল্যবান কাগজপত্র সংরক্ষণে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন ইসাবেল। তবুও এই পরিবারের সদস্যরা স্বামীজীর পাশ্চাত্যে ভাবান্দোলনের পথ থেকে কেন যে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, তা আমাদের বিস্ময় জাগায়। তবুও হৃদয়ের অন্দরমহলে এঁরা যে স্বামীজীকে ভালবাসতেন তার প্রমাণ মেলে মেরীর স্বামীজীর কর্মযজ্ঞের জন্য রেখে যাওয়া অর্থ-দানে। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর উইল অনুযায়ী বেলুড় মঠ কর্তৃক আটচল্লিশ হাজার টাকা গৃহীত হয়। কোন এক অজ্ঞাত অভিমান জীবিতবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযজ্ঞে তাঁকে অংশ গ্রহণ করতে দেয়নি। কিন্তু আজীবন তিনি স্বামীজীর ভাবাদর্শ, বাণী ও কর্মকে বহন করেছেন অন্তরে, সংগোপনে। কিন্তু 'গোপন কথাটি রবে না গোপনে।'

পাশ্চাত্যে ভারতচেতনার প্রসারে বিবেকানন্দের সহায় হয়েছিলেন যাঁরা, কুমারী সারা জে. ফার্মার তাঁদের অন্যতম। তাঁর পিতা ছিলেন বৈজ্ঞানিক। অধ্যাপনা ছিল তাঁর পেশা। বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে মোসেস পেরিশ ফার্মারের ছিল গভীর ঈশ্বর বিশ্বাস, যা তাঁর সন্তানের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। অল্প বয়সেই যাঁরা মানবসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। মহতী প্রেরণায় মনোরম বনচ্ছায়ায় যাঁরা নিভৃতে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকতে চান তাঁদের জন্য গড়ে তোলেন এলিয়ট হোটেল, যা পরবর্তীকালে গ্রীনএকার নামে পরিচিত। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর শোকার্ত সারাকে পরম মমতায় নরওয়েতে নিয়ে এলেন বান্ধবী শ্রীমতী বুল। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে শিকাগোয় ফিরলেন সারা। ধর্মমহাসভা শেষ হয়ে গেলেও ধর্মমহাসভার অন্তর্গত শিল্পমেলা চলছিল। ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি স্বামীজী তখন শিকাগোয় ছিলেন। সারা আগামী গ্রীষ্মে গ্রীনএকারে যাবার জন্য অন্যান্য প্রতিনিধিদের মতো বিবেকানন্দকেও আহ্বান জানালেন। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্বামীজী গ্রীনএকারে পদার্পণ করেন। প্রতিদিন একটি পাইন গাছের নিচে বসে স্বামীজী ধর্মশিক্ষা দিতেন। আর পাশ্চাত্যের ধর্মপিপাসু মানুষ তাঁর ধর্মীয় প্রসঙ্গ শোনার জন্য ভীড় জমাতো। গ্রীনএকর সম্পর্কে ভগিনী গার্গী যথার্থই বলেছেন ঃ "The founding of Greenacre Conference in 1894 was part of the same divine plan that

---

১. হেল পরিবারে স্বামীজী প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য,—প্রবাজিকা নির্ভীক প্রাণা, 'মাহিমা তব উদ্ভাসিত' গ্রন্থ, পৃঃ ৫৫

had brought him to Amircca." ঐ সময়ে স্বামীজীর দেওয়া ক্লাস বক্তৃতার কিছু নোট নিয়েছিলেন বিখ্যাত গায়িকা এমা থার্সবি। স্বামীজীর শিষ্যা ছিলেন না সারা। কিন্তু কখনও তিনি স্বামীজীকে ভোলেন নি। সত্য-শান্তি-আনন্দের অপার্থিব প্রেমের আদর্শায়িত রাজ্যে সারা বিচরণ করতেন। তাঁর প্রিয় কবিতা ছিল স্বামীজী রচিত 'সন্ন্যাসীর গীতি'—Wake up the note ! The song that had its birth Far off, where worldly taint could never reach ; In mountain caves and glades of forest deep, whose clam so sigh for lust or wealth or fame coluld ever dare to break ; where rolled the stream of knowledge, turth and bliss...

সত্যই, স্বামীজীর সংস্পর্শে সারা পেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাসহ পরিপূর্ণ মুক্তির আদর্শ। তাঁর গ্রীনএকারের কর্মকাণ্ডে স্বামীজীর অবদান যে কতখানি নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি আয়েজিত স্বামীজীর স্মরণসভায় সারা একখানি মর্মস্পর্শী শোকলিপিতে পুণ্যস্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে তা স্বীকার করেছেন। লিখেছেন ঃ

"To know Vivekananda was renewed consecration, to have him under one's roof was to feed empowered to go forth to the children of men and to help them all to a relization of their birth right as sons of God. What Greenacre ows to him can not be put into words. A little bond of people had started to put prove the providing care of God for those who rely upon Him in utter faith and love. This great soul came into our midst and did more than any other to give to the wark its true tone, for he lived everyday the truths which his lips proclaimed and it was to us the living evidence of the power manifested nineteen hundred years ago as he went about his Father's business in perfect joyousness and childlike trust...all promises fulfilled, all needs met..."

"বিবেকানন্দকে জানার অর্থ ঈশ্বরের পাদপদ্মে নিজেকে নতুন করে দেওয়া ; তাঁকে স্বগৃহে স্থান দেওয়ার অর্থ মানবসেবাব্রতে নবপ্রেরণা লাভ করা এবং প্রত্যেক মানুষই যে ঈশ্বরের সন্তান, প্রত্যেকেরই যে তাঁকে জানার জন্মগত অধিকার আছে সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠা। গ্রীনএকার যে তাঁর কাছে কতটা ঋণী তা ভাষায় প্রকাশের নয়। ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষের দলটি আজ প্রমাণ করতে চলেছে যে প্রভুর ওপর যারা সর্বতোভাবে নির্ভরশীল তিনি তাদের ভার গ্রহণ করেন। সেই দিব্যপুরুষ বিবেকানন্দ আমাদের সঙ্গে একত্রে বাস করেছিলেন আর আমাদের এই প্রচেষ্টাকে প্রকৃত লক্ষ্যের অভিমুখী করে দিতে তাঁর অবদানই ছিল সকলের চেয়ে অধিক। তার কারণ, যে সত্য তিনি প্রচার করতেন, নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করে দেখাতেন। আজ থেকে উনিশ শ' বছর আগে 'পিতার কার্য' সানন্দে শিশুর মতো সারল্য নিয়ে যিনি সম্পন্ন করে গেছেন, আমাদের দৃষ্টিতে সেই ঈশ্বরপুত্র যিশুর শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ স্বামী বিবেকানন্দ।"

১৯০২-এ স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণলোকে চলে যাওয়ার খবর পেয়ে স্বামীজীর

পাইনগাছে একটি স্মৃতিফলক লাগিয়ে স্বামীজীর উপর সারা ফার্মার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

জোসেফিন ম্যাকলউড় বা স্বামীজীর 'জো জো' বা 'জো'-এর স্বামীজীর ক্রিয়াকাণ্ডে আত্মোৎসর্গের কথা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাঁর বয়স যখন ত্রিশের কোটার প্রথম দিকে তখন তিনি অধ্যাত্মজীবন ও ভারতচেতনা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই সময়েই ডোরা রোথলেস বার্জার নামে একজন অধ্যাত্মপিপাসু মহিলার সঙ্গে ১৮৯৫ সালের ২৯ জানুয়ারী দুই ভগিনী বেসি ও জোসেফিন স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মালোচনা শুনতে যান। এই শুভলগ্নটি জোসেফিনের জীবনে নবজীবনের সূচনা ঘটিয়েছিল। এর পরের কাহিনী আমাদের জানা।

আর একজন মহীয়সী নারী হলেন স্বামীজীর মাতৃস্বরূপা শ্রীমতী সারা চ্যাপম্যান বুল, যাঁকে ধীরামাতা বা শুধু মা বলে সম্বোধন করতেন স্বামীজী। তাঁর পূর্বনাম ছিল সারা চ্যাপম্যান থর্প (১৮৪৮—১৯৯১)। পৃথিবী বিখ্যাত নরওয়েজিয়ান বেহলাবাদক ও জাতায়ীতাবাদী নেতা ওলিবুলকে তিনি বিবাহ করেন। বয়সে বুল ছিলেন ৪০ বছরের বড়। তাঁর বিবাহিত জীবন স্থায়ী হয়েছিল দশ বছরের কম। স্বামীর মৃত্যুর পর বস্টনের অদূরে কেমব্রিজ শহরে তাঁর নয় বৎসরের কন্যা ওলিয়াকে নিয়ে বসবাস শুরু করেন। ঐ সময় স্বামীজী আমেরিকায় নানা প্রান্তে বক্তৃতা-সফর করছেন—তখন তিনি সর্বত্রই সুপরিচিত। ১৮৯৪ সালে এপ্রিল-মে মাসে নিউ ইয়ার্ক কিংবা বস্টনে স্বামীজীর সঙ্গে ধীরামাতার যোগাযোগ ঘটেছিল। ঐ বছর জুলাই মাসে মিস ফার্মারের আমন্ত্রণে মিসেস বুল গ্রীনএকার ধর্মসম্মেলনে তিন সপ্তাহ ছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে সেখানেই তাঁর বিশেষ পরিচয় হয়। স্বামীজীর বেদান্তের উপর ক্লাসগুলি তিনি নিমগ্ন হয়ে শুনতেন। ঐ বছরই সারা বুলের আমন্ত্রণে ২রা অক্টোবর স্বামীজী কেমব্রিজে আসেন ও সারার আতিথ্যগ্রহণ করেন। আমেরিকার বিশিষ্ট ও বিদগ্ধ মানুষদের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় ঘটে সারা বুলের গৃহে বাস করার সময়। ১৮৯৬-এ স্বামীজী আবার তাঁর গৃহে আসেন। ঐ সময় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে তিনি একটি বক্তৃতা দেন। আমেরিকায় রামকৃষ্ণ-বাণী প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ধীরামাতা ছিলেন অন্যতম সহায়িকা। স্বামী বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত মিশনারীদের আক্রমণ থেকে ধীরামাতা সর্বদা মাতৃস্নেহে আগল দিয়ে রাখতেন। স্বামীজীও তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। ১৮৯৯ সালের ৩রা আগষ্ট ভগিনী নিবেদিতা ম্যাক্‌লাউডকে লিখেছিলেন—সেণ্ট সারাকে বল, স্বামীজী তাঁর বিষয়ে বললেন ; "ঐ মহিলাকে বোধহয় আমি নিজের মায়ের চেয়েও ভালবাসি।" কৃষ্টিনকে লেখা স্বামীজীর আর একটি চিঠিতে (১৮৯৯-এর ২৭ ডিসেম্বরে) ধীরামাতার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে—"তিনি (মিসেস বুল) একজন মহিয়সী মহিলা, এমনই মহীয়সী যাঁকে দেখা তীর্থদর্শনের সমতুল্য।"

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় অনুপস্থিতিকালে সেখানকার বেদান্ত প্রচার কার্যে মূল দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন মিসেস বুল। স্বামীজীর মতে, তিনিই এই কাজের উপযুক্ত আঁধার। তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন ম্যাকলাউড। ক্রমে এঁদের উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক

গড়ে উঠেছিল গভীরভাবে। ১৮৯৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তাঁরা উভয়েই কোলকাতায় আসেন। বেলুড়ে মঠের বায়না করা নিকটবর্তী জমিতে একটি পুরোনো বাড়িকে সংস্কার করে বাসযোগ্য হলে তাঁরা কোলকাতা হোটেল ছেড়ে ঐ বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। এঁদের আসার কিছুদিন আগে ২৮শে মার্চ মার্গারেট নোবেল ইংলণ্ড ছেড়ে বেলুড়ে আসেন স্বামীজীর কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য। স্বামীজী এঁদের সকলকে ৭ই মার্চ বাগবাজারে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে নিয়ে যান। সারদা মা স্বামীজীর এই বিদেশিনী শিষ্যাদের আন্তরিক স্নেহে 'আমার মেয়েরা' বলে কাছে টেনে নিয়ে আদর করেন এবং 'জো'র অনুরোধে একসঙ্গে খান। স্বামীজীর কাজেই এঁরা নিজেদের বিলাসবহুল জীবনচর্যা ত্যাগ করে ক্লেশকর ভারতীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে অন্বিষ্ট হয়েছিলেন। এমন আত্মত্যাগ বিরল ঘটনা সন্দেহ নাই। সারা বুলের মুক্ত হস্তে অর্থদানেই সে সময়কার মঠবাড়ি ও সন্ন্যাসীদের থাকার বাড়ি তৈরি হয়েছিল। প্রায় পনের হাজার ডলার তিনি দান করে বেলুড় মঠের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সারা সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য খবর এই, তাঁর অনুরোধে শ্রীমা ফটো তুলতে দিয়েছিলেন যার মধ্যে একটি আজ সর্বত্র পূজিত হচ্ছে। নিবেদিতার ফরাসী জীবনীকার লিজেল রেমঁ-এর একটি মন্তব্য সারা ও স্বামীজীর জীবনের এক উজ্জ্বল মুহূর্তকে উদ্ভাসিত করেছে। তিনি লিখেছেন ঃ '৫ নভেম্বর স্বামীজী মিসেস বুলের কোমরে একটি (গেরুয়া বস্ত্র) সূতী-বস্ত্র জড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ থেকে আপনি একজন সন্ন্যাসী।' তারপর তিনি নিবেদিতা ও মিসেস বুলের মাথায় হাত রেখে বললেন ঃ

"পরহংসদেব আমায় যা দিয়েছিলেন তার সবকিছু তোমাদের দান করলাম। যা এক নারীর (জগন্মাতা) কাছ থেকে পেয়েছিলাম, আমি তা তোমাদের দুই নারীকেই অর্পণ করলাম।" স্বামীজীর স্বদেশ, তাঁর মানব-কল্যাণের ব্রতে, নিবেদিতা ও কৃষ্টিন পরিচালিত বিদ্যালয়ের উন্নতি, জগদীশ চন্দ্র বসুর বিজ্ঞান সাধনার ব্যাপারে, সর্বোপরি ভারতবর্ষের নারীদের সামাজিক ও শিক্ষামূলক উন্নয়নে সারা বুল অকাতারে অর্থ সাহায্য করেছেন। এমনকি উইল করে সেই অর্থসাহায্য ব্যবস্থা যাতে অব্যাহত থাকে তার ব্যবস্থা করে গিয়েছেন মৃত্যুর পূর্বে। ১৯১১-তে তাঁর মৃত্যুর পর নিবেদিতা অনুভব করেছেন—তিনি চলে গেলেন সরাসরি স্বামীজীর দিব্যাসান্নিধ্যে।

আমেরিকায় স্বামীজীর সাফল্য দেখে একদল মানুষ যেমন যারপরনায় খুশি হয়েছেন, তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, পাশাপাশি বিশপ নিনডের মতো মিশনারীরা স্বামীজীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে স্বামীজীর ভাবমূর্তিকে কলুষিত করার চেষ্টা করেছেন। ১৮৯৪-এর ১৩ ফেব্রুয়ারী থেকে ৩০শে মার্চ অব্দি স্বামীজী প্রথমবার ডেট্রয়েটে ছিলেন। এর পরেও তিনি ডেট্রয়েটে যান ১৮৯৬-এর ৩রা মার্চ এবং ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে। এখানকার প্রতিপত্তিশালী মহিলা শ্রীমতী ব্যাগলী যিনি শিকাগো ধর্মসভায় উপস্থিত ছিলেন, স্বামীজীর সম্মানে তিনিই এক বিরাট অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪, বুধবার 'ফি প্রেসে' স্বামীজীর এক সাক্ষাৎকার বেরোয়। তাতে তাঁর প্রশংসা করে লেখা হয়েছে ঃ

"এই হিন্দু দেবমানবটি সদাই প্রসন্ন। এই প্রসন্নতা একটা দেখবার জিনিষ। কোন কিছুকেই তাঁর এই দিব্য প্রসন্নতা ভঙ্গ করতে পারে না। শান্ত, সংযত, সর্বদা আত্মস্থ। এ জগতের মলিনতা যেন তাঁকে স্পর্শ করে না।..."[১]

'ইভনিং নিউজ'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে কিন্তু স্বামীজীর বিরুদ্ধে 'যুদ্ধং দেহি' ভাব প্রকাশ পেয়েছিল। এদের বক্তব্য, বিবেকানন্দ 'অলৌকিক ভোজবাজি'[২] যদি দেখাতে পারেন তবেই তাঁকে মহাত্মা বলে মানতে রাজি হবেন। নচেৎ নয়। স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী মিঃ ও. পি. ডেলডক স্বামীজীর পক্ষ নিয়ে তির্যক মন্তব্যের উপযুক্ত জবাব দেন। 'ইভনিং নিউজে'-এ লেখেন (১৬ই ফেব্রুয়ারী) ঃ

"স্বামী বিবেকানন্দ যদি শান্তি, মৈত্রী, পবিত্রতা, ত্যাগ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করে দেখিয়ে সঙ্কীর্ণতা ধর্মান্ধদের চোখের ঠুলি খুলে দিয়ে থাকেন, এমন চারিত্রিক উৎকর্ষ দেখিয়ে থাকেন যা মিশনারীদের মধ্যে একান্ত দুর্লভ এবং সর্বোপরি মানুষের পাষাণ-হৃদয়ে প্রেমমাধুর্য সঞ্চার, যা তিনি করছেন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহলে আমাদের দেশে তাঁর কর্মব্রত বিফলে যাবে না।"[৩] স্বামীজীই জিতলেন এই বিতর্কে।

ইউনিটেরিয়ান চার্চে ১৪ ফেব্রুয়ারী স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতা ডেট্রয়েটে। এখানেই বিবেকানন্দ-পাঠকদের বহু পরিচিত কৃষ্টিন গ্রীনস্টিডেল ও তাঁর প্রিয় বান্ধবী মেরী ফ্রাঙ্কি স্বামীজীকে প্রথম দর্শন করেন। কৃষ্টিন স্বামীজীর ডেট্রয়েটে দেওয়া প্রতিটি বক্তৃতা শুনেছেন। ডেট্রয়েটে স্বামীজীর দেওয়া বক্তৃতাগুলি হলো—'মানবের দেবত্ব', 'বৌদ্ধধর্ম' 'এশিয়ার আলো', 'ভারতের নারী', 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ', 'ঈশ্বরপ্রেম' ইত্যাদি। 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ' নিয়ে স্বামীজী যে দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে এত শ্রোতা হয়েছিল যে অনেকে জায়গা না পেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ১৬ই মার্চ 'ট্রিবিউন' ও 'ফ্রি প্রেস' দুটি কাগজেই স্বামীজীর প্রশংসা করে রিভিউ বেরল। কৃষ্টিন-এর লেখায়-ও তার পরিচয় মেলে। লিখেছেন "তিনি উঠে দাঁড়িয়ে মেঘমন্দ্রস্বরে মহত্তম সত্যগুলি আমাদের প্রাণে এমন করে ঢেলে দিচ্ছিলেন যে কণ্ঠস্বর, বাণী এবং তাঁর চেহারা, এই তিনে মিলেমিশে এক অপূর্ব ঐক্যতানের সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রোতাদের তিনি এমনই একাগ্র চিন্তায় ডুবিয়ে দিয়েছিলেন যে তাদের মন আর তাদের বশে ছিল না।"[৪]

বস্তুত ফাঙ্কি ও কৃষ্টিনের মতো ডেট্রয়েটের অনেক মানুষের জীবনে স্বামীজী আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করে দিয়েছিলেন যা কালে মহীরূহতে পরিণত হয়েছে। আর কৃষ্টিন তো স্বামীজী-নিবেদিতার শিক্ষা বিস্তার তথা মানবসেবার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন প্রত্যক্ষভাবে—সেসব ঘটনা আমরা সকলেই জানি। ভগিনি কৃষ্টিন রূপে তাঁর সেই কল্যানী সেবিকা-মূর্তি, বিশেষভাবে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে

১. 'New discoveries'—Marie Louise Barke, vol. 1, P—298
২. ঐ ঐ ঐ, P—325
৩. ঐ ঐ ঐ, P—329
৪. নিউ ডিসকভারিজ—৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪

আছে। ডেট্রয়েটের টেম্পল বেথ এল-এর রাব্বি গ্রসম্যান স্বামীজীর পরম ভক্ত ও বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। তিনিও 'ট্রিবিউন'-এ লিখেছেন ঃ "হিন্দু সন্ন্যাসী আমাদের জানিয়েছেন ঈশ্বর নিত্য বিরাজমান চৈতন্যময় সত্তা, ঈশ্বর সনাতন সর্বব্যপী। প্রতিটি ফুলে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে, দেহের রক্ত বিন্দুতে তিনি স্পন্দিত। তাঁর এই শিক্ষা আমরা যেন গ্রহণ করি।"[১] এই রাব্বির অনুরোধেই স্বামীজী—'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ' এই বিষয়টি দ্বিতীয় দিন বক্তৃতা দেন।

আর একটি ঘটনা ডেট্রয়েট-এ ঘটেছিল যা উল্লেখ না করলে অপূর্ণ থেকে যাবে ডেট্রয়েটে স্বামীজী-প্রসঙ্গ। আগেই বলেছি, স্বামীজীর প্রভূত প্রশংসাই যখন ডেট্রয়েটের আকাস-বাতাস উদ্বেলিত, তখন ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক একদল গোঁড়া খ্রিষ্টান তাঁর প্রতি কুৎসা ও নিন্দার বাণ নিক্ষেপ করে স্বামীজীকে বিপর্যস্ত করার চেষ্টায় মেতে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, এক ডিনার পার্টিতে তাঁর কফিতে বিষ মিশিয়ে প্রাণনাশ করার চেষ্টা হয়েছিল। কফির পেয়ালায় যখন স্বামীজী চুমুক দিতে যাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিনি স্বামীজীকে সাবধান করে দিয়ে বললেন ঃ 'ওরে খাসনি, ওতে বিষ আছে।'

১৮৯৪ অব্দি স্বামীজী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল ও মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে নানা সভায় বক্তৃতা দেন। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সুমহান ধর্মকে বিশ্বের সম্মুখে উপস্থিত করার প্রবল প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বিবেকানন্দ হয়ে উঠেন 'এক দিব্য বার্তার নবী'। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'নিউ ইর্য়ক' বেদান্ত সোসাইটি-র উদ্বোধন হয়। এই শতকে বেদান্ত ভাবনার বীজ রোপন করা হয়। শ্রীমতী মেরী লুইস বার্কেরে মতে (মিস্টার গার্গী), বেদান্ত ভাবনার বিস্তার সংরক্ষণ ও পরিবর্ধনের আয়োজন হয়েছে ১৮৯৫—১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে এই সময়কালে। স্বামীজী ঐ সময় ধারাবায়িক ক্লাস নিয়েছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন ও রীতিমতো অনুশীলন করিয়েছেন ভারতীয় যোগ। শ্রীমতী বার্কের মতে এটি 'উদ্যোগপর্ব'। পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁর মহতী বাণী যেন ঐ সময়েই একটি সুনির্দিষ্ট রূপ নিচ্ছিল। ১৮৯৪-র শেষ দিকের আলোচনায় স্বামীজী একটি চমকপ্রদ মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'I have a message to the West just as Buddha had a message to the East.'—স্বামীজীর এই মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ১ জানুয়ারী স্বামীজী শিকাগোয় হেলদের পরিবারে, এরপর ডাঃ গার্নসির বাড়িতে কিছুদিন বাস করেন। অবশ্য নিউইয়র্ক পৌঁছেই স্বামীজী লিয়ঁ ল্যাণ্ডস—বার্গকে (স্বামী কৃপানন্দ) ক্লাস শুরু করার জন্য ঘর ভাড়া করতে বলেন। সম্ভবত ২৭শে জানুয়ারী স্বামীজীর ঐ বাড়িতে পদার্পণ ঘটে। ম্যাকলাউড ঐ সময়ে আধ্যাত্মিকতার আলোয় নবজন্ম লাভ করেন। 'Reminiscences' তা ব্যক্ত করেছেন। মিস এস. ই. ওয়ালডো স্বামীজীর খুব বিশ্বাসভাজন ছিল। তিনি ঐ সময়ের ক্লাসগুলোর বক্তব্য বিষয় নোটবুকে টুকে রেখেছিলেন, যা স্বামী সারদানন্দ আমেরিকা থাকাকালীন টুকে নেন। ওয়ালডোর উপরেও স্বামীজীর প্রভাব ছিল অসীম।

১. ঐ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৭—৪৮

এরপরে ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ জুন থেকে ৬ আগষ্ট পর্যন্ত সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজী ক্লাস নেন, যেগুলি পরে inspired Talks (দেববাণী) নামে পরিচিত। মিস ওয়ালডো তাঁর অনুধ্যানের জন্য এগুলির নোট রাখতেন। মিস ডাচারের কুটিরে থাকাকালীন স্বামীজী সকালে প্রায় প্রতিদিন যেসব আলোচনা করেন সেগুলিরও তিনি নোট রেখেছিলেন। সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজী মোট ৪৩ টি ক্লাস নেন যেগুলির বিষয় বৈচিত্র্যে স্বামীজীর চিন্তার বিশালতা ধরা পড়ে। সেগলি হলো ঃ কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগ, নারদীয় ভক্তিসূত্র, পতঞ্জলির যোগসূত্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রিষ্ট, রামকৃষ্ণ, শঙ্করাচার্য, মধ্ব, বিভিন্ন উপনিষদ প্রসঙ্গ, হিন্দুদের যড়দর্শন, সাংখ্যদর্শন, সূফীদর্শন ইত্যাদি।

স্বামী বিবেকানন্দ এরপর উত্তর আমেরিকা ছেড়ে পাড়ি দেন ইউরোপে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে লেগেটদের অতিথি হিসেবে কাটিয়ে তিনি তখন লণ্ডনে। এখানে তাঁর ইংরেজ ভক্ত ই. টি. স্টাডির বাড়িতে কিছুদিন বাস করেন। সময়কাল ১৮৯৫-খ্রিষ্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বরের পর। স্টার্ডি তাঁর কাছে তখন সংস্কৃত শেখেন। অক্টোবরে শেষ সপ্তাহে স্বামীজী মিঃ চেমিয়ার-এর বাড়িতে ক্লাস নেন। ঐ সময় চারটি যোগের উপরে ক্লাস নেন। এইসব ক্লাসের অধিকাংশ আলোচনা যাঁরা সংরক্ষণ করেছেন, তাঁরা তিনজনই স্বামীজীর অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। এঁরা হলেন ঃ মিস ওয়ালডো, স্বামীজী শিষ্য লিয়ঁ ল্যাণ্ডসবার্গ ও অনুগত সেবক ও শিষ্য জেশিয়া জন গুডউইন। স্টার্ডিই কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ পুস্তিকা আকারে লণ্ডন থেকে প্রকাশ করেন। বস্তুত পাশ্চাত্যের প্রতি বিবেকানন্দের বাণীর মর্মকথা হল Practical Vedanta. সুবিখ্যাত মিশনারী শিক্ষাবিদ রেভাঃ হেনরি মিলার স্বামীজীর সংস্পর্শে গভীরভাবে আসার পর তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছিল। প্রথম জীবনের উৎসাহী মিশনারীর ভূমিকা ত্যাগ করে তিনি বিবেকানন্দের উদার ধর্মমতের সমর্থকহয়ে ওঠেন। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, খ্রিষ্টধর্ম স্বামী বিবেকানন্দের কাছে সবচেয়ে ঋণী বোধহয় এই কারণে যে, তিনি বহু খ্রিষ্টানের গোড়ামি ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। মূলত বিজ্ঞানসম্মত বৈদান্তিক যুক্তির আলোকে গোঁড়ামির বাঁধন আলগা করে দিয়েছিলেন। এ আলোচনায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান, স্বামীজীর ভারতচেতনার প্রচার ও প্রসারের ফলে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের মানুষেরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল—খ্রিষ্টধর্ম একমাত্র ধর্ম নয়, বহু ধর্মের একটি মাত্র। স্বামীজীর প্রভাব বহু দার্শনিক, মনীষী, লেখক, বুদ্ধিজীবি, এমনকী সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের উপর পড়েছিল। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ওয়াশিংন্টন থেকে স্বামীজী লিখেছেন ঃ

"এঁরা সকলেই আমাকে এবং আমার উপদেশ পছন্দ করেন। এই দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়াগায় আমি ঘুরে বেড়াই। হাজার হাজার মানুষ আমার ভাষণ শুনেছেন এবং আমার বক্তব্য সহৃদয় চিত্তে গ্রহণ করেছেন।"[১]

তবুও 'Addresses on Bhakti Yoga'-তে স্বামীজী খ্রিষ্টানদের গোঁড়ামির গোড়ায়

১. The Complet works Vol V, P—48

অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছেন ঃ "খ্রিষ্টানদের বড় সঙ্কীর্ণতা তাঁরা ক্রাইস্ট ছাড়া ঈশ্বরের অন্য কোন প্রকাশকে স্বীকার করেন না।" তাঁরা বিশ্বাস করেন, ক্রাইস্ট হচ্ছেন 'The only Son of God'. স্বামীজীর মতে, এসব হল গোঁড়া মিশনারীদের মুতয়া বুদ্ধি। সাধারণ মানুষকে কিন্তু স্বামীজী এই দোষ দেননি। মিশনারীদের ঐ মতুয়ার বুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লিখেছেন ঃ "আমরা শুধুমাত্র যে পরস্পরকে সহ্য করার নীতিতে বিশ্বাস করি তাই নয়, আমরা হিন্দুরা সব ধর্মকেই সত্য বলে স্বীকার করি।"[১]

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য মানুষের চোখ এমনভাবে খুলে দিলেন যে মিশনারীদের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হতে লাগলো। অন্যদিকে খ্রিষ্টানদের মধ্যে 'অন্তর্নিহিত দেবত্বের' ধারণাটি সংক্রামিত হওয়ায় বিভিন্ন চার্চের ধর্মযাজকরাও তাঁদের প্রচারের সুর পাল্টাতে বাধ্য হলেন, পাপী বলা বা নরকের ভয় দেখানো ব্যাপারগুলি থেকে তাঁরা বিরত হলেন। ৭ই অক্টোবর 'Out look' পত্রিকায় লেখা হয়েছে ঃ "হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরা হেলাফেলার মানুষ নন। তাঁরা অনেক খ্রিষ্টানের চোখ খুলে দিয়েছেন।"[২] আর আজ বেদান্তচর্চায় পাশ্চাত্যের মানুষের এত আগ্রহ যে আমেরিকার প্রতিটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের ও হিন্দুধর্ম চর্চার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত বেদান্ত সেণ্টারগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ওকালাহামার ওসেগা মঠে হিন্দু ও ক্যাথলিক ধর্মগ্রন্থ একই সঙ্গে পাঠ করা হয়। জন্মসূত্রে আমেরিকান, বর্তমানে সন্ন্যাসিনী, প্রব্রাজিকা ব্রহ্মপ্রাণা লিখেছেন, বেদান্তের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এক Calvinist ধর্মযাজকের মারফৎ। স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করতে গিয়ে রাজযোগের প্রভাব দেখা বিস্মিত হয়েছিলেন। স্বামীজীর দেহ যাবার পরের বছর (১৯০৩ সালে) এক স্মরণসভায় বলেছিলেন ঃ "নিষ্ঠাবান খ্রিষ্টানরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থকে যে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, ঠিক সেই দৃষ্টিতেই তাঁরা রাজযোগ গ্রহণ করেছেন। রাজযোগের প্রভাবে এদেশে বহু মানুষের জীবন ও চরিত্র আমূল পাল্টে যেতে দেখেছি।"[৩]

এইরকম একটি জীবন জোসিয়া জন গুডউইনের স্বামীজীর প্রিয় 'গনেশ'-এর। ১৮৯৫-এর ১২ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে দুটি সংবাদপত্রে 'The Herald'ও 'The World'-এ বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হল ঃ "Wanteda rapid shorthand writer West 39th, Street"[৪] গুডউইন স্বল্প পারিশ্রমিকে ঐ কাজে যোগ দিলেন। প্রথম সাক্ষাৎকারেই স্বামীজী গুডউইনের অতীত উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অনেক ঘটনা বলে দিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর চিন্তার জগতে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। স্বামীজীর পদতলে অর্পণ করলেন নিজেকে।

১. ঐ Vol—1, P. 4
২. 'New Discoveries. Vol I P. 106
৩. 'Swami Vivekananda and his works' by Swami Abhedananda, 5th edition, P. 13
৪. New Discoveries. Vol III. P—335

কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর চিন্তার জগতে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল স্বামীজীর দিব্য-সান্নিধ্যে। পারিশ্রমিক হিসাবে অর্থগ্রহণ করতে চাইলেন না। বললেন ঃ "If Vivekananda gives his life, the least I can do is to give my service." বিবেকানন্দের মধ্যে গুডউইন দর্শন করেছিলেন তাঁর আরাধ্যদেবতা যীশুখ্রীষ্টকে। ১৮৯৬-এর ৭ই অক্টোবর একটি পত্রে ম্যাকলাউডকে লেখন ঃ "Shall I shock you very much if I tell you that the Swami takes the place of Christ to me ? I think not, for you will understand what I mean." (New Discoveries. V III, P. 338—339).

স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করেন। গুডউইন-ও স্বামীজীর দিব্যসঙ্গ ও প্রেমে বাঁধা পড়লেন। তাঁর কাছে স্বামীজী শুধু গুরুই ছিলেন না, একাধারে ছিলেন—'Friend' Philosopher and Guide.' স্বামীজী-ও সব কাজে তাঁর এই শিষ্যের ওপর খুবই নির্ভর করতেন। সস্নেহে প্রায়ই বলতেন—'My faithful Goodwin.' আর গুডউইন-ও স্বামীজীর সাফল্যে আত্মহারা হয়ে উঠতেন। ১৮৯৭ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী স্বামীজী সেভিয়ার দম্পতি, গুডউইনকে নিয়ে কাশীপুরে গোপালশীলের বাড়িতে ক'দিন থেকে আলামবাজার মঠে এলেন। গুডউইন আমাদের দেশে থাকাকালীন কঠোর ত্যাগব্রতীর জীবন-যাপন করতেন। আর সুযোগ পেলেই স্বামীজীর সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন। স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগই তাঁকে ভারতীয় আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিকে সহজে গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল। তাঁর বিচক্ষণতা, অমানুষিক পরিশ্রমের ফলেই স্বামীজীর অধিকাংশ বক্তৃতা, ঘটনা ও আলোচনা আজ আমরা হাতে পেয়েছি। পাশ্চাত্যে ও ভারতবর্ষে স্বামীজীর ক্রিয়াকাণ্ডের অনেকটাই তিনি অনুলিখনের মাধ্যমে তুলে ধরে জগৎবাসীর কাছে স্বামীজীর বাণী ও সাধনার গুরুত্ব কে মহীয়ান করে রেখেছেন। স্বামীজীর বক্তৃতাগুলির অনেকটাই গুডউইন সাঙ্কেতিকলিপিতে লিখে রেখেছিলেন—যাতে কয়েকখণ্ডের তথ্যাদি উপকরণ ছিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর মৃত্যুর পর সেসব লিপির সন্ধান না জানায় আলাসিঙ্গা গুডউইনের রাখা কাগজপত্র বিদেশে তাঁর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন, সেগুলির সন্ধান মেলেনি। হঠাৎই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ১৮৯৮-এর ২রা জুন উটকামণ্ডে (উটি) স্বামীজীর এই প্রিয় শিষ্য, অন্তরঙ্গ বন্ধু পরপারে চলে যান। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ শুনে স্বামীজী বারবার বলতে লাগলেন—" পুত্রশোক কি ভয়ঙ্কর। এখন বুঝিতে পারিতেছি, পুত্রশোক কি? গুডউইন চলিয়া গেল ; আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া গেল। বোধহয় মা'র ইচ্ছা নয় যে আমি আর কাজ করি।"[১] বিশ্বস্ত শিষ্য গুডউইনের প্রতি আশীর্বাদস্বরূপ কবিতা লেখেন স্বামীজী—

"চল আত্মা শীঘ্র গতি, তারকাখচিত তব পথে।
ধাও হে আনন্দময়, যেথা নাহি বাধে মনোরথে ;

১. স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষিপ্রলিপিকার জে. জে. গুডউইন, পৃঃ ৪১

—টুটেছে বন্ধন তব, পেয়েছ যে আনন্দ সন্ধান।'
জন্মমৃত্যুরূপে যিনি, তার সাথে হলে এক প্রাণ,
তুমি যে সহায় ছিলে, স্বার্থত্যাগী চির এ ধরায়
আগে চল, সংসার-সংগ্রামে আনো প্রীতির সহায়।"

শোকসন্তপ্তা গুডউইনের জননীকে এই কবিতাটি পাঠিয়ে স্বামীজী লিখেছেন ঃ "গুডউইনের ঋণ অপরিশোধনীয়, আর যাঁরা মনে করেন, আমার কোন চিন্তা দ্বারা তাঁরা উপকৃত হয়েছেন তাঁদের জানা উচিত যে, তার প্রত্যেকটা কথা শ্রীমান গুডউইনের স্বার্থলেশহীন অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকাশিত হতে পেরেছে। তার মৃত্যুতে আমি একজন অকপট বন্ধু, ভক্তিমান শিষ্য ও অদ্ভুত কর্মীকে হারিয়েছি। সে জানত না, ক্লান্তি কাকে বলে। পরার্থে যাঁরা জীবনধারণ করেন, এরূপ লোক জগতে অল্প। সেই অত্যল্প সংখ্যারও আর একটি হ্রাস পেল।"[১] —স্বামীজীর এই মন্তব্যই প্রমাণ করে গুডউইনের কাছে আমরা

অদ্বৈতের প্রেরণায় স্বামীজীর পথকেই যাঁরা জীবনের ধ্রুবতারা করেছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই বিশ্বাস ভূমিতে সুস্থিত ছিলেন, তিনি হলেন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিবেদিত প্রাণ সেভিয়ার-দম্পতি। এঁদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আগেই করা হয়েছে। শার্লট এলিজাবেথ সেভিয়ার লেখিকা ছিলেন, আর মিঃ সেভিয়ার ছিলেন ক্যাপ্তেন। ১৮৯৬-এর গ্রীষ্মে দ্বিতীয়বারে লণ্ডনে এসে স্বামীজী অদ্বৈত বেদান্তের ক্লাস নিতে শুরু করেন। ঐ সময় সেভিয়ার দম্পতি প্রথম শুনলেন অদ্বৈত বেদান্তের কথা। তাঁদের মনে হল ঃ "This is the man and this is the Philosphy that we have been searching in vain all through our life."[২] এই বিশ্বাস সেভিয়ার-দম্পতি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পালন করেছিলেন। স্বামীজীর নিরন্তর দিব্যসান্নিধ্যে তাঁরা অনুভব করেছিলেন দর্শনকেই জীবনে রূপায়ন করাই লক্ষ্য। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁদের অন্তরঙ্গতার উৎস ছিল গভীর অন্তর্লোকে। গুরু ও পুত্র—এই দুইরূপেই স্বামীজীকে তাঁরা দেখতেন। বহুকাল পরে ইংরেজি জীবনীগ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক হিসাবে মাদার সেভিয়ার লিখেছিলেন ঃ "From that day they looked upon the Swami not only as their Guru but as their own Son."[৩] আর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলতেন ঃ "Of all the perfect men that have appeared on earth I consider him the greatest."[৪] অন্যদিকে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ছিলেন আপাতমস্তক ভারতীয়। 'হরি ওঁ তৎ সৎ' মন্ত্র ছিল তাঁর খুব প্রিয়। বুদ্ধিমতী মাদার জানতেন আশ্রম

১. যুগনায়ক বিবেকানন্দ—তৃতীয় খণ্ড, পৃ ঃ ১০৫
২. Life of Swami Vivekananda (Maybati edition, 1955), P. 421
৩. ঐ
৪. প্রবুদ্ধ ভারত, জানুয়ারী ১৯৩২, পৃ ঃ ৬

প্রতিষ্ঠার পিছনে ক্যাপ্টেন ও তাঁর আর্থিক অবদান থাকলেও প্রেরণা স্বামীজীর। ব্যক্তিগত অধিকারের সামান্যতম দাবিকে মুছে দিয়ে ১৯০৩ সালে তিনি আশ্রমের দায়িত্ব সংঘ পরিচালিত 'ট্রাস্ট বোর্ড'-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

মাদার ও কাপ্টেন সেভিয়ার সম্পর্কে স্বামীজীর কথা দিয়েই এ প্রসঙ্গে শেষ করবো যার মধ্যে উভয়ের প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা, ভালাবাসা ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। তাঁদের দয়ার কথা স্বামীজী ভুলতে পারেননি। লিখেছেন ঃ "মিসেস সেভিয়ার নারীকুলের রত্নবিশেষ ; এত ভাল, এত স্নেহময়ী তিনি। সেভিয়ার দম্পতিই একমাত্র ইংরেজ যাঁরা এদেশীয়দের ঘৃণা করেন না।" অন্যত্র লেখেন ঃ "ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ারের কথা মনে পড়ে—শীতের সময় তাঁরা আমাকে বস্ত্র দিয়েছেন, আমার নিজের মার চেয়েও যত্নে আমার সেবা করেছেন, ক্লান্তি ও দুঃখের দিনে আমার সমব্যথী হয়েছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই পাইনি। সেই মিসেস সেভিয়ার মানমর্যাদা পরোয়া করেননি বলেই আজ হাজার হাজার লোকের পূজনীয়া।"[১]

বস্তুত স্বামীজীর 'মিশন-কে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে আমেরিকান মহিলাদের অবদান কম নয়। সহস্রদ্বীপোদ্যানে কয়েকজন অধ্যাত্মপিপাসু নর-নারী আচার্য বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে জীবনের পাথেয় গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজী এঁদের মধ্যে পাঁচজনকে ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রহ্মচর্যব্রতে এবং একজনকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীমতী লুইস (অভয়ানন্দ), শ্রীমতী এলেন ওয়ালডো (যতিমাতা) এবং শ্রীমতী কৃস্টিনা গ্রীনস্টাইডেল (ব্রহ্মচারিণী কৃস্টিন)। স্বামীজীর আর একজন শিষ্যা ছিলেন রুথ এলিস। এঁদের মধ্যে কৃস্টিন ছিলেন শিক্ষাবিদ। কোলকাতায় শিক্ষা-বিস্তারের কাজে স্বামীজী কৃস্টিনকে নিয়োজিত করেছিলেন। এঁরা সকলেই স্বামীজীর মৃত্যুর পর আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

দ্বিতীয়বার আমেরিকা-সফরকালে স্বামীজীকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন মীড ভগিনীদের অন্যতমা শ্রীমতী অ্যালিস হ্যান্সবরো। তাঁদের প্যাসাডোনার বাড়িতে অতিথিরূপে থাকতেন। বর্তমানে ঐ বাড়িটি তীর্থসদৃশ দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বেদান্তকেন্দ্রের অন্তর্গত। সানফ্রান্সিসকোই স্বামীজী যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন—হ্যান্সবরোই সেগুলির ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি ছাড়া সানফ্রান্সিসকোর হোম অব ট্রুথ'-এর শিক্ষক শ্রী ও শ্রীমতী বেঞ্জামিন অ্যাসপিন্যাল-ও তাঁর সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঐ সময় আরও অনেক শ্রোতার মতো ফ্রাঙ্ক রোডহ্যামেল নামে একজন যুবক স্বামীজীর ভক্ত হয়ে পড়েন। তিনি লিখেছেন ঃ "সেই মহান সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যলাভের স্মৃতি আজও সুস্পষ্টভাবে আমার মনে গাঁথা আছে। যে প্রভাব ও প্রেরণা সেদিন পেয়েছি—তাকে জীবনের মহত্তম অভিজ্ঞতা বললেই ঠিক বলা হয়।"[২]

১. পত্রাবলী, ৫ম সং, পৃ ঃ ৫৮৭
২. 'মহিমা তব উদ্ভাসিত'—প্রবন্ধ ঃ কালির্ফোনিয়ায় স্বামীজী, পৃ ঃ ৫৩৭

কৃস্টিনের বান্ধবী মেরী ফ্রাঙ্কি-ও স্বামীজীর দিব্য-সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। ফ্রাঙ্কিরই আগ্রহ-আতিশয্যে কৃস্টিন ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪-এ ইউনিটেরিয়ান চার্চে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন। স্বামীজীর কণ্ঠে বেদান্তের বাণী তথা ভারতাত্মার বাণী কৃস্টিনকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-র আনন্দ-ঘন ভাবের জগতে নিবিষ্ট হতে প্রেরণা দিয়াছিল। অন্যদিকে শ্রীমতী হ্যাল্সবরো শুধুমাত্র স্বামীজীর বক্তৃতার ব্যবস্থাপক ছিলেন না, তিনি একাধারে ছিলেন স্বামীজীর সচিব, কোষাধ্যক্ষ ও তহবিলদার।

"তাঁকে মনে হয় যেন কোন সুদূরের পার হতে আসা এক জ্যোতির্ময় পুরুষ।"[১] স্বামীজীর প্রথম ভাষণ শোনার পর মিস আইভার এই অনুভূতির প্রকাশ। তাঁর পুরো নাম আইডা মেরিল উইঙ্কলি অ্যানাসেল। 'হোম অব ট্রুথে'র মিস লিডিয়া বেলের মাধ্যমেই ভারতীয় চিন্তাচেতনার সঙ্গে পরিচয়। মিস বেল 'হোম অব ট্রুথে' ভগবদগীতার ক্লাস শুরু করেছেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে অ্যানসেল বেশিদূর লেখাপড়া শিখতে পারেনি। কিন্তু শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপে পারদর্শিনী ছিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার পর নিজের প্রয়োজনেই তা সংগ্রহ করে রাখার চেষ্টা করেন। যাতে স্বামীজীর দিব্য অনুধ্যান করে কাটাতে পারেন। তিনি তখনও জানতেন না যে ঐ নোটগুলোর জন্য আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতের মানুষ উৎসুক হয়ে থাকবে। স্বামীজীর কাছে অ্যানাসেল জপ-ধ্যান করা শিখেছেন। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে স্বামীজী তাঁকে দীক্ষা দেন—তার নাম হল উজ্জ্বলা। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁকে ডাকতেন বেবী বলে। আইভার মতো বহু ছাত্র-ছাত্রী সেই সময় নিয়মিত স্বামীজীর ক্লাসে উপস্থিত থাকতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ 'শান্তি আশ্রম' গড়ে তুললেন তাঁর অনুগত ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য নিয়ে। ঐ আশ্রমের গৃহস্থালির নানা দায়িত্ব সামলাতেন মিস অ্যানাসেল। স্বামী তুরীয়ানন্দকে সেবা করার দুর্বল সু যোগ তাঁর হয়েছিল। স্বামী অভেদানন্দ ও ত্রিগুণাতীতানন্দের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। দেহবৈকল্য নিয়েও তিনি অসম্ভব পরিশ্রম করতেন। হরিদাস নামে এক ভক্তকে উজ্জ্বলার দেখাশোনার দায়িত্ব দেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। চল্লিশের দশকে স্বামী অশোকানন্দ উজ্জ্বলাকে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলি তাঁর শর্টহ্যাণ্ড নোট থেকে পুনুরদ্ধার করতে উৎসাহ দেন। তাঁর স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লেখা এবং তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া পত্রগুলি থেকে শান্তি আশ্রম সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। আমেরিকায় রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের বিস্তার সম্পর্কে প্রামাণ্য ইতিহাস এইসব পত্রগুলি। স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ (জন ইয়েল) অফিস সংক্রান্ত কাজে ব্যাপৃত রাখতেন উজ্জ্বলাকে। ১৯৫০ সাল থেকে উজ্জ্বলা (তখন তাঁর বয়স সত্তরের মাঝামাঝি) স্বামী প্রভবানন্দের আমন্ত্রণে হলিউড বেদান্ত সেণ্টারে স্থায়ীভাবে থাকা শুরু করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সর্বান্তকরণে তিনি সেবা করেছেন মানুষরূপী ব্রহ্মকে। হয়ে উঠেছিলেন বিবেকানন্দময়।[২]

---

১. Reminiscenses of Swami Vivekananda, P---376

২. 'মহিমা তব উদ্ভাসিত'—প্রবন্ধ ঃ 'প্রতিবন্ধী সেই মেয়েটি'—লেখিকা প্রব্রাজিকা বরদাপ্রাণা, পৃ ঃ ৪৩২—৫৪৮

এমা কালভে তাঁর আত্মজীবনীতে পরিচয় দিয়েছেন কৃষককন্যারূপে—হয়েছিলেন পৃথিবী বিখ্যাত অপেরা গায়িকা। সুরের যাদুতে আচ্ছন্ন করে রাখতেন কত শত মানুষকে। শুধু সুর নয়, নৃত্য ও অভিনয়েও তিনি ছিলেন প্রতিভাময়ী। স্বামীজী তাঁর গুণের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ "কালভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চা করেন তা নয়, বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন।"[১] লিখেছেন, পরিব্রাজকের পাতায় ঃ "বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা। অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা আর দৈবী কণ্ঠ—এসব একত্র সংযোগে কালভেকে গায়িকামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়া করেছে।"[২] লিজেল রেমঁ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, স্বামীজী প্যারিসে 'কারমেনের' ভূমিকায় কালভের অনবদ্য অভিনয় দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কালভে জীবনে দারিদ্র্যের ধ্রুব রূপ যেমন দেখেছেন, পাশাপাশি শিল্পীজীবনে বিত্ত ও খ্যাতির চরম শিখরে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু এতসব প্রাপ্তি ঘটলেও মানবী কালভে জীবনে পাননি শান্তি। সুখের সংসার জীবন চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রেমে হলেন ব্যর্থ। সর্বগ্রাসী হতাশা আর বুভুক্ষ অতৃপ্তি তাঁকে ঘিরে ধরলো। এই মহাসংকটক্ষণেই কালভের জীবনে দেবতার দীপ হস্তে স্বামীজীর আবির্ভাব। স্বামীজীকে কালভের প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল? স্বামীজী তখন আমেরিকার বিগদ্ধমহলে আধ্যাত্মিকতার নব নব বাণীর মধ্য দিয়ে তুমুল আলোড়ন তুলেছিলেন। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, শান্তি অথচ গভীর প্রদীপ্ত বাণী, দেবপ্রতীম আকৃতির আকর্ষণে পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট নর-নারীরা সব সময় তাঁর পাশে ভীড় জমিয়েছেন। এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর প্ররোচনায় তাঁর সঙ্গে স্বামীজীকে দর্শনে এলেন কালভে। স্বামীজীর গুরগম্ভীর সুরের ঝঙ্কৃত কথাগুলো কালভের মন-প্রাণকে এক লহময় যেন এক শান্তির জগতে নিয়ে গেল। জুড়িয়ে গেল তাঁর সকল জ্বালা। তাঁর যেন জন্মান্তর ঘটলো। কালভের কথায় ঃ "আমার সব ব্যথা জুড়িয়ে গেল তাঁর কথালাপে ও স্নেহস্পর্শে। তাঁর কথাই ছিল আমার কাছে একমাত্র অমৃত আর মুগ্ধ হতাম তাঁর মাতৃসম্বোধনে।"[৩] স্বামীজীর কাছে কালভে পেয়েছিলেন উপনিষদের অভীমন্ত্র। 'Life is courage'—স্বামীজীর এই অভয়বাণী কালভের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল আমৃত্যু।

১৯০০ সালে স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে প্রভাবিত হয়েছিলেন আরও এক দম্পতি—টম অ্যালেন (অজয়) ও এডিথ আলেন (বিজয়া)। আমেরিকার ভক্তমণ্ডলীতে অজয় ও বিজয়া নামেই বিশেষ পরিচিত তাঁরা। জাতিতে ইংরেজ। স্বামীজী-কৃত 'রাজযোগ' পড়েছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তাঁদের দর্শন ঘটেনি। ২৮ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ, অকল্যাণ্ডের ইউনিটেরিয়ান চার্চের যাজক Benjamin Fay Mills-এর ব্যবস্থাপনায় স্বামীজী বক্তৃতা দেন। বিষয় ঃ বেদান্ত ও খ্রিষ্টধর্মের সাদৃশ্য। মিঃ অ্যালেন স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে এসে

---

১. বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃ ঃ ৯৩

২. ঐ ঐ

৩. চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, পৃ ঃ ৬৪

এডিথকে বললেন—মানুষটি সাক্ষাৎ দেবতা। সানফ্রান্সিসকো উপকূলে যত সভায় স্বামীজী বক্তৃতা দিয়েছেন, তার সবকটিতেই নিমগ্ন শ্রোতার ভূমিকা ছিল টমের। শুধু বক্তৃতাই শোনেননি, বহু সভার ব্যবস্থা তিনি করে দিয়েছেন। সর্বত্রই স্বামীজীর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মিসেস অ্যালেনও শারীরিক যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনেছেন। গুপ্তবিদ্যা চর্চার কারণে হতাশা ও স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগছিলেন তাঁরা। স্বামীজীর সংস্পর্শে আসার পর-পরই তাঁরা এক অপার্থিব আনন্দের সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন। স্বামীজীর কাছে শিখলেন কীভাবে ধ্যান ও প্রাণায়াম করতে হয়। স্বামীজীর মুখে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র ও গীতার ব্যাখ্যা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁদের হৃদয় জুড়ে বসেছিলেন স্বামীজী। মিঃ অ্যালেন জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত আবিষ্ট ছিলেন বেদান্ত-ভাবনায়। যদিও স্বামীজীর পূতঃপবিত্র সঙ্গ পেয়েছিলেন অ্যালেন-দম্পতি, কিন্তু দীক্ষা পেয়েছিলেন স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কাছ থেকে। আর স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁদের নাম দেন অজয় ও বিজয়া।

পাশ্চাত্যের হাজার হাজার বিবেকানন্দ-অনুরাগীদের মধ্যে কেউ কেউ স্বামী বিবেকানন্দের গভীর সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম একটি পরিবারের কথা এবার আলোচনা করবো। লেগেট পরিবারের সঙ্গে স্বামীজীর যোগসূত্রের প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন জোসেফিন ম্যাকলাউড। যে-কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে স্বামীজীর পাশ্চাত্যজীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে লেগেট পরিবার অন্যতম। স্বামীজীর প্রিয় 'জো-জো'-র কথা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী মিসেস বেসি স্টার্জিসের জীবনেও রয়েছে স্বামীজীর দিব্য-অনুভূতির প্রভাব। উইলিয়ম স্টার্জিসের বিধবা পত্নী বেসির ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ২৯শে জানুয়ারী স্বামীজীর সঙ্গে রাক্ষাৎ হয়। আবার ঐ বছরই মিঃ ফ্রাঙ্ক লেগেটের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবেকানন্দ ফ্রাঙ্ক ও বেসির বিবাহের সাক্ষী ছিলেন। ফ্রাঙ্ক প্রভূত সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অন্তর ছিল ঋষির মতো সংযত। নিউইর্য়ক, রিজলি ম্যানরে, পার্সির মেইন ক্যাম্প প্যারিসের সম্রান্ত অঞ্চল 'প্লাস দি জেতাৎ ইনি'র ছয় নম্বর প্রাসাদোপম ভবন প্রভৃতি আরও অনেকগুলি আবাসের অধিকারী ছিলেন। ঐসব জায়গায় স্বামীজী লেগেটের আথিতেয়তায় কাটিয়েছিলেন। কোথাও একাধিকবার থেকেছেন। প্রত্যেকটা জায়গার প্রাকৃতিক পরিবেশ শান্তি, নির্জন, অপরূপ। এই পরিবেশে স্বামীজী গভীর ধ্যানে ও শাস্ত্রাদি পাঠে সময় কাটাতেন। রিজলিতে তাঁর দিব্যসান্নিধ্যে বেসি ও ফ্রাঙ্ক—উভয়েই ভরপুর হয়ে গিয়েছিলেন। আন্তরিকতা আতিথেয়তা ও সেবা দিয়ে স্বামীজীর আনন্দ বিধান করতেন তাঁরা।

লেগেট ছিলেন হৃদয়বান ও বেদান্তানুরাগী। নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির পরিচালক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে। আমেরিকায় স্বামীজীর বই প্রকাশের অধিকাংশ দায়িত্ব বহন করতেন তিনি। আর মিসেস লেগেটের নিমন্ত্রণে দেশ বিদেশের খ্যাতনামা গুণিজনের, রাজাধিরাজদের পদার্পণ ঘটতো 'প্লাস দি জেতাৎ ইনি-র

৬-নম্বরের প্রাসাদোপম লেগেটভবনে—যাঁদের মধ্যে ছিলেন ডিউক অব নিউ ক্যাসল, প্রিন্সেস ডেমিডফ, বৈজ্ঞানিক হিরাম ম্যাক্সিম, দার্শনিক ক্রুপট্‌কিন, স্যার উইলিয়াম জেমস্ প্রমুখ গুণীজন। নিবেদিতার কাজের জন্য, বেলুড় মঠের নানা কাজে, স্বামীজী—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারে তিনি অর্থদান করেছেন প্রাণখুলে। জ্যোতির-তনয় বিবেকানন্দের সান্নিধ্যের ফলে মিঃ লেগেট ও মিসেস লেগেটের জীবন ফল্গুধারার মতন বহমান ছিল। শুধু এঁরা নয়, পিতা উইলিয়ম স্টার্জিসের মৃত্যুর পর তাঁদের কন্যা তরুণী অ্যালবার্টা মায়ের সঙ্গে কখন কখনও স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে যেতেন। স্বামীজীর কথায় তার ব্যথিত হৃদয়ে শান্তি-বারি সিঞ্চিত হয়েছিল। উত্তরজীবনে অ্যালবার্টার মধ্যে যে মনস্বিতা আমাদের মুগ্ধ করে তার অনেকটাই স্বামীজীর স্বর্গীয় সান্নিধ্যে বিকশিত। স্বামীজীর সঙ্গে ঐতিহাসিক রোমনগরী দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল অ্যালবার্টার। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসে স্বামীজী অ্যালবার্টা, প্রফেসার গেডেস প্রভৃতির সঙ্গে বিশ্বমেলায় যেতেন। অ্যালবার্টা-র ছিল গভীর দূরদৃষ্টি, মনস্বিতা ও সংবেদনশীল মন। স্বামীজী ও তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের পুণ্যসান্নিধ্য তাকে মননশীল ও সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন করে তোলে।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্যারিসে লেগেটদের সঙ্গে বাস করতেন সেসময় মিসেস বুলের আমন্ত্রণে স্বামীজীকে পেরে-গীরে চলে যেতে হয়। বিবেকানন্দের অন্তরঙ্গ সাহচর্য অ্যালবার্টাকে দিয়েছিল দিব্য-অনুভূতির স্বাদ। ফলে স্বামীজীর আকস্মিক স্থান-পরিত্যাগে বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল অ্যালবার্টা। এই মানসিক পরিস্থিতিতে ম্যাকলাউড-কে লেখেন ঃ

"কাল রাতে ডিনারের আসর খুব জমেছিল, স্বামীজীও ঝকঝকে মেজাজে ছিলেন। তবে তিনি ভীষণ দুঃখিত যে তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার দরুণ প্যারিস ছেড়ে অচিরেই চলে যেতে হবে। প্যারিস তাঁকে আনন্দ দিয়েছিল। এখানকার পরিবেশে বেশ মানিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি ভাষা শেখাতেও বেশ রপ্ত হয়ে গেছেন। এখানকার চিন্তাবিদ এবং রদাঁর মতন শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। এখন প্যারিস ছাড়ার অর্থ নিজেকে এসব থেকে বিচ্ছিন্ন করা।"[১]

স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে এসে আলবার্টা ধর্মজীবন যাপনের স্বপ্ন দেখতেন। 'ক্যাথলিক নান' হওয়ার বাসনা জেগেছিল তাঁর মনে। ফাদার পাওয়েলের কাছে দীক্ষাও নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সমগ্র হৃদয়জুড়ে ছিল স্বামীজী। নিবেদিতার সঙ্গেও অ্যালবার্টার গভীর সম্পর্ক ছিল। সেই নিবেদিতাও বলেছেন, "বিবাহিত হলেও সে সন্ন্যাসিনী।"[২] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁদের হিনচিকব্রুক প্রাসাদটি দুশ শয্যাবিশিষ্ট রেডক্রশ হাসাপাতাল করতে দান করেন। স্বামীজীর কাছে তিনি ত্যাগ ও সেবাদর্শের শিক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁর স্বামী জর্জ মণ্টেগু-ও সহায়ক হয়ে উঠেছিলেন তাঁর। বেলুড় মঠে মিসেস লেগেট, কন্যা

---

১. ইউরোপে বিবেকানন্দ ঃ বিদ্যাত্মানন্দ, পৃ ঃ ৩

২. Letters of Sister Nivedita. Ed. Sankari Prasad Basu, Vol. II P. 743

অ্যালবার্টা, জামাতা মন্টেগু সকলেই এসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামীজী-তীর্থ বেলুড় মঠে এসে শুধু অ্যালবার্টা নয়, তাঁর স্বামী জর্জ-ও মোহিত হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমার পূণ্য দর্শনলাভ তাঁর জীবনের অন্যতম স্মরণীয় স্মৃতি। স্মৃতিকথায় তিনি লেখেন ঃ 'কলকাতা অবস্থানের পরমতম ঘটনা Holy মাদারের দর্শন। আমরা তাঁর পদধূলি নিলাম। তিনি অল্পই কথা বললেন। কিন্তু সেই মহিমান্বিত মুখের শান্ত, কিছুটা নির্লিপ্ত ভাব আমি চিরকাল স্মরণে রাখব।"[১] প্রিয় বোনঝিকে স্বামীজীর কর্মযজ্ঞের খবর দিতেন ম্যাকলাউড। অ্যালবার্টার ভাই হলিস্টার খুবই স্নেহের পাত্র ছিল নিবেদিতার। ১৯০৮ সালে তিনিও বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর দর্শন করেন। স্বামীজীর প্রতি হলিস্টারের ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও ভাসাবাসা।

১. বিবেকানন্দ শরণে বিদেশিনী,. পৃঃ ৪৭

স্বামীজীর ইউরোপ-ভ্রমণ ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি

জার্মানীর বিখ্যাত প্রাচ্যদর্শনবিদ অধ্যাপক পল ডয়সন ও স্বামী বিবেকানন্দের যোগাযোগ ঘটেছিল। এঁদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের বিবরণ দিয়ে মিসেস সেভিয়ার ১৯০৫ সালের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে আলাপের পর পল ডয়সন-ও একটি অধ্যায় লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনী 'Man Leben' গ্রন্থে। স্বামীজীর তাঁর বাড়িতে অবস্থান এবং একসঙ্গে হামবুর্গ, ব্রেমেন এবং আম্‌স্টার্ডম যাত্রার ওপর এটি লেখা। ঐ ভ্রমণের যাবতীয় খরচার ভার গ্রহণ করেছিলেন সেভিয়ার দম্পতি। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্বামীজী দর্শন করেন। স্বামীজীর জীবনীগ্রন্থে এসব উল্লেখ আছে। ইন. টি. স্টার্ডিকে ১৮৯৬-এর ১০ সেপ্টেম্বরে স্বামীজীর চিঠি থেকে জানা যায়—'অধ্যাপকের সঙ্গে বেদান্ত আলোচনা করে কালকের দিনটা খুব চমৎকার কেটেছে।' পল ডয়সন (১৮৪৫—১৯১৯) ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বেদান্ত জার্মানী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ৬০টি উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয় মহাভারত ও আর দার্শনিক ভাষ্য। মনেপ্রাণে তিনি খাঁটি বৈদান্তিক ছিলেন। মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন মহান। বহুভাষাবিদ এই মানুষটি সারাজীবনই নিজেকে লগ্ন রেখেছিলেন জ্ঞানচর্চায়। স্বামীজীর সঙ্গে ডয়সনের প্রথম সাক্ষাতকার খুব সুখকর হয়েছিল। সেদিন ছিল তাঁর মেয়ে এরিকার জন্মদিনের উৎসব। প্রথম মুহূর্ত থেকেই উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য জন্মেছিল। সারাদিন আলাপ আলোচনার মধ্যে তাঁদের কেটেছিল। ডয়সনের পরামর্শেই স্বামীজী—কিয়েল ও তার আশেপাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখেছিলেন। ঐ প্রথম দিনই চায়ের পর স্বামীজী এবং সেভিয়ারদের নিয়ে সস্ত্রীক ডয়সন প্রদর্শনী দেখতে গেলেন। স্বামীজীর জীবনীতে ঘটনাটি এইভাবে বলা হয়েছে ঃ

'প্রদর্শনীতে অনেকটা সময় ব্যয় হলো জার্মানির শিল্পকলা ও কলকারখানার নমুনা দেখে। তারপর সামান্য কিছু জলযোগ সেরে সেভিয়ারদের সঙ্গে স্বামীজী হোটেলে ফিরে এলেন। ডয়সন আগেই বলে দিয়েছিলেন যে, স্বামীজী যেন কিয়েল শহর এবং আশেপাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে নেন।...,বলা বাহুল্য যে, সে দিনটি স্বামীজীরা সবাই মিলে বিশেষভাবে উপভোগ করলেন এবং সর্বত্রই সমান সম্বর্ধনা পেয়ে তাঁরা যথার্থই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন।'

পল ডয়সন ছিলেন ভারতপ্রেমী। ভারতভ্রমণও করেছেন। ভারতের উপর একটি বই-ও লিখেছেন। সংস্কৃত, হিন্দি দু'টো ভাষায় জানতেন। এমনকি কথা বলতেও পারতেন। স্বামীজীর সঙ্গে থাকাকালে সংস্কৃতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। মানুষ হিসেবেও মহান ছিলেন। আর সেই কারণেই স্বামীজীর প্রশংসা ও ভালোবাসার যোগ্য পাত্র হয়ে ওঠেন ডয়সন। স্বামীজী ১০ই সেপ্টেম্বর স্টার্ডিকে লিখেছেন ঃ 'আমার মতে তিনি (ডয়সন) যেন একজন যুধ্যমান (Warring) অদ্বৈতবাদী। অপর কিছুর সঙ্গেই তিনি আপোস করতে নারাজ। ঈশ্বর তাঁর কাছে জুজুর মতন। ঈশ্বরের নামেই তিনি আঁতকে

উঠেন।' জ্ঞানতপস্বী ডয়সনও স্বামীজীর মনীষা ও প্রজ্ঞাই চমৎকৃত হয়েছিলেন। এছাড়া স্বামীজীর মধ্যে তিনি গভীর তন্ময়তা ও সজাগ স্মৃতির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

এবারে আমরা জুল বোওয়ার কথা বলবো। ইউরোপ পরিভ্রমণকালে স্বামীজীর নতুন বন্ধু। স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিসে এসেছিলেন ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে—৩রা আগষ্ট সেখানে পৌঁছান। ৭ই সেপ্টেম্বর তিনি ধর্মেতিহাস কংগ্রেসের সভায় দুটো বক্তৃতা দেন। কংগ্রেসের উদ্বোধনের দিন কয়েক আগে তিনি ফরাসী সাহিত্যিক জুল বোওয়ার (Jules Bois) সঙ্গে ফ্ল্যাটে থাকতেন। এই সময় স্বামীজী ফরাসী ভাষা শিখতে চেয়েছিলেন। কিছুটা রপ্তও করেছিলেন। 'পরিব্রাজক' (Memoirs of European Travel) গ্রন্থে লিখেছেন....এত মনে করলুম যে পারি-তে বসে কিছুদিন ফরাসী ভাষা ও সভ্যতা আলোচনা করা যাবে। পুরোনা বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করে এক গরীব ফরাসী নবীন বন্ধুর (জুল বোওয়া) বাসায় গিয়ে বাস করতে লাগলুম। তিনি জানেন না ইংরেজি এবং আমি ফরাসী। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার।'

প্যারিসে আন্তর্জাতিক বিশ্বমেলায় স্বামীজী আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। এই মেলায় স্বামীজীকে আমন্ত্রণ করেন জেরাল্ড নোবেল্। তখন তিনি ৬ নম্বর প্লাস দে জেতাৎ ইনিতে মিস্টার এবং মিসেস লেগেট, ম্যাকলাউড, সারা বুল, মিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে কিছুদিন বাস করেছেন। অবশ্য ফরাসী শিখতে কিম্বা ফ্রান্সের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে অধিকাংশ সময় তিনি জুল বোওয়ার ফ্ল্যাটেই থেকেছেন। এই ফরাসী লেখকের সঙ্গে তিনি আলাপ আলোচনা করতেন নিয়মিত। ইউরোপের সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে তাঁদের মধ্যে ভাব-বিনিময় হতো। আলাপের সময় স্বামীজী ফরাসী ভাষাটাও ঝালিয়ে নিতেন।

স্বামীজীর সঙ্গে তৎকালীন ফ্রান্সের আর একজন বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি হলেন পেয়র হিয়াসান্থ লয়সন। স্বামীজী এই মানুষটিকেও খুব শ্রদ্ধা করতেন। লয়সন ছিলেন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত একজন সন্ন্যাসী। ক্যাথলিক চার্চের সংস্কারের কাজে ব্রতী এই সন্ন্যাসীকে অনেক লাঞ্ছিনা ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। স্বামীজীর সঙ্গে লয়সনের সাক্ষাতের সময় তাঁর বয়স ছিল তিয়াত্তর বছর। লয়সনের জন্ম ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে ১০ই মার্চ তারিখে মধ্য ফ্রান্সের অরলীয় প্রদেশে। আঠারো বছর বয়সে সাঁ সলপীর (Saint—Sulpice) ধর্মীয় চতুষ্পাঠীতে তাঁর বিদ্যা আরম্ভ হয়। ছয় বছর পর তিনি যাজক পদে অভিষিক্ত হন। সেই সময় তিনি ক্যাথলিক কলেজে দর্শন পড়াতেন। ধর্মীয় প্রচারক হিসেবেও তিনি নিয়োজিত হন। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা ও ধর্ম ব্যাখ্যার দরুণ সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি খুব জনপ্রিয় হন। পেয়র হিয়াসান্থ বলতেন, ধর্ম হোক মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্চার অঙ্গ। তাঁর পাণ্ডিত্য ও বাগ্মীতা ও উদার মতাদর্শ এবং পোপ বিরোধী ভূমিকাটি ইউরোপীয় সমাজে তখন মহা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর পেয়র হিয়াসান্থ বিয়ে করলেন এমিলি মেরিম্যানকে। হিয়াসান্থের বয়স তখন পয়তাল্লিশ। পরের বছর অক্টোবরে মাদাম লয়সন জননী হন। ওঁরা পুত্রের নাম রাখেন পল এমান্যুয়েল।

স্বামী বিবেকানন্দের কনস্তান্তিনোপল পরিভ্রমণে সহযাত্রী ছিলেন লয়সন দম্পতি। এই ভ্রমণ সম্পর্কে স্বামীজী তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে হিয়াসান্থের সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন। স্বামীজী লিখেছেন ঃ 'শ্রীমতী জো ম্যাকলাউড, এমা কালভে এবং জুল বোওয়া ছাড়া কন্‌স্তান্তিনোপল পর্যন্ত পথের সঙ্গী ছিলেন আর এক দম্পতি। পেয়র হিয়াসান্থ্‌ লয়সন এবং তাঁর সহধর্মিনী। স্বামীজীর আর একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য ঃ 'মহান কবি ভিক্তর হ্যুগো সারা ফরাসী দেশে দুটি মানুষের ফরাসী রচনার প্রংশসা করতেন—এঁদের মধ্যে একজন হলেন পেয়র হিয়াসান্থ্‌।'

হিয়াসান্থের মুক্ত-মনের জন্য স্বামীজী তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। কারণ স্বামীজীও ছিলেন সেই মুক্ত-মনের অধিকারী, ধর্ম.সংস্কারকও। পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনিও লড়াই করেছেন, যেমন করেছেন হিয়াসান্থ্‌ রোমক চার্চের যাজকদের বিরুদ্ধে।

জেরাল্ডের নাম আগেই বলেছি। প্যারিস বাসের শেষের দিকে জেরাল্ড নোবেল-এর অতিথি হয়ে স্বামীজী দু'তিন দিন তাঁর বাড়িতে বাস করেছিলেন। আড়াইমাস আগে যেদিন স্বামীজী প্রথম প্যারিস শহরে পৌঁছলেন, সে রাতটিও নোবল্‌-এর অতিথি হয়েছিলেন স্বামীজী। মিসেস ফ্রান্সিস লেগেট তাঁর 'লেট এ্যাণ্ড সুন' গ্রন্থে এই উদার স্বভাবের সজ্জন মানুষটির কথা বলেছেন। এঁর সাহায্য ছাড়া প্যারিসের ধর্মেতিহাস সম্মেলনে সরকারীভাবে অংশগ্রহণ করা স্বামীজীর পক্ষে মোটেই সম্ভব হতো না। মি. ম্যাক্সিম, মিঃ ক্যানন হাউইসও ইংল্যাণ্ডে স্বামীজীর কাজকর্মের ধারাকে উৎসাহের সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। স্বামীজী জুল বোওয়া, হিয়াসান্থের মতই জেরাল্ড নোবেল, মিঃ ম্যাক্সিম, মিঃ ক্যানন প্রভৃতি পাশ্চাত্যের মানুষদের আপন করে নিয়েছিলেন। আর তাঁরাও স্বামীজীর পাশ্চাত্যের কাজের ক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। উদার সার্বজনীন ধর্ম স্বামীজী প্রচার করেছিলেন খ্রিষ্টান দেশগুলোতে ; যা চেয়েছিলেন পেয়র হিয়াসান্থ্‌-ও। খ্রিষ্টান চার্চগুলির মধ্যে কিছুকাল থেকে এই উদার সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ করা যাচ্ছে। তাঁদের 'ডগমা' গুলির যে তাত্ত্বিক পরিমার্জনা করা দরকার,—যা স্বামীজী উনিশ শতকের শেষ দশকে পাশ্চাত্য পৃথিবীর মানুষদের সামনে বলেছিলেন, এখন সেই পথ ধরেই এগোচ্ছে। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে Dr. K. P. Aleaz-এর মতো খ্রিষ্টতত্ত্ববিদের মন্তব্য উল্লেখ করা যাক। তিনি বলেছেন ঃ "...There is Paradigm Shift (i.e.. Change in the entire constillation of beliefs, Valuses and Techniques) taking place in the Christian understanding of mission and this is in line with Swami Vivekananda's exhortation for a radical change."[১] ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি এই ঈঙ্গিত আগেই দিয়েছেন। বলেছেন ঃ "হিন্দু ভাবধারাতেই রয়েছে মানবসভ্যতার রক্ষাকবচ। বলাবাহুল্য, এই হিন্দু ভাবধারার পরিচয় পাশ্চাত্যের মানুষ পেয়েছিল হিন্দুসন্ন্যাসী

১. Paper on Contemporary Christtian Resporve to the Prophitic voices of Swami Vivekananda on Charitian Faith, P. 26

বিবেকানন্দের মাধ্যমেই। এখানকার মানুষ বিবেকানন্দের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল ভগবান যীশুকে। বিবেকানন্দের এক খ্রিষ্টান বন্ধু ও অনুরাগী ভক্ত ডা. এম. এইচ. লোগান একটি চিঠিতে স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দকে লিখেছিলেন, স্বামীজীকে তাঁরা কী চোখে দেখেন। তিনি লিখেছেন ঃ আমার কাছে তিনি ক্রাইস্ট ছিলেন। তাঁর চেয়ে বড় মাপের

এবং স্বর্গের বাতাসের মতই উদার ও সর্বত্রগামী তাঁর প্রেম।...চিন্তার জগতের সূক্ষ্মতম তন্ত্রীগুলিকে বিবেকানন্দ একটা প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেছেন। চিন্তানায়কেরা তাঁর কাছে নতজানু হয়েছেন দেখেছি ; আর যাঁরা অপেক্ষাকৃত সাধারণ, তাঁরা তাঁর গেরুয়ার প্রান্তভাগটিকে সশ্রদ্ধভাবে চুম্বন করেছেন। বিবেকানন্দের মতো আর কোনও মানুষই দেহে থাকতে এত সম্মান, শ্রদ্ধা পাননি।...যেখানেই তিনি গেছেন, সর্বত্রই তাঁর দিব্য উপস্থিতি একটা পরম প্রশান্তি ঢেলে দিত। তাঁর কণ্ঠে যাদু ছিল ; এমনই যাদু যা শুনে আমার হৃদয়ের সব অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ চিরতরে মুছে গিয়েছিল। আমাদের মধ্যে তাঁকে দেখবার

ড. লোগানের মতো বুদ্ধিজীবিরাই শুধু নয়, হাজার হাজার সাধারণ আমেরিকান স্বামীজীর শিষ্য হয়েছিলেন।[২] বিশ শতকেও স্বামীজীর ভাবাদর্শ ও কার্যক্রম ধীরে অথচ সুনিশ্চিতভাবে পাশ্চাত্যের মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে। একবিংশ বা আরও কয়েক

উপলব্ধি করতে পারে, এটাই আমি চাই।"[৪] স্বামীজীর এই ইচ্ছা যে অনেকটাই বাস্তবায়িত হয়েছে, তার প্রমাণ ওদেশের সমাজতত্ত্বিদরা জানিয়েছেন। Barry Kosmin এবং

পরিমাণে সামাজিক ভেদাভেদের সীমা অতিক্রম করে গেছে। এই বিচারে আমেরিকা একটি অদ্বিতীয় দেশ।"[৫]

১. 'Swami Vivekananda and this works' by Swami Abhedananda
২. 'New Discoveries'—Burk, Vol_6, PP—20—21
৩. Eastern and Western D. Ples, The Life of Swami Vivekananda, Vo-II, 5th Ed.
৪. CW. 5 : 68
৫. One Nation under Go P 12